পিতা পুত্রকে

চাণক্য সেন

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬১

প্রকাশিকা :
শ্রীযুক্তা উমা মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক :
চয়নিকা প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০.০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীঅপরূপ উকিল

উৎসর্গ

লেখকের অন্যান্য বই :

উপন্যাস

পুত্র পিতাকে
ত্রিপর্ণা
রাজপথ জনপথ
সে নহি সে নহি
মুখ্যমন্ত্রী
জাগরূক
অরাজনৈতিক
শুধু কথা
সমুদ্রশিহর
প্রতিবেশী
সেই আদিম সন্তান
ব্রুটাস, তুমিও !!!
গেরিলা
এখনও অমৃত
কালের ইতিহাস
অজগর
মধ্য পঞ্চাশ
বিশ্ববিনাশ
৺সতীদাস কলকাতায় বেঁচে আছেন
এখন শুধু পদক্ষেপ
অ
রেপ
আজ এখানে
তিন তরঙ্গ
একান্তে
ধীরে বহে নীল
রাগ নেই
সবে শুরু
অশোক উদ্ভিদ মাত্র
সাধু ! সাধু !! সাধু !!!

তারারা শোনে না (নাটক)

॥ এক ॥

পুত্র, তোমার যখন পঁচিশ বছর বয়স, তখন তুমি আমাকে, শুধু তোমার নয়, বিশ্বব্যাপী তোমাদের পুরো প্রজন্মের, আত্মকাহিনী শুনিয়েছ। শুধু আমাকে নয়, আমার মত পঞ্চাশ বছরের পৃথিবীজোড়া পিতা-প্রজন্মের সবাইকে, জানাবার জন্য পঁচিশ বছরের ছোট প্রজন্মের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছ।

আজ আমি, সত্তর-উত্তর বয়সে, আমার, তথা বিশ্বব্যাপী পিতৃ-প্রজন্মের, কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি তোমার ও তোমাদের সবাকার জন্য।

একদিন পুত্র পিতাকে করেছিল আহ্বান। সারা দুনিয়ার পুত্রদের জীবন-বাণী শোনবার জন্য। আজ পিতা আহ্বান করছে পুত্রকে, সারা পুত্র প্রজন্মকে। সত্তর-উত্তর পুরুষের কাহিনী শোনবার জন্য। সময়ের শেষহীন নদীর এপার ও ওপার পরস্পরকে নিজের কথা বলছে, খুলে ধরছে একই ধারাবাহিক ইতিহাসের দুই পারস্পরিক চালচিত্র। পুত্র পিতাকে ও পিতা পুত্রকে এই দুই সেতুর নীচে প্রবাহিত হয়ে গেছে চুয়াত্তর বছরের ভারতবর্ষের ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে প্রায় সারা দুনিয়া।

আমি যখন জন্মেছিলাম তখন ভারত ছিল ইংরাজের কলোনী। তার শ্রেষ্ঠ ও সর্বোজ্জ্বল উপনিবেশ। "জুয়েল ইন দ' ক্রাউন।"

তুমি যখন জন্মালে তখন এই প্রাচীন দেশটাও নবজন্ম পেল রাজনৈতিক স্বাধীনতায়। এই দুই জীবনের পরিধির মধ্যে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের, আরও সঠিক করে বলতে গেলে বিশ্ব সাম্রাজ্যের, অপসরণ শুরু হল।

এক প্রথিতযশা ইংরেজ ঐতিহাসিক বিংশ শতাব্দীর নাম দিয়েছেন "ছোট শতাব্দী", দ' শর্ট সেঞ্চুরী। ছোট, কেননা এই শতাব্দী একটার পরে একটা বিশাল ঘটনা, মানুষের উজ্জ্বলতম জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আবিষ্কার, দুনিয়ার বৃহত্তর অংশে মানব সমাজের অভূতপূর্ব অগ্রগতি, সঙ্গে সঙ্গে দুই বিশ্বযুদ্ধ, দুই বিরাট সমাজ বিপ্লব এবং অবিশ্বাস্য সাংঘাতিক সংঘাতের জন্যে অভিনব, অভিনবতর, অভিনবতম মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার, মানুষ যে কত নিষ্ঠুর নৃশংস রক্ত-পিপাসু হতে পারে তার ভয়াবহ বীভৎস প্রমাণের পরে প্রমাণ—সময়কে দীর্ঘ অবকাশে ধীরে চলবার সুযোগ দেয় নি।

তোমার প্রজন্মের কাহিনীতে ঘোষিত হয়েছিল নতুন যুব শক্তির বিদ্রোহ প্রাচীন অথচ সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে। তুমি জন্মেছিলে বাঙালী মধ্যবিত্ত পিতামাতার প্রথম সন্তান হয়ে মধ্যভারতের এক রাজধানী-শহরে। শিশু বয়েসেই তোমার ও তোমার বোনের জীবন মধ্যভারত থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ হবার আগেই তোমার যুবক জীবনে এসে গেল নিউ ইয়র্ক। তুমি মিশে গেলে সারা পৃথিবীর পদযাত্রার সঙ্গে। তোমার জীবনের বিদ্রোহ প্রতিবাদী হিপি-কালচারের পরে ভীয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে মার্কিন মুল্লুক জুড়ে, আন্দোলন, অবরোধ, প্রতিবাদের মাধ্যমে স্নাতকোত্তর।

প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ জীবন-বোধনকে ধারাল করে। মানুষের অনুভূতিগুলিকে করে চঞ্চল ও অন্বেষণী। প্রতিবাদ-বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ বুকে রেখে মানুষ নিজের হাতে তৈরী অবরোধ এড়িয়ে, অথবা অতিক্রম করে ঢুকে পরে জীবনের অন্দর মহলে। প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ জীবন নামক পাঁচ-মহলের বাইরের প্রাঙ্গণে তার দৃপ্ত পদধ্বনি সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়।

কেবল বিপ্লবই পারে পাঁচ-মহলকে ভাঙতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিপ্লবের ভাঙন পাঁচ-মহলকে নিশ্চিহ্ন করে না। সময়-মাটির মধ্যে সুদীর্ঘ শিকড়ে আবদ্ধ মানুষের সমাজ। এ সমাজ কিছুতেই নিশ্চিহ্ন হবার নয়। অতএব ইতিহাসে আমরা কেবল দেখতে পাই পুরাতন-নতুনে আবহমান সংগ্রাম। যে সংগ্রামে পুরো জয় না নতুনের, না পুরাতনের। মিতালি ও বৈরীতার মধ্যে ঘটে এক দ্বন্দ্বমূলক বন্ধুত্ব।

আমি জন্মেছিলাম ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ বঙ্গদেশের অনেক গভীরে এক গ্রামে। এমন একটি ক্ষুদ্রতম তালুকদার পরিবারে যেখানে ভদ্রলোকের আত্মগরিমা তার সামান্য সম্পদকে স্পর্ধার সঙ্গে উপেক্ষা করে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কিছুটা জয়ী, অনেকখানি পরাভূত। দারিদ্র নামক হৃদয়হীন দস্যুর বিশাল কবলের অন্ধকারে কেটেছিল আমার পিতার জীবন, আমার বাল্যকাল ও যৌবনের বেশির ভাগ। পরে, ঘটনাচক্রে, আমি একদিন হয়ে গেলাম যাকে বলা যায় বিশ্বগ্রামীণ, গ্লোবাল ভিলেজার। শব্দটার প্রচলিত অর্থে নয়। পৃথিবীকে এখনও একক বিরাট গ্রামে পরিণত হতে বহু সময়, বোধহয় আর এক শতাব্দী, অপেক্ষা করতে হবে। আমার মধ্যে পনের বছর বয়স পর্যন্ত একটি গ্রাম্য যুবক একদিন বিশ্ব-নাগরিক হবার স্পর্ধা

হজম করে যা হতে পারল তা হল গ্রাম, শহর ও পৃথিবীর এক বহু সংবর্ণের পিণ্ড। তার গায়ে অনেক কাঁটা।

'পুত্র পিতাকে' ও 'পিতা পুত্রকে' বাপ ও ছেলের সম্পর্ক নিয়ে দুই সমান্তরাল গল্প নয়।

তুমি যা লিখেছ ও আমি যা লিখছি তা হল এই সংক্ষিপ্ত শতাব্দীর সময় সমুদ্র দ্বারা তৈরী এক মহানদী থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা একটি ছোট নদীর দুই শাখা।

এবার শুরু হোক পিতৃ কাহিনী। পিতা বলুক পুত্রকে······

এখন যার নাম বাংলাদেশ, বহুদিন যার নাম ছিল পূর্ববঙ্গ, এবং তার মানুষদের বলা হতো 'বাঙ্গাল', সেই নদীবহুল ছায়াঘন বৃক্ষ-বন-সবুজ দেশের অনেক গ্রাম গণেশপুর, তার ডাকসাইটে এক পুরুষের নাম রজনীকান্ত, তাঁর পুত্র দুর্জয় সিংহ, তস্য পত্নী ননীবালা, ননীবালার গর্ভে এক ভাদ্রশেষের রবিবারের মধ্যাহ্নে, ঘড়ির কাঁটা যখন ঠিক বারোটা ছুঁয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিশ্চল, নিশব্দ, তখন আমার জন্ম হলো, আমি এলাম। তারপর বাইবেল উক্ত তিনকুড়ি দশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কী ভীষণ ও চমকপ্রদ পরিবর্তনের বন্যায় পৃথিবী বার বার ঘূর্ণি খেল, কত কিছু কি নিদারুণভাবে বদলে গেল, কত কিছু কি কঠিনভাবে রয়ে গেল অপরিবর্তনীয়। ইতিহাস নামক দানব মানুষ ও পৃথিবী নিয়ে খেলে গেল এক শেষহীন বিচ্ছেদ-মিলন, ভাঙ্গন-গঠন নিয়ে তৈরী অপার বিস্ময় খেলা। আমরা এককালের শিশু, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, মধ্যবয়স অতিক্রান্ত হ'য়ে বার্ধক্যের ধূসর ভূমিতে উপনীত হলাম। তোমরা, আমাদের পুত্ররা, মধ্যবয়সে ভুঁড়ি, সবে-পাকা দাড়ি অর্জন ক'রে জীবনের তথাকথিত সার্থকতা-ব্যর্থতার মিঠে-তেতো আস্বাদ জিভে নিয়ে চলেছ জীবনযাত্রার বহুমুখী পথে। তোমাদের সন্তানরা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন চোখে নিয়ে নতুন শরীর, নতুন মন নিয়ে জীবনের প্রথম আস্বাদ পেতে শুরু করেছে। এভাবে এগিয়ে চলেছে কালের মৃত্যুহীন স্রোতস্বিনী, "সীমা তো কোথাও নাই,—সীমা সে তো ভ্রম।"

পিতার কাহিনী পুত্রকে শোনাতে গিয়ে প্রথমে এবং পরিশেষে যে মহাসত্য, বুঝি প্রথম ও শেষ সত্য, অনুভব করছি, উপলব্ধির ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থেকে, তার নাম 'আমি'। আমি আছি বলেই সবকিছু আছে, আমার কাছে অর্থবহ হ'য়ে আছে, হ'য়ে আছে বার্তাবহ। উপনিষদেও ঐ একই বাণী ধ্বনিত হয়েছে—'অমোনামাস্যমা হি তে সর্বমিদং স হি জ্যেষ্ঠঃ—' আপনি 'অম' নামধারী, কারণ নিখিল জগৎ (প্রাণরূপী) আপনার মধ্যে বিদ্যমান। আপনি (অর্থাৎ আমি) জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, দীপ্তমান ও অধিপতি···"

পুত্র, আমি কি তোমায় বোঝাতে পারছি কি অনুভূতি বেরিয়ে আসছে? পিতামহ, পিতা, পুত্র, আবার পুত্র, পিতা, পিতামহ: এই চলেছে জীবনের স্রোতস্বিনী—এখানে পিতা মানে মাতা-ও, পুত্র কন্যা ও, পিতামহ অবশ্যি মাতামহী-ও। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের অর্ধনারীমূর্ত্তি কল্পিত হয়েছে, স্ত্রী-পুরুষের সমান ভূমিকা ও অধিকারের। এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি হতে পারে না, যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই বৈদিক কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীদের দাবিয়ে রেখে এসেছে পুরুষ, যেমন ভারতবর্ষে তেমনি দুনিয়ার সর্বত্র, একমাত্র কতিপয় নারী শাসিত সমাজ ছাড়া।

পুত্রের কাছে পিতার জবানবন্দী করতে গিয়ে আমার বারবার মনে হচ্ছে আমরা, তুমি পুত্র, আমি পিতা, কত কাছে, কত দূরে। দূরত্ব ও নিকটত্ব কোনটা এই দুইয়ের অনিবার্য দ্বন্দ্বে জয়ী হয় তা নির্ভর ক'রে পিতা পুত্রের দ্বৈত আদান প্রদানে। 'প্রকৃতির পরিশোধে' রবীন্দ্রনাথ পিতা ও সন্তানের যুগপৎ নৈকট্য ও দূরত্ব আকুলতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন:

বালিকা: পিতা, পিতা, কোথা তুমি পিতা!
সন্ন্যাসী: (চমকিয়া) কে রে তুই!
চিনি নে চিনি নে তোরে, কোথা হ'তে এলি!
বালিকা: আমি! পিতা, চাও পিতা, দেখো পিতা আমি!
সন্ন্যাসী: চিনি নে চিনি নে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা!
আমি কারো কেহ নই, আমি যে স্বাধীন।...

[একটু পরেই]

সন্ন্যাসী: আয় বাছা, বুকে আয়, চাল অশ্রুধারা!
ভেঙ্গে যাক এ পাষাণ তোর অশ্রুস্রোতে।
আয়, তোরে ফেলে আমি যাবো না বালিকা,
তোরে নিয়ে যাব আমি নতুন জগতে।

হে পুত্র, তোকে আমি বুকে জড়িয়ে হাতে হাত, প্রাণে প্রাণ রেখে, নতুন জগতে নিয়ে যাবার স্বপ্ন পোষণ করেছি বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। নিয়ে যেতে পারি নি।

আমরা, এ শতাব্দীর পিতারা, গড়তে পারিনি নতুন জগৎ। আমাদের ব্যর্থতা এ সমগ্র শতাব্দীর সংঘাতসংকুল ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিখিত রয়েছে।

॥ দুই ॥

আমি যে "এলাম" তার বুঝি যুগের ও সময়ের কিছুটা পারম্পরিক তাৎপর্য আছে। বছরটা ছিল ১৯২১, গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত আরম্ভের বছর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ছিল যার উপক্রমণিকা, এখন জাতীয় অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন তার যৌবন-জাগরণ। ১৯২১ এর প্রজন্ম তাদের পূর্বসূরীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষ শাসন-গঠন ক'রে এসেছে এই ঘটনা ঘনঘোর শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত। তোমরা, যারা জন্মেছ ভারত দ্বিখণ্ডিত ও স্বাধীন হবার পর, তারাও এখন এই কর্ম কোলাহলে সামিল হয়েছ। আমার কাহিনী, পুত্র, আবশ্যিক ভাবে স্বাধীন ভারতের পদযাত্রার সঙ্গে গ্রথিত। এই বিশাল ঐতিহাসিক নাটকে আমার ভূমিকা রামায়ণে লঙ্কা-সেতু নির্মাণে বাঁদরদের ভূমিকার চেয়েও ক্ষুদ্র। সব মহামানবিক সংগ্রাম এক একটি অগ্নিপ্রবাহ: ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামও তাই। তার উত্তাপ থেকে গণেশপুরের মতো অতি দুঃস্থ গ্রামও রেহাই পায়নি, রেহাই পায়নি রজনীকান্ত নামে এক ক্ষুদে জমিদার, তার পুত্রপৌত্ররা।

ক্ষুদে জমিদার ও রজনীকান্তর মধ্যে ব্যবধান ছিল বিস্তর। পার্মানেন্ট সেটেল-মেন্ট বঙ্গের ভূমি ব্যবস্থাকে জমিদারদের হাতে সঁপে দিয়েছিল। জমিদারীগুলো ভাঙতে ভাঙতে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম হয়ে গেল। কিন্তু জমিদারী মনোভাব রয়ে গেল প্রচণ্ড ও ব্যাপক। ক্ষুদে জমিদারদের বলা হত তালুকদার। আমাদের তালুক দশ-বারো ঘর প্রজা গণেশপুর গ্রামেই, আরোও কিছু প্রজা অনেক দূরে, ঠিক কোথায় আমি কোনোদিন বুঝতে পারিনি। গণেশপুরের প্রজাদের মধ্যে প্রায় সবাই জেলে, একঘর নাপিত, কয়েকঘর মুসলমান ক্ষেত-মজুর। প্রজাদের মধ্যে কারুর কারুর আর্থিক অবস্থা তালুকদারের চেয়ে ভাল। কিন্তু প্রজা-মনিব সম্পর্ক তালুকদারদের ও প্রজাদের মধ্যে বড় রকমের ব্যবধান তৈরী করে রেখেছিল। হিন্দু সমাজের অন্যান্য ব্যবধানের মতোই এই জমি অধিকারের ব্যবধান চিরস্থায়ী।

রজনীকান্ত ছিলেন ছোট তালুকদার, কিন্তু তাঁর নামডাক দশখান গ্রাম পেরিয়ে, মহকুমা শহর মাদারীপুর ছাড়িয়ে, জেলা শহর ফরিদপুর পার হয়ে কলকাতা পর্যন্ত হয়েছিল প্রসারিত। তার কারণ রজনীকান্ত ছিলেন প্রচণ্ড স্বদেশী। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী

আন্দোলনে তিনি বড় বড় জনসভায়,মনে আগুন জ্বালানো বক্তৃতার মাধ্যমে ইংরেজের রোষদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দু'বার তাকে জেলে যেতে হয়েছিল। একবার গ্রীষ্মকালে পুলিশ গণেশপুরে হানা দিয়ে রজনীকান্তকে না পেয়ে তাঁর বড় ছেলে দুর্জয় সিংহকে ধরে নিয়ে তিন মাস জেলে রেখেছিল। অথচ দুর্জয় সিংহের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না, তিনি ছিলেন মনে প্রাণে ইংরেজ ভক্ত।

রজনীকান্তকে দশ গ্রামের লোকেরা "ডাকাত" বলত। মাঝারী দৈর্ঘের দেহ, বাবরি চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, বড় বড় লালটে চোখ, দেহে অসাধারণ শক্তি, মনে অসাধারণ সাহস। লাঠিয়াল হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি একটি লাঠিয়ালের দল গড়েছিলেন। দলের বারোজন লাঠিয়াল ছিল তাঁর একান্ত অনুরক্ত। লাঠিয়াল গড়ার প্রয়োজন হয়েছিল গণেশপুর গ্রামের সীমান্ত দক্ষিণের খাল পেরিয়ে হোগলা। গ্রামের বিখ্যাত এক মুসলমান জমিদারের অত্যাচার থেকে সাধারণ প্রজা মানুষদের বাঁচাতে। জমিদার বাড়ীর লাঠিয়াল বাহিনীর সঙ্গে রজনীকান্তর লাঠিয়ালদের লড়াই বাধত, যদি বিনা কারণে বা অন্যায় কারণে জমিদারের লোকেরা কোনো গরীব প্রজাকে হঠাৎ বাড়ী-ঘর থেকে উৎখাত করবার উদ্দেশ্যে প্রজাদের পাড়ায় হানা দিত। এইসব লাঠির যুদ্ধে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রজনীকান্তর দল জয়ী হত।

গণেশপুর মুসলমান জমিদারের অধীনে নয়, অতএব রজনীকান্তর ওপর জমিদারের কোনো প্রভাব ছিল না। জমিদারের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রজাদের নালিশ রজনীকান্তর হাতে লিখিত হত। প্রজাদের টিপ-সই ও কদাচ স্বাক্ষরসহ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠান হত। একবার রজনীকান্তর লিখিত একখানা চিঠি আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। জমিদারদের কাছে রজনীকান্ত ছিলেন ডাকাত। তাঁকে শায়েস্তা করার জন্যে কোনো প্রচেষ্টাই সার্থক হতে পারে নি। জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর মধ্যে ছিল রজনীকান্তর গুপ্তচর। প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার খবর আগেভাগেই তিনি পেয়ে যেতেন। অসাধারণ ক্ষিপ্র গতিতে হয়ে যেতেন গায়েব। পুলিশ হানা দিত গণেশপুরে আমাদের বাড়ীতে। রজনীকান্তকে খুঁজে পেত না। কেউ জানতও না তিনি কোথায় গেছেন, কবে ফিরবেন।

আমি আমার বাল্যকালে শুনেছিলাম যে জমিদার বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে একবার রজনীকান্ত দেখা করতে গিয়েছিলেন মুখ্য জমিদার সৈয়দ জালালউদ্দিন মহম্মদের সঙ্গে। জমিদারীর মালিক ছিলেন দু'ভাই। সবাই বলত, ছোট জমিদার গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ ছিল আসল অত্যাচারী। রজনীকান্তর লাঠিয়ালরা তাঁকে জমিদারের কাছে যেতে

বারণ করেছিল। তাদের ভয় ছিল জমিদার বাড়ীর নায়েব গোমস্তারা লোকজন দিয়ে রজনীকান্তকে ঘিরে ফেলবে, লাঠিয়ালদের হাতে তিনি বন্দী হবেন। রজনীকান্ত হেসে বলেছিলেন, আমাকে বন্দী করতে পারে এমন শক্তি জমিদারদের নেই। শুধু আছে ইংরেজ সরকারের।

সৈয়দ জালালউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে রজনীকান্তর একঘণ্টারও বেশি কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি রজনীকান্তর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ গুলো তুলে ধরতে, "ডাকাত" রজনীকান্ত বলেছিলেন, আপনার অভিযোগগুলো সত্যি। কিন্তু যে সব প্ররোচনার বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হয় তার কোনো উল্লেখ করেন নি। আপনাদের লোকেরা গরীব ও অসহায় প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যায়। খেয়াল খুশি মতো প্রজাদের উৎখাত করে। প্রজাদের কাছ থেকে বাহুবলে টাকা পয়সা আদায় করে। তারা যে নিঃস্ব, কারু-কারুর দু' বেলা ভাত জোটে না, একথা ভেবে দেখে না। তাদের মেয়ে-বউরা আপনার লাঠিয়ালদের দৈনিক খোরাক। আপনার নায়েব-গোমস্তারাও এই ভোগ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখেন না। আপনি এসব অত্যাচার বন্ধ করুন, আমাদের "ডাকাতি" বন্ধ হয়ে যাবে।

বড় জমিদার রজনীকান্তর সঙ্গে বাক্যালাপে খুশি হয়েছিলেন। জমিদারী অত্যাচার কিছুটা লাঘবও হয়েছিল। বড় জমিদার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যদি রজনীকান্ত তাঁর জমিদারী দেখাশোনার নায়েবী নেন। রজনীকান্ত এককথায় চাকুরীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বলেছিলেন, জমিদার সাহেব, আমি জমিদারীর বিরুদ্ধে, কোনোও জমিদারের নোকর হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

"ডাকাত" রজনীকান্ত পরে হয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সৈনিক। গণেশপুর ও আশেপাশে গ্রামে এই আন্দোলনের স্রোতকে ডেকে এনেছিলেন রজনীকান্ত। এই জন্যে তাঁর পুরস্কার মিলেছিল। কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি গিয়েছিলেন এক নিখিল ভারত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জন-মহাসভায় ভাষণ দিতে। গণেশপুরের লোকের তাঁকে মালা পরিয়ে নৌকোয় তুলে দিয়েছিল। ফেরার সময়ও পদ্মা নদীতীরে তিনি গ্রামবাসীদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

রজনীকান্তর সব ছিল, আবার অনেক কিছু ছিল না। অর্থ ছিল না, কিন্তু তাঁকে কেউ কখনও দরিদ্র ভাবতে পারেনি। ত্রিপুরার মহারাজার নেক্ নজরে এসেছিলেন রজনীকান্ত, রাজ্যের রক্ষীবাহিনীতে কিছুদিন ছোট অফিসারের পদে মহারাজ তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। দেখা গেল রজনীকান্তকে দিয়ে যেমন অনেক ক্ষেত্রে ভাল কাজ

পাওয়া যায়, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে দেখা দেয় সমস্যা। মহারাজের রক্ষী বাহিনী সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে ধরণের ব্যবহার করত তা জমিদার জালালউদ্দিন সাহেবের লাঠিয়ালদের ব্যবহারের সঙ্গে সংমিল। অত্যাচারের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার রুখে দাঁড়িয়েছিলেন রজনীকান্ত। মহারাজার কাছে নালিশ পৌঁছেছিল যে রজনীকান্ত প্রশাসনের চাকায় অনবরত বাধা দিয়ে যাচ্ছে। মহারাজ রজনীকান্তকে সসম্মানে অবসর দিয়েছিলেন। দশটাকা মাসিক পেনসন করিয়ে দিয়েছিলেন। দশটাকা তখনকার দিনে অনেক টাকা। প্রচুর খেয়ে, খাইয়ে, দান ক'রে, লাঠিয়াল পোষণে এ টাকা ফুৎকারে উড়ে যেত। তাই অভাব লেগে থাকত সর্বদা। পুত্রবধূর গহনা বিক্রী করে গ্রীষ্মে আম খেতেন রজনীকান্ত।

রজনীকান্তর পত্নী, অর্থাৎ আমাব ঠাকুমা অনেক বছর আগে বিগত হয়েছিলেন। আমার বাবারা ছিলেন দু' ভাই এক বোন। একটি বোন বিবাহিত হবার পর প্রথম-বার বাপের বাড়ী ফেরবার সময়ে গভীর রাত্রে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল পেছনের বিস্তীর্ণ আমবাগানে। পরের দিন সকালে তাঁর দেহকে একটা আমগাছের ডাল থেকে ঝুলতে দেখা গিয়েছিল। দেখেছিল বাগানের উত্তরে এক ধোবা বাড়ীর লোকেরা। এই আত্মহত্যা রজনীকান্তকে বিশেষ বিচলিত করেছিল, এর চেয়ে বেশি এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা বাড়ীর লোকেদের মুখে আমি শুনতে পাইনি। আমার ঠাকুমাকে নিয়েও খুব কম কথাবার্তা শুনেছি, এমনকি আমার মাও কোনো দিন কিছু বলেননি আমাকে। যে খবরটা সবাই জানত, যা রজনীকান্তর পরিবারে বংশানুক্রমিক উপস্থিত, তা হল আমার ঠাকুমার হাঁপানী রোগ। এই রোগের উত্তরাধিকারী ছিলেন আমার বাবা, আমার বোন মধু। আমি এটুকু জানতাম যে রজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল নিরেট সংসারী, তিনি প্রায় কখনই মৃত পত্নীর নাম করতেন না, অন্য স্ত্রীলোকে তাঁর প্রলোভন ছিল যথেষ্ট। আমার কাকিমা সুন্দরী ছিলেন, কাকা ছিলেন তাঁর সঙ্গে সুগভীর প্রেমে আবদ্ধ। আমার যখন সাত বছর বয়স তখন রজনীকান্ত প্রয়াত হন। সাত বছর বয়সেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম আমার কাকা তাঁর স্ত্রীকে গ্রামে রাখতেন না পিতৃদেবের ভয়ে। সুদীর্ঘ পঁচাশি বছরের সর্বশেষ বছর রজনীকান্ত নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আমাদের পরিবারে বাবার এক বিধবা কাকিমা তাঁর পুত্র নিয়ে বাস করতেন, তাঁদের অন্যকোনো সংগতি ছিল না। আমার মনে আছে রজনীকান্তর শেষ বছরে, বাড়ীতে একদিন বেশ কিছু উত্তেজনা ঘটেছিল রাঙাঠাকুমাকে নিয়ে। আমি

জানতে পেরেছিলাম সেবারত রাঙাঠাকুমাকে অসুস্থ রজনীকান্ত এক রাত্রে বিছানায় টানবার চেষ্টা করেছিলেন। আমার মা'র সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কিন্তু আগাগোড়া বিশুদ্ধ। আমি লক্ষ্য করতাম রজনীকান্তর সেবা শুশ্রূষায় মা'র ভূমিকা ছিল খুবই সামান্য।

রজনীকান্তর দুই পুত্র, আমার বাবা ও কাকা। কাকা ছিলেন সুপুরুষ, দেহে ছিল না মেদাধিক্য, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে এম. এ. পাশ করে বঙ্গদেশের বাইরের বিহার, নেপাল, পাঞ্জাব ও বর্মাতে অধ্যাপনা করেন। আমার খুড়তুতো ভাইবোনেরাও ছোটবেলা থেকে বঙ্গের বাইরে মানুষ। মাঝে মধ্যে কাকা সপরিবার গ্রামে আসতেন, তখন সবকিছু কি রকম বদলে যেত। বাজার থেকে এমন সব জিনিস আসতো যা আমি আগে কখনো দেখতে পাইনি। মিঠাইওয়ালা এসে হাঁড়ি ভর্তি রসগোল্লা, পানতুয়া, কাচাগোল্লা ও ক্ষীর দিয়ে যেত, বড় বড় মাছ আসতো, অনেক সবজী এবং ফল। আমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট খুড়তুতো ভাই বাদলকে ইংরেজী ও বাংলায় প্রথমপাঠ শেখাবার জন্যে কাকা কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেন রঙ বেরঙের বই, চার্ট, সুন্দর বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক। বাদল আমার পিঠোপিঠি ভাই, আমার সারা জীবনের নিকট বন্ধু। খুড়তুতো দিদি রাণু ধবধবে ফর্সা, আমার চেয়ে তিন বছরের বড়, আমি যখন স্কুলের প্রথম শ্রেণীগুলিতে পড়ি, তখন সে প্রথম যৌবনে চলচল্। রাণু, যাকে আমি বলতাম দিদি, একটি গ্রামীন বালকের হৃদয় মন কেড়ে নিয়েছিল। সারা জীবন আমি বোধহয় আর কাউকে এভাবে ভালোবাসিনি। স্কুলে টিফিন নিয়ে যাওয়া আমার ও মধুর পক্ষে সম্ভব হত না। আমরা ভাত খেয়ে স্কুলে যেতাম, স্কুল থেকে ফিরে খেতাম মুড়ি। মাঝে মাঝে মা একটি-দুটি পয়সা দিতেন। সে পয়সা জমিয়ে আমি স্কুলের পাশ থেকে খুব ভাল সন্দেশ কিনতাম। একটির দাম দু' পয়সা। সেই সন্দেশ এনে দিদিকে কাছে ডেকে শুধু ওকেই দিতাম। দিদি জিজ্ঞেস করত, আমি খেয়েছি কিনা। আমি মিথ্যে বলে ঘার নেড়ে জানাতাম, খেয়েছি। দিদিকে সন্দেশ খেতে দেখে আমার মন প্রাণ যেভাবে ভরে উঠত, জীবনে সেরকম অনুভূতি সম্ভবত আর হয়নি। দিদি কিন্তু আমাকে ছোট ভাই হিসেবেই দেখত। আমাদের ছোটবেলার ছেলেমেয়েরা কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের দিকে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় মনের এবং সদ্য বেড়ে ওঠা দেহের আকুলতা বিস্তীর্ণ একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যেই স্ফূর্ত করতে বাধ্য হত, যদি সে আকুলতা চেপে থাকা অথবা অনুভব না করার বেড়া তাদের ঘিরে না রাখত। দিদির সঙ্গে ভাব ছিল বিরাট

একান্নবর্ত্তী পরিবার ও বাড়ীর অন্য শরিকদের ছেলেদের। হিংসেয় আমার দেহ মন জ্বলে যেত, কিন্তু মুখফুটে কিছু বলবার অধিকার বা সাহস ছিল না।

আমার যখন জন্ম হল তখন রজনীকান্ত মধ্যাহ্নের আহারে বসেছিলেন। আমাদের বসতঘরটা ছিল বাড়ীর দক্ষিণ কোণে। তার নাম ছিল দক্ষিণের ঘর। বিরাট আটচালা ঘর। খুব উঁচু মাটির ভিত, মেঝেও মাটির। চারদিকের দেওয়াল ও ছাত মোটা টিনের। ঘরের মধ্যে ছিল অনেক ঘর, বাঁশের বোনা দেওয়াল দিয়ে আলাদা করা। খুব বড় বড় মোটা কাঠের চারটে দরজা আটচালার চারদিকে। শোওয়ার জন্য ছিল কাঠের তক্তপোষ। রজনীকান্তর ঘরখানা দক্ষিণে, বিরাট ঘর। ছ'টা লোহার শিকওয়ালা কাঠের জানলা, রজনীকান্তর তক্তপোষের ওপরে দুটো, তার মধ্যে যেটা দক্ষিণ দিকে সেটা দিয়ে দেখা যেত দুটো বড় বড় কামিনী ফুলের গাছ, দশ-বারোটা নারকেল গাছ এবং দূরে পুকুর পাড়ে বড় বাঁশঝাড়। এই জানলা দিয়ে প্রায় সবসময়ই সুন্দর বাতাস আসত, আর দেখা যেত আকাশ, বর্ষায় কৃষ্ণকঠিন, শরতে সীমাহীন নীল, হেমন্তে সে নীল অনেকখানি হালকা, শীতে আকাশের রঙ প্রায়ই স্লেট্ বর্ণ, বসন্তে সাদা মেঘের নৌকো চড়ে নীলের প্রত্যাবর্তন, গ্রীষ্মে প্রচণ্ড রোদে তাপে আকাশ ক্লান্ত ও বিষণ্ণ।

যে রবিবারে আমার জন্ম এক ভাদ্রমাসের শেষ প্রান্তে, সেদিন সকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার, বর্ষা শেষের রোদ তেজহীন। রজনীকান্তর দুপুরের আহার প্রতিদিনের এক একটি সমারোহ। বিরাট কাঁসার থালাতে বাটি দিয়ে তৈরি মাঝারী সাইজের ভাতের গোল মণ্ডল, তাতে একটি ভাতেরও স্থানচ্যুতি অমার্জনীয়। একই সাইজের পাঁচটি বাটিতে সাজানো পঞ্চব্যাঞ্জন। তার মধ্যে থাকবে অন্তত একপোয়া মাছের একখানা বা দু'খানা টুকরো, নিখুঁত আকার দুটোরই, এককোণে একটু ভাজনও গ্রহণীয় নয়। অবশেষে একবাটি ক্ষীর। চারদিকে বাড়ীর স্ত্রীলোকরা ঘিরে বসবে, আহার তত্বাবধানের জন্যে ; একজন হাত পাখা দিয়ে বাতাস করবে অন্নব্যাঞ্জনে মাছি না পড়ে, অন্য একজন হাওয়া করবে রজনীকান্তকে। যে রেঁধেছে সে আগাগোড়া উপস্থিত থাকবে ক্রটি-বিচ্যুতির কৈফিয়ৎ দিতে, প্রশংসা কুড়োতে। খুঁদে জমিদার হলেও রজনীকান্তর জমিদারী মনোভাব, আজকাল যাকে বলে "লাইফ স্টাইল", ছিল পুরোপুরি বড় জমিদারদের।

এ হেন মধ্যাহ্ন ভোজন বাঁধা পড়ল যখন আমার এক বিধবা পিসিমা হঠাৎ হাজির হয়ে খবর দিলেন পুত্রবধূ ননীবালা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। রজনীকান্ত

আহার ক্ষান্ত করে এক মিনিট নীরব। সবাই দেখতে পেল, দেখে অবাক হল, তাঁর দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। বিবাহের সাত বছর পর মা'র গর্ভে প্রথম সন্তান, সেই সন্তান পুত্র। হয়ত রজনীকান্তর মনে পড়ে গেল তাঁর স্ত্রী এই সৌভাগ্য ভোগ করতে পারেন নি, হয়ত ভাবলেন তাঁর প্রথম পুত্র থেকে তিনি যে নৈরাশ্য পেয়েছেন, পৌত্র তার ক্ষতিপূরণ করবে। আহার ত্যাগ করে রজনীকান্ত দক্ষিণের ঘরের সংলগ্ন প্রসূতিঘরে উপস্থিত হলেন। গ্রামের 'দাই' তাঁর কাছে একটি সদ্যজাত পুরুষ শিশু একখানা ভাঁজকরা শাড়িতে জড়িয়ে নিয়ে এলো। বলল, "নাতি হয়েছে কর্তা। জন্মাবার পরেই যদি দেখতেন! সারা গায়ে কালো 'ছ্যাতা'। সাবান দিয়ে ঘসে ঘসে সরাতে হল। এখন বেশ মানুষ মানুষ মনে হচ্ছে।" রজনীকান্ত শিশুর মুখখানাকে কিছুক্ষণ দেখলেন। বললেন, "গায়ে 'ছ্যাতা' নিয়ে জন্মালে বড় মানুষ হয়।" মা'র শরীর ঠিক আছে কিনা জানতে চেয়ে তিনি চলে গেলেন নিজের ঘরে।

জন্ম থেকে সাত বছর আমি ছিলাম তাঁর চোখের মণি।

আমার জন্মাবার সময় পিতা দুর্জয় সিংহ তাঁর কর্মস্থল খুলনায়। তাঁকে 'তার' করা হল। তার করতে হলে গণেশপুর থেকে আড়াই মাইল দূরে ঘড়িসার যেতে হয়। গ্রামের নিকটতম গঞ্জ। কাপড় জামা জুতো কিনতে হলেও আমাদের ঘড়িসার যেতে হত।

রজনীকান্ত সম্বন্ধে দুটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি আফিম খেতেন। একদিন তাঁর শোবার ঘরের পরেই অন্য একটা ঘরে প্রকাণ্ড সিঁদ কেটে চোর বা চোরেরা ভেতরে ঢুকে মা'র যেটুকু সামান্য যা কিছু ছিল সব চুরি করে নিয়ে যায়। তার মধ্যে ছিল বাপের বাড়ী থেকে বিয়ের সময় পাওয়া একজোড়া সোনার বালা। এটা চুরি হওয়ায় মা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। রজনীকান্তর কাছে ঘটনাটা ছিল অত্যন্ত অপমানকর। ডাকাত হিসেবে দশখানা গ্রামে তিনি প্রসিদ্ধ। নিজের প্রজাদের তিনি সন্তানের মত স্নেহ করতেন, কারুর বিপদে-আপদে তৎক্ষণাৎ পাশে দাঁড়াতেন। শীতে কাতর হয়ে কেউ দেখা করতে এলে নিজের একমাত্র গরম চাদর তুলে দিতেন তার হাতে। শুধু লাঠিয়াল হিসেবে নয়, দয়াবান অভিভাবক হিসেবেও প্রজাসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল। সেই রজনীকান্ত বেঁচে থাকতে তাঁরই ঘরে সিঁদ কেটে চোর ঢুকে পুত্রবধূর সর্বস্ব নিয়ে যাবে, এই অপমান তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। খবর গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ নিকটতম থানায়, ভেদেরগঞ্জে। পুলিশ চলে

এসেছিল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। রজনীকান্তর কথামত বারো-চোদ্দজন লোককে ধরে নিয়ে এসেছিল আমাদের বাড়ীতে।

তারপর এলেন দারোগা। দারোগার সঙ্গে রজনীকান্ত কথা বলতেন ইংরেজী ভাষায়। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারেন নি কিন্তু ইংরেজী ভাষায় আশ্চর্য দখল ছিল তাঁর। ভিক্টর হুগো'র 'লা মিজারেবলস্' ছিল তাঁর পুরো মুখস্ত। অনায়াসে আবৃত্তি করে যেতে পারতেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এডমণ্ড বার্কের বক্তৃতাগুলি, নেপোলিয়নের জীবনী থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, প্রায় পুরো 'প্যারাডাইস লষ্ট'। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটক, বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা, মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাথ বধ, এইসব বইগুলি তাঁর প্রায় মুখস্ত ছিল। জনতার কাছে বক্তৃতা করার সময় এসব বই থেকে তিনি অহরহ অনেক কিছু উদ্ধৃত করতেন। রাজপুরুষের সঙ্গে ইংরিজীতে বাক্যালাপ করার সেকালে ছিল উচ্চ-শিক্ষা ও আভিজাত্যের পরিচয়। জমিদার জালালউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালেও দুজনের কথাবার্তা হয়েছিল ইংরেজীতে।

একদল প্রজাদের কোমরে দড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখেছিল পুলিশ আমাদের বাড়ীর বৈঠকখানায়, পূজা মণ্ডপের বরাবর উল্টো দিকে। দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে রজনীকান্ত একসময় বৈঠকখানা ঘরে উপস্থিত হলেন। আমাদের ঘরে চেয়ার 'ছিল মাত্র একটি। তার একটি হাতল ভাঙা। তাতে বসলেন দারোগা। রজনীকান্ত বসলেন বৈঠক-খানার তক্তপোষের ওপরে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছি আমিও। দুর্গা-প্রতিমার এককোণে একটি ছোট ইঁদুরের মতো। রজনীকান্তর কোল ঘেষে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

রজনীকান্তর সঙ্গে দারোগার কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। ধরে আনা লোকগুলি পাথরের মত নিশ্চুপ। এই নীরবতা ভঙ্গ করে হঠাৎ নিনাদিত হল রজনীকান্তর মেঘগর্জনের মত কণ্ঠস্বর। "তোদের মধ্যে যে চুরি করেছিস তাকে স্বীকার করতে হবে। যদি স্বীকার না করিস তাহলে দারোগা সাহেব তোদের সবাইকে নিয়ে যাবেন থানায়। পুরে দেবেন হাজতে। তখন পুলিশের ঠেঙ্গায় স্বীকার করতে বাধ্য হবি।"

লোকগুলি একসঙ্গে কেঁদে উঠল। সবার মুখে এককথা, "কর্তা, আমার কোনো দোষ নেই। আমাকে ছেড়ে দিন।" একটু পরে সবাই একসঙ্গে ওই একই কথা কেঁদে কেঁদে বলে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে রজনীকান্তর ধমক, দারোগার শাসানি, কিন্তু ওই সমবেত আর্ত-আবেদনের শেষ নেই। এইরকম চলল কিছুক্ষণ। তারপর

আমার আর সহ্য হল না। অনেকক্ষণ ধরে কান্না পাচ্ছিল আমার। কোনোমতে চেপে ছিলাম। এখন আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কান্নার মধ্যেই বলতে লাগলাম, "দাদু, এদের ছেড়ে দাও। এরা সবাই কাঁদছে। এদের ছেড়ে দাও।"

আমার কান্না ও আবদার শুনে লোকগুলো আরও জোড়ে কাঁদতে লাগল। আরো উঁচু পর্দায় ধ্বনিত হল তাদের কাতর মুক্তি প্রার্থনা। তাদের চিৎকার শুনে আমিও আরো জোরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম এবং বলে গেলাম, ওদের ছেড়ে দাও দাদু, ওদের ছেড়ে দাও, ওদের ছেড়ে দাও··· ।

রজনীকান্ত আমাকে বৈঠকখানা থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। আমি কামড়ে ধরলাম তার ধুতির কোঁচা। হঠাৎ রজনীকান্তর দু'গাল বেয়ে চোখের জল ঝরতে লাগল। তিনি দারোগাকে ইংরেজীতে কি সব বললেন। দারোগা পুলিশদের হুকুম করলেন লোকগুলোকে ছেড়ে দিতে। প্রত্যেকটা লোক রজনীকান্তকে, দারোগাকে ও আমাকে প্রণাম করে চলে গেল।

আমার তখন সাত-বছর বয়স। সবে গ্রামের স্কুলে নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েছি। নিজেই হেঁটে স্কুলে যাই। স্কুলে মন টেকে না। মাঝে মাঝে মাষ্টার মশাই বাড়ী পাঠিয়ে দেন। আমি জানি আমার দাদু খুব অসুস্থ। ডাক্তার, কবিরাজ প্রতিদিন বাড়ীতে আসা-যাওয়া করছে। পাশের গ্রামে ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছেন এক সিভিল সার্জন। তাঁকে খবর দিতে তিনি তড়িঘড়ি চলে এলেন রজনীকান্তকে দেখতে। ওষুধ লিখে দিলেন। লোক পাঠিয়ে ঘড়িসার থেকে ওষুধ আনানো হল। বাড়ীতে সবার মন খারাপ। কারু মুখে হাসি নেই। হঠাৎ আমার পিতৃদেব চলে এলেন তাঁর কর্মস্থল থেকে। কাকামণি থাকেন অনেক দূরে, পাঞ্জাবে। তাঁকে চিঠি দেওয়া হল কিন্তু সবাই জানত তিনি আসতে পারবেন না। আমি রজনীকান্তর কাছে যেতে পারছি না। শুধু সন্ধ্যের পরে সামান্য একটু সময়ের জন্য আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি কাতর কণ্ঠে আমার সঙ্গে দু'একটা কথা বলছেন। তাঁর রুগ্ন হাত বোলাচ্ছেন আমার মুখে, কপালে, মাথায়। একদিন আমার সামনেই বাবাকে বললেন, "এই ছেলেটাকে ভাল করে মানুষ করিস।" আমার খেয়াল হল দাদুর কণ্ঠে কোনো জোর নেই। খুব আস্তে উচ্চারিত হয়েছে কথাগুলি।

সেদিনের বার-তারিখ আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে ক্লাসে আমার মন টিকছিল না। কেবল কান্না পাচ্ছিল। হঠাৎ দেখি আমার বাবা খালি দেহকে

ধুতির খুঁটে আবৃত করে ক্লাসের দুয়ারে হাজির। শিক্ষকমশাইকে তিনি কি যেন বললেন। আমি আদেশ পেলাম বাড়ী চলে যেতে।

বাবার সঙ্গে বাড়ী আসার পথে কোনো বাক্যালাপ হল না। অর্থাৎ আমিও কিছু প্রশ্ন করলাম না, তিনিও বললেন না কেন আমাকে অসময়ে ক্লাস থেকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন। বাড়ী পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল রজনীকান্তর শয্যার পাশে। তাঁর চোখ মুদ্রিত, ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। কে যেন জোরে বলল, আমি এসেছি, তাকিয়ে আমাকে দেখতে। রজনীকান্তর মুদ্রিত চোখ দুটি উন্মুক্ত হল। দৃষ্টি পড়ল আমার উপর। তাঁর চোখ ভরা জল। হাত খানা নড়ে উঠল। আমার মনে হল আমাকে খুঁজছে। কিন্তু ভয়ে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম না। রজনীকান্তর ওষ্ঠাধর কম্পিত হল। গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোলো না। কে যেন বলল, কিছু বলতে চাইছেন। পঁচাশি বছরের দেহ চোখ বুজল। পাশে বসে জ্যেঠামশাই গীতা পাঠ করছিলেন। তিনি বাবার দিকে চাইলেন। স্ত্রীলোকেরা একসঙ্গে কেঁদে উঠলেন। আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

রজনীকান্তর মৃত্যু গণেশপুরের ইতিহাসে, আমাদের পরিবারের জীবনে, একটি ঘটনাবহুল যুগের অবসান। আমাদের জীবনটা পাল্টে গেল। রজনীকান্তের দুই ভাই অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। তাদের দুই পরিবার আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত। রাঙ্গা-ঠাকুমা তাঁর এক ছেলেকে নিয়ে আমাদের ঘরেই থাকতেন। বড় ছেলে বাস করত কুচবিহারে এক পিসিমার সঙ্গে। আরেক ঠাকুমা তাঁর এক মেয়েকে নিয়ে নিজেদের ঘরে বাস করতেন। তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল বরিশালের গ্রামে। দু'তিনটি সন্তান রেখে তিনি মারা গিয়েছিলেন। ছোট মেয়ে, আমাদের কুন্তি পিসি, মা'র সঙ্গে আলাদা ঘরে বাস করলেও খেত আমাদের সঙ্গে।

দুই ঠাকুমার জন্যে ছিল হবিষ্যি রান্নাঘর। সেখানে প্রায়ই খুব সুস্বাদু নিরামিষ তরকারী তৈরী হত। উপাদান ছিল কলমী শাক, পুঁই শাক, ঢেকী শাক ইত্যাদি। বাড়ীর মধ্যেই অথবা আশপাশ থেকে তুলে আনা। সজনে ডাটার চড়চড়ি হত। কুমড়ো পাওয়া যেত আমাদের হাতে তৈরী ছোট ছোট ক্ষেত থেকে। আমাদের মানে রাঙ্গাঠাকুমার ছেলে চিনিকাকু ও আমি। চাল ডাল মশলা ছাড়া দোকান থেকে আর কিছু কিনতে হত না। চাল ডাল তো অবশ্যি রজনীকান্তই যোগান দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে এইসব ভার পড়ল আমার বাবা দুর্জয় সিংহের উপর। অর্থাৎ আমার মা'র ওপর।

রজনীকান্তের সময়কার বাড়ীটার একটু বর্ণনা দেওয়া যাক। বলেইতোছি আমাদের দক্ষিণঘর। বসতভিটা ছাড়া দু'টি রান্নাঘর, একটি আমিষ, অন্যটি নিরামিষ। নিরামিষ রান্নাঘরের কাছাকাছি রজনীকান্তর দুই ভাইয়ের ঘর। ছোট-দাদু, যিনি আরো বেশ কিছু বছর জীবিত ছিলেন, বাস করতেন বাঁ দিকের দক্ষিণ কোণের ঘরে, সঙ্গে রান্নাঘর ও একটা বাড়তি ঘর। এখানে নানারকম জিনিসপত্র জমা থাকত। হবিষ্যি রান্নাঘরের ডান দিকে কুন্তি পিসিদের ঘর, পেছনে বাড়ীর সীমান্ত একটা খাল, যা প্রতি বর্ষায় নদীর উদ্বৃত্ত জল টেনে আনত আমাদের পুকুরে। দক্ষিণের ঘরের পরে বেশ বড় একটা উঠোন। এখানে মাঝে মধ্যে পালাগান হত, হত সরস্বতী পুজো, লক্ষ্মী পুজো এবং আরও কিছু কিছু উৎসব। এই উঠোনের তিন-দিকে ছিল তিনটি বসতঘর। পশ্চিমে রাঙ্গাঠাকুমার ঘর, আমার সেই ছোটবেলাই ভেঙ্গে পড়ে গেছে, সারানো হয়নি। উত্তরে ছিল জ্যেঠামশাইয়ের ঘর ও রান্নাঘর। জ্যেঠামশাই মানে বাবার খুড়তুতো দাদা। তিনি ও বড়মা নিঃসন্তান। জ্যেঠামশাই ছিলেন আমাদের গ্রাম্য জীবনের অভিভাবক। রান্নাঘরের পাশে পাতিলেবুর বাগান, দুটো অনেক উঁচু তালগাছ, তার গা ঘেষে চলে গেছে অন্দরমহলের পায়খানা। পুব-দিকে আমাদের বাড়ীর আর এক শরিক, রজনীকান্তর দূর সম্পর্কের কোনো এক ভাইয়ের বংশধরগণ। এই পরিবারের অভিভাবক, আমার অন্য এক জ্যেঠামশাই, রণজিৎ কুমার, অনেক দূরের অন্য গ্রামে স্কুল শিক্ষক। তিনি সপ্তাহে কেবল রবিবার বাড়ীতে থাকতেন। বাকীটা কাটত স্কুলেরই পাশে ভাড়া করা একখানা ঘরে। তাঁর পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। এদের সবাই আমার ভাইবোনের মত। আমার ছোটবেলায় এদের অবস্থা আমাদের চেয়েও দরিদ্র।

রজনীকান্ত বিগত হবার পর থেকে এতবড় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব বাবার, মা'র ও আমার উপর পড়ল। বাবা টাকা পাঠাতেন। মা ও আমি সংসার চালাতাম। বাজার-আস্তার করতে হত আমাকে, সেই সাত বছর বয়স থেকে।

এই পরিবেশে গণেশপুর গ্রামে আমার বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবনের প্রারম্ভ। আমার ঘনিষ্টতম আপনার জন মা, সবচেয়ে স্নেহের পাত্র বোন মধু ও ভাই কানু, নিকটতম বন্ধু অনেক—বাগানের গাছগুলি, রাস্তার দুধারের জঙ্গল, বিশেষ করে অনির্বাণ দীপশিখার মতো প্রতিভাত পদ্মা, যার তীরে বসে বসে অথবা বেরিয়ে কাটত আমার প্রতি বিকেল। যার সঙ্গে হত আমার বালক মনের অবিরাম কথপোকথন।

রজনীকান্ত তখন পরলোকে। আমি স্কুলের মধ্যম স্তর অতিক্রান্ত ক'রে উচ্চ স্তরে পদার্পণ করেছি।

একদিন গণেশপুরে মুখে মুখে প্রচারিত সংবাদপত্রে ঘোষিত হ'য়ে গেল, কে একজন স্বাধীনতা সৈনিক এখানে এসে হাজির হ'য়েছেন। তার নাম অনন্ত। আমাদের সবার অতি সহজে লব্ধ অনন্ত দা।

গণেশপুরে একটি সাধারণ পাঠাগার ছিল। আমাদের বাড়ীর পেছনের আম-বাঁশ বাগান পেরিয়ে পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটলে পাঠাগারে পৌছানো যেত। চক্রবর্ত্তী বাড়ীর একখানা অব্যবহৃত ঘরে এই পাঠাগার, দেদার বাংলা বই। চক্রবর্ত্তী বাড়ীর অনাদিকাকা প্রতিদিন বিকেলবেলা দু ঘণ্টা লাইব্রেরীর পর্যবেক্ষক। গ্রামের যে-সব শিক্ষিত ভদ্রলোকরা কলকাতা বা অন্য শহরে প্রবাসী ছিলেন, তাঁরাই মাঝে মধ্যে দু দশখানা বই দান করতেন 'গণেশপুর সাধারণ পাঠাগারে'। শরৎ ঋতুতে দুর্গা পুজা উপলক্ষ্যে যখন তাঁরা গ্রামে ফিরতেন, তখন প্রতি বছর এক বিকেলে পাঠাগারের বাৎসরিক সভা বসত। কয়েকটি মেয়ে গান করত, কয়েকটি ছেলে আবৃত্তি, বড়দের মধ্যে দু'চার জন ভাষণ দিতেন।

আমার মা'র ঢালাও অনুমতি ছিল যে-কোনো বই পড়বার। তাই বারো বছর অতিক্রান্ত হবার আগেই আমি কয়েকশ' বাংলা উপন্যাস পড়ে ফেলেছিলাম। গণেশ-পুরে সে-সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না, পাঠাগারে কবিতার বই ছিল না বললেই হয়। জনপ্রিয় ছিলেন বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র, মহী চট্টোপাধ্যায়, অনুপমা দেবী, তারাশঙ্কর, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, নিরুপমা দেবী, দীনেন্দ্রকুমার রায়, নরেশ সেনগুপ্ত, পরশুরাম, প্রমথ চৌধুরী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, প্রমথ বিশী, হেমচন্দ্র বসু, সীতা দেবী, সরোজ রায়চৌধুরী, সতীনাথ ভাদুরী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীন্দ্রলাল বসু: এঁদের (নাম মনে নেই আরও কিছু লেখকের) কোনো না কোনো উপন্যাস আমার পড়া হয়ে গেছে—অনেক রাত্রি জেগে, চোখের জল, বুকের রুদ্ধশ্বাস, তরুণ হৃদয়ের আন্দোলন এসব উপন্যাস কেড়ে নিয়েছে একটি উঠতি বালকের কাছ থেকে। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘদূত' মা'র সাহায্য নিয়ে পড়ে ফেলেছি, এবং 'গোরা' উপন্যাস পড়তে পড়তে চলে গেছি এক অপূর্ব দেশে যার নাম ভারতবর্ষ, যার বিশেষ কিছুই খুঁজে পাইনি গণেশপুর গ্রামে। এখন, এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে, এসব ঔপন্যাসিকদের অনেকেই ইতিহাস হ'য়ে গেছেন, তাঁদের উপন্যাসও এখন ইতিহাস। বসুমতী পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সেক্সপীয়রের

নাটক বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করেছিলেন, তাও আমি পড়ে ফেলেছি। "কল্লোল যুগ" তখন কলকাতায় শুরু হয়ে গেছে, যদিও গণেশপুরে তার হাওয়া পৌঁছয়নি। কিন্তু নজরুল ইসলাম ও দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমী কবিতা ও গান গণেশপুরের ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা গাইছে—সভায়, উৎসবে, গৃহে।

আমার পিতাঠাকুর উপন্যাস পড়া গর্হিত কাজ মনে করতেন। সারা জীবন তিনি একখানা উপন্যাস পড়েছেন। এটাই ছিল তাঁর পাঠ্যজগতের সীমানা। রবি ঠাকুরকে তিনি যুবক-যুবতীদের নীতিবোধ তরল করিয়ে দেবার দোষে দোষী মনে করতেন: তাঁর বিশ্বাস ছিল উপন্যাস পড়লে কিশোর কিশোরী যুবক যুবতীদের মনে যৌন-চেতনা ও রোমান্টিক ব্যাকুলতার সঞ্চার হয়। আমার মাকে তিনি তাঁর মাসিক পোষ্টকার্ডে বার বার সতর্ক করে দিতেন আমি যেন কদাচ উপন্যাস না পড়ি। তাঁর নির্দেশ ছিল কেবল মহাপুরুষদের জীবনী পড়ার। গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন তিনি বাড়ী আসতেন, নিয়ে আসতেন এক বা দুখানা মহাপুরুষ-পুস্তক। আশুতোষ ধরের ইংলিশ-বেঙ্গলী অভিধানের ধারাবাহিক সাহায্যে আমাকে সেগুলি পড়তে হতো। তাতে ঐ সব মহাপুরুষরা আমার কল্পনায় বিশেষ স্থান পাননি। কিন্তু সেই অনেক কষ্ট ও বেদনা থেকে যা আমি লাভ করেছি তা হলো অনেক ইংরেজী শব্দের দখল, অর্থ ও ব্যবহার হোক-না অনেক সময় ভ্রান্ত, হাস্যকর। দুপুরবেলা পিতৃদেব নিদ্রাবিলাসে দেহ ঢেলে দেবার সময় মাটিতে পাটির উপর বসে টানা দুঘণ্টা আমাকে লড়তে হতো আব্রাহাম লিংকন, জর্জ ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, গ্যারিবাল্ডি, নেলসন প্রমুখ ঐতিহাসিক বীরদের জীবনীর সঙ্গে।

মনে আছে, একদিন মাকে প্রশ্ন করেছিলাম, "অশ্লীল উপন্যাস কাকে বলে?"

মা জবাব দিয়েছিলেন, "আমি তো পণ্ডিত নই, অধ্যাপক নই, সমালোচক নই। তোর প্রশ্নের জবাব দেব কি করে?"

—"ওরা বলছিল কলকাতার নতুন লেখকরা অশ্লীল উপন্যাস আর কবিতা লিখছে।"

মা জানতে চেয়েছিলেন, "কারা? নাম কি তাদের?"

বলেছিলাম "আমি শুধু দুটো নাম শুনেছি। বুদ্ধদেব বসু আর প্রবোধ সান্যাল।"

—"এদের বই আছে তোদের পাঠাগারে?

—"জানি না।"

—"থাকলে নিয়ে আসিস। আগে আমি পড়ব, তারপর তোকে পড়তে দেব-যদি তোর পড়ার মতো হয়।"

—"কি করে বুঝবে আমার পড়ার মতো কিনা ?"

—"সব বয়সে সব খাদ্য হজম হয় না। দেখতে হবে কোন বই তোর পক্ষে হজম করা সহজ বা কঠিন।"

অনন্তদার (গণেশপুরের জীবনে) ঐতিহাসিক আবির্ভাবের আগে আমি এবং আমার পিতার প্রসঙ্গটা আর একটু বর্ণনা করছি। পিতা-পুত্র সম্পর্ককে যেমন সারা পৃথিবীতে তেমনি আমাদের এই ভারতবর্ষে কালের প্রবাহ বার বার বদলে দিয়েছে। পশ্চিমের সমাজে, যাকে ইংরাজীতে বলে পোষ্ট-ইনডাসট্রিয়াল সোসাইটি, এখন পারিবারিক সম্পর্ক অতিশয় শিথিল: আমেরিকা ইংল্যাণ্ডে একশ'টির মধ্যে চুয়ান্নটি বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, য়ুরোপের স্ক্যানডিনিভিয়ান দেশগুলিতে, যেমন সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা আরও বেশী। ছেলেমেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত পিতৃ-মাতৃ গৃহ থেকে সরে পড়ে, তৈরী করে নিজেদের স্বকীয় স্বাধীন জীবন। পিতামাতার সঙ্গে বন্ধন এখনও বর্তমান, বিশেষ করে মা'র সঙ্গে মেয়েদের, কিন্তু সে বন্ধনে পিতা স্বর্গ মাতা স্বর্গ, পৃথিবী থেকে দুজনে গরিয়ান বা গরিয়সী, এ ধরণের প্রাচীন সমাজের পারিবারিক মূল্যবোধ, এখন কল্পনার অতীত। এখন আমেরিকা-য়ুরোপে ষোল বছরের ভার্জিন মেয়ে নিয়মের ব্যতিক্রম।

আমাদের দেশেও পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। উপর তলার উচ্চ-শিক্ষিত আধুনিক সমাজে হাওয়া বইছে কিছুটা বেগে। নিচের তলায় মৃদুমন্দে। পশ্চিমের তুলনায় এ বেগ খুব মন্দ।

পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, একশ'র মধ্যে পঁচানব্বই ক্ষেত্রে পুত্রের ভবিষ্যৎ এখনও নির্দেশ করেন, অথবা নির্দেশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, পিতা। কোন স্কুলে ভর্তি হবে, কি বিষয় নিয়ে পড়বে, ক্যারিয়ার কি ক'রে বেছে নিতে হবে, কোথায় কার সঙ্গে বিবাহ হবে, এ সব মুখ্য বিষয়ে পিতার (এবং মাতার) ভূমিকা কোনোমতেই গৌণ নয়, অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য গ্রাহ্য।

তবু প্রায়ই যুবকদের মুখে শুনি, আমার বাবা ঠিক করেছেন আমি ডাক্তার হবো।

অথবা, বাবা চাইছেন আমি আই-এ-এস পরীক্ষা দিই।

কিম্বা, বাবা আমাকে ইঞ্জিনীয়ার হ'তে বলেছেন।

অথবা, আমি কলেজে পড়াবো বা রিসার্চ করবো, এতে বাবার আপত্তি নেই।

আমি যখন বালক-কৈশোর জীবন, অর্ধ-শতাব্দীর অনেক আগে, গণেশপুর নামক এক 'শিক্ষিত ভদ্রলোকদের' গ্রামে কাটাই, তখন পিতা-পুত্রের সম্পর্কটা কি ধরণের ছিল তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাইবে।

ছিল তোমার আমার ক্ষেত্রে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিপরীত।

দুর্জয় সিংহ বছরে তিনবার বাড়ী আসতেন। গ্রীষ্মের ছুটি ছিল দীর্ঘতম, পুরো দু'মাস। পুজোর ছুটি মাস খানেক। বড়দিনের ছুটি দু'সপ্তাহ।

পোষ্টকার্ডে মাকে জানিয়ে দিতেন কবে, কোন তারিখ এবং কি বারে তিনি সমাগত হবেন।

খুলনা থেকে স্টীমারে চেপে পালং আসতে হতো। তারপর আট-দশ মাইল হেঁটে গণেশপুরে। সঙ্গে থাকতো মুটের মাথায় শুধু একটা বিছানা। টিনের বাক্সও নয়, স্যুটকেস তো দূরের কথা। বিছানাটা সতরঞ্চি দিয়ে সুন্দরভাবে মোড়ান, পাটের দড়ি দিয়ে এমন শক্ত ক'রে বাঁধা যে যদি সেটা জীবন্ত কোনো পশু হতো, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু অনিবার্য।

অনেক সময় পালং থেকে নৌকা চেপে গণেশপুরের পদ্মানদী পর্যন্ত আসতে পারতেন। তখন সওয়ারী নিয়ে নৌকা চলতো, নির্ধারিত সব 'স্টেশনে' নেমে মাঝি ঢোল বাজাত। সওয়ারী পুরো হ'লে ছাড়ত সেই 'নদীট্যাক্সি', মন্থর তার গতি, নদীর মেজাজ ও বায়ুর গতি দিয়ে নির্ধারিত। প্রত্যেক নৌকায় দু'জন মাঝি; একজন, অনেক সময় দুজনেই, বৈঠা চালাতো; প্রয়োজন হলে প্রতিকূল বায়ুর সঙ্গে পাঞ্জা দিয়ে লড়ার জন্যে এক মাঝি "গুণ" অর্থাৎ লম্বা নারকেলের ছোবরার দড়ি নিয়ে তীরে নেমে যেত, দড়ি বাঁধা থাকতো নৌকার সঙ্গে, মাঝি তীরের মাটিতে চলতো 'গুণ' টেনে, সহকর্মী চালাত বৈঠা।

দুর্জয় সিংহের বাড়ী আসার দিন আমার ও মধুর কি চাপা আনন্দ। ঠান্ডা ভয়। কানু জন্মাবার পর—তারও। আনন্দের কারণটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না—পিতা বাড়ী আসছেন, সন্তানরা তো আনন্দ পাবেই। আহার্য দ্রব্যের চেহারা ও গুণ যাবে বদলে। সবচেয়ে বড় কথা, ঐ আষ্টে পৃষ্টে বাঁধা বিছানার মধ্যে অপেক্ষা করবে আমাদের, আরও অনেকের, লোভনীয় সব প্রাপ্তি।

কিন্তু ভয়? ভয় কেন?

ভয় এজন্যে যে আমরা আমাদের পিতাকে সামান্যই চিনতাম। তিনি আমাকে কোনোদিনও কাছে ডেকে আদর করেননি, বুকে তুলে নেননি, আমাকে হাত ধরে

বেড়াতে নিয়ে যান নি। ছোট বোন মধুকে বা তার পরের দু' ভাই কানু ও ভানুকে, ও আমার কনিষ্ঠ বোন বেনুকে, করেছেন কিনা মনে পড়ছে না, ক'রে থাকলে নিশ্চয়ই মনে পড়ত। অথচ প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন আমাদের। আমরা ছিলাম তাঁর হৃদয়ের ধন।

অনেক, অনেক বছর পরে, বয়স তখন আমার ত্রিশ পেরিয়েছে, চাকুরী করছি দিল্লীতে, পিতা অবসর প্রাপ্ত, সংসারের দায়িত্ব সব আমার, তখন একবার জ্বরে বিছানা নিতে হয়েছিল। জ্বরটা যেন উঁচু মানের, ঘোর ঘোর ভাব, তোমার মা শুধু ডাক্তার ডাকেন নি, রোজ অনেকক্ষণ কপালে জলপট্টি দিয়েছেন।

হঠাৎ রাত্রে ঘুম বা ঘোরের মধ্যেই চমকে জেগে গেলাম। খালি দেহে এক অপরিচিত হাতের আদর স্নেহ-স্পর্শ! চোখ খুলে দেখি আমার বাবা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আমার বুকে, কপালে, বাহুতে। সে স্পর্শ এখনও আমার শরীরে লেগে আছে। মনে তো আছেই। আমি কি আগে কখনো জেনেছি যে আমার বাবার হাত কত নরম, তার স্পর্শ কী ভীষণ স্নেহ ও ভালোবাসায় কতখানি স্নিগ্ধ?

প্রসঙ্গ থেকে সরে আসছি। তবু এখানে বলে রাখছি। আমি আমার বাবা, কাকা, কাকিমা, পিসিমা কারো দৈহিক ভালোবাসা পায়নি ছোটবেলা। ওটা সম্ভবত তখন চালু ছিল না। তোমরা যেমন আমার কোলে, পিঠে, বুকে, মাথায় ক'রে শিশুকাল থেকে বড় হয়েছ, এই রীতি তখন সম্ভবত সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'বাড়াবাড়ি' বড়দের চোখে ভর্ৎসনার ব্যাপার। অথবা হয়তো আমাদের পিতারা লাজুক ছিলেন। আমার কাকা তো উচ্চ-শিক্ষিত অধ্যাপক, প্রবাসেই তাঁর চাকরী জীবন, এবং আমাদের চোখে তিনি ছিলেন 'আধুনিক'। কিন্তু তাঁকেও আমি, অন্তত গ্রামের বাড়ীতে, দেখিনি বাদলকে বুকে জড়িয়ে আদর করতে, কোলে টেনে নিতে, হাত ধরে রাস্তায় অথবা বাগানে বেড়াতে।

দুর্জয় সিংহ কিন্তু তাঁর ছোটভাইয়ের সন্তানদের আদর করতেন। তাদের সঙ্গে খেলতেন পর্যন্ত। আমার নিশ্চয় দারুণ হিংসে হত। বুঝতে পারার ক্ষমতা ছিল না।

বিরাট বাড়ীর 'দক্ষিণের ঘর' আমাদের বাসগৃহ। তার খুব কাছাকাছি শ'দুই গজ পরে, রান্না ঘরের দরজা থেকে আমাদের বাড়ীর প্রবেশ পথটা পুরো দৃষ্টিগোচর। নদীতীর থেকে দুটো সমান্তরাল 'হাইওয়ে' গণেশপুরের যানবাহন, মানুষের গতিপথ। যানবাহন বলতে একমাত্র মানুষের পদযুগল। গরুর গাড়ী পর্যন্ত নেই। একটি

'হাইওয়ে' দাশ বাড়ীর দিকে দৌড়েছে, অথবা পায়ে পায়ে চলে গেছে, তার গা থেকে তৈরী আমাদের বাড়ীর প্রবেশ পথ। মোড় নিলেই রান্নাঘর থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রবেশ পথ বেশ দীর্ঘ, বর্তমানের মাপে আধ-কিলোমিটার হবে। প্রবেশ পথের মাথায়, ডানপাশে, শ্মশান ভূমি। আমাদের বাড়ীর বিভিন্ন শরিকদের মধ্যে যারা মরে যেতেন তাদের শব দাহ করা হোত এই শ্মশান ক্ষেত্রে। আম, বকুল ও অন্যান্য গাছে ছায়াঘন। রাস্তার উল্টো বাঁ দিকটাও নানা গাছে সবুজ।

শ্মশান ভূমি পেরিয়ে বসতবাড়ীর দিকে এগোলে, ডান দিকেই দোল মণ্ডপ। বাঁ দিকে সরু রাস্তা তৈরী হয়েছে এক প্রজা-বাড়ীর, যারা জাতে মেথর অর্থাৎ চামাড়, কিন্তু বেশ অবস্থাপন্ন, যাদের এক শরিক গ্রামের একমাত্র স্যাকরা, অন্য এক শরিক কাঠের মিস্ত্রী, শুধু দরিদ্র তৃতীয় শরিক গ্রামে মেথরের কাজ করতো, মৃত গরুর শরীরটা কয়েক মাইল দূরে চামারদের গ্রামে নিয়ে বিক্রী করে দিত, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, পৈতায়, শ্রাদ্ধে মেথরদের প্রাপ্য পেত। আমার যে জ্যেঠামশাই পরিবারে দুর্গাপূজার অধিনায়ক ছিলেন তিনি এই মেথর পরিবারের নাকি স্বরে কথা বলা বিহারীকে দিয়ে বেশ্যাঘরের মাটি সংগ্রহ করতেন, দুর্গাপুজোর সহস্র উপকরণের মধ্যে যা ছিল অন্যতম, এবং যার সামাজিক তাৎপর্য হলো হিন্দুর শত জাত-পাত বিভাগের মধ্যেও কোনো বড় উৎসব থেকে বাদ যেত না কেউই, বেশ্যাঘরের মাটিরও দরকার হোত দুর্গামাতাকে বাৎসরিক পূজন-সম্বর্ধনা জানাতে।

প্রজাবাড়ীর সঙ্গে বাইরের পুকুর, বসতবাড়ীর বহিঃ-সীমানা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই পুকুর বুঝি তিন পুরুষ পুরোনো, এর জল আমাদের পানীয় নয়। রজনীকান্তের এক ভাই অবনীকান্ত বসত বাড়ীর পুব সীমানায় নিজের খরচে একটু বৃহত্তর পুকুর খনন করে দিয়েছিলেন, শর্ত ছিল দশ বছর পুকুরের মাছ ও তিন পাড়ে নতুন তৈরী কলাবাগানের ফল তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি। এই পুকুরের জল আমরা খেতাম। সেদ্ধ করে খাবার নিয়ম তখনও গ্রামে পৌছায়নি। আমার মা ফিটকারী দিয়ে জল শুদ্ধ করে নিতেন।

পুকুর ঘেঁষে আমাদের বাড়ীর প্রবেশ পথ। ডান দিকে প্রজা জেলেদের পর পর তিনটে বাড়ী। জেলে প্রজাদের আর্থিক অবস্থা আমাদের থেকে ভালো, যদিও তা প্রজা-মনিব সম্পর্ককে একটুও বিদ্ধ করেনি। প্রজারা পূজার সময় ও বর্ষাকালে মাছ দিয়ে যেত মনিবদের সন্তুষ্টির জন্য, অবশ্যই বিনা দামে। পূজার সময় তাদের দেয়

খাজনাই ছিল বাজেটের প্রধান অংশ, বাড়ীর শরিকদের অনুদান যৎসামান্য। প্রজারা ভিড় করে আরতি দেখতে আসতো, আরতি নৃত্যে তাদের যুবকরা ছিল পারদর্শী। বিজয়া দশমীর দিন তারা একত্র হয়ে প্রতিমা তুলে নিয়ে বাইরের পুকুরে বিসর্জন করতো। রজনীকান্ত যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁর কান্না রোধ করা যেত না। তাঁর মৃত্যুর পর পাঁঠাবলি ও বিসর্জনের সময় যাঁর অশ্রু দুগাল ভিজিয়ে রাখতো তিনি আমাদের পিতা, দুর্জয় সিংহ। বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যেবেলায় প্রজাদের খাওয়ান হোত—ভাত, মাংস, মাছ, ডাল, ভাজা, তরকারি, অম্বল এবং রসগোল্লা। এই নেমন্তন্নে শ'খানেক মানুষ সমবেত হোত, পরিবেশনের ক্ষুদে অংশের ভার পড়ত আমাদের মতো 'ছেলেমানুষ মনিবদের' ওপর—নুন, জল, পাতিনেবু, হয়তো বা অম্বল, এবং সবশেষে পান-বিড়ি।

প্রবেশ পথের ডান পাশে রজনীকান্তের অন্য এক ভাই কয়েকটা জামরুল (আমরা বলতাম আমরুল) ও লিচু গাছ লাগিয়েছিলেন। বলেইছি তিনি তখন বহুদিন বিগত হয়েছেন, তাঁর বিধবা পত্নী এবং প্রথম দুই এবং পরে এক অবিবাহিত কন্যা আমাদের সংসারে খাওয়া-দাওয়া করতেন, যদিও তাঁদের নিজেদের বসতবাড়ী ছিল। রাঙাঠাকুমাদের ভেঙ্গে পড়া বসতঘরকে আমরা মাঝে মধ্যে খেলাঘর হিসেবে ব্যবহার করতাম। তার চেয়েও প্রয়োজনীয় একটা কাজ এই আধ-ভাঙ্গা ঘরখানা করে যেত। ঘড়ির কাজ। সকালের রোদ যখন সামনের দেওয়ালের ভাঙ্গা জানলা স্পর্শ করত আমরা জানতাম ন'টা বেজেছে। স্নানের জন্য দৌড়ে পুকুরে চলে যেতাম, স্কুলে দশটার মধ্যে হাজির হবার তাগিদ আমাদের উত্তেজিত করে তুলত। 'আমরা' মানে আমি ও অন্য শরিকদের পরিবারের তিন ছেলে, আমার বোন মধু যে পাঁচ বছর বয়স থেকেই গ্রামের প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করেছিল।

দুর্জয় সিংহ গ্রামের বাড়ীতে আসবার নির্দিষ্ট দিনে আমি, অনেক সময় আমার বোন, বারবার রান্নাঘর থেকে প্রবেশ পথের উপর নজর রাখতাম, মাঝে মাঝে দুর্গামণ্ডপ পেরিয়ে বাইরের পুকুর পর্যন্ত চলে যেতাম রক্ত-অস্থি-মজ্জার উত্তেজনায়। মা রান্নাঘরে নিঃশব্দে কাজ করে যেতেন, আর আমার অস্থিরতা দেখে মৃদু লাজুক হাসতেন। তাঁর নিজের উত্তেজনা প্রকাশ পেত না; যদিও আমার বোন আর আমি মৃদু স্বরে একে অন্যকে প্রশ্ন করতাম আজ মা'কে একটু বেশী খুশি খুশি মনে হচ্ছে না?

আমরা জানতাম দশ থেকে এগারোটার মধ্যে দুর্জয় সিংহের শরীর দেখতে পাব

বাড়ীর প্রবেশ পথের শেষ প্রান্তে। যখন তিনি টার্ন নেবেন দ্বিতীয় 'হাইওয়ে' থেকে। কিন্তু বাড়ীতে তো ঘড়ি নেই, তাই আমরা ঐ আধভাঙ্গা মাটির দেওয়ালে রোদ কতখানি উঠেছে তার উপর বার বার নজর রাখতাম।

এক সময় দুর্জয় সিংহের পদচালিত দেহ আমাদের চোখে ভেসে উঠত। তাঁর পিছে বিছানাবাহক মুটে। 'কুলি' শব্দটা আমাদের গ্রাম্য জীবনে ব্যবহৃত হোত না। গণেশপুরে ছিল না স্টীমার স্টেশন। নিকটতম রেললাইন তিনশত মাইল দূরে। আমাদের কাছে ভারবাহী মানুষেরা ছিল 'মুটে', যারা মোট বহন করে।

আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে মাকে বলতাম, "মা, মা, বাবা এসে গেছে।"

মা নড়ে চড়ে বসতেন। রান্নায় বা অন্য কাজে বাড়তি ব্যস্ততা দেখাতেন। একবার এসে প্রবেশ পথের উপর নজর রাখতেন।

পিতা ঠাকুর বাড়ীতে ঢোকার আগেই দুর্গা, কালী ও নারায়ণ পূজার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গড় হ'য়ে প্রণাম করতেন।

বাড়ীতে প্রবেশ করলে একটা থমথমে আবহাওয়া সৃষ্টি হোত।

আমরা দূরে স'রে যেতাম, দূর থেকে দেখতাম আমাদের পিতাকে। মাথাভরা আধপাকা চুল, আধপাকা দাড়ি গালে, পরণে আধময়লা ধুতি ও লংক্লথের আধময়লা পাঞ্জাবী, পায়ে ধুলোমাখা, পুরোনো, তালি লাগানো সস্তা জুতো।

মা এসে একবার কাছে দাঁড়াতেন। কোন বাক্যের বা চঞ্চলতার আদান প্রদান হোত না।

দুর্জয় সিংহ মুটেকে বলতেন, "বিছানাটা ঘরে গিয়ে তক্তপোষের উপর রেখে দে।" তারপর তিনি মুটেকে তার প্রাপ্য তুলে দিতেন। একটু বেশীই দিতেন, কারণ দূর থেকে আমরা দেখতাম মুটে বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। তারপর মা'র হাতে ছোট কলস থেকে ঢেলে দেওয়া জল দু'হাত অঞ্জলি ক'রে পেট ভরে পান করছে। কখনও হয়তো মা তার হাতে নাড়ু বা মোওয়া তুলে দিতেন। কখনও কিছুটা মুড়ি বা চিঁড়ে।

পিতৃদেব মাকে অথবা আমাদের জিজ্ঞেস করতেন না আমরা কেমন আছি। আমরা যে দূরত্ব রেখে তাঁরই চতুর্দিকে ঘুরছি সেটা তিনি জানতেন বা বুঝতেন কিনা তাও আমরা টের পেতাম না।

মা জানতে চাইতেন, পথে কোনো কষ্ট হয়েছে কিনা। স্টীমার লেট ছিল কিনা। পালং থেকে নৌকা নিয়েছেন না হেঁটে এসেছেন।

এক একটি শব্দে বাবা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেন।

মা রান্নাঘরে গিয়ে কাঠকয়লা ও তামাকের গুড়ো বাবার সামনে রাখতেন। তামাক পাতা পুড়িয়ে গুঁড়ো করে রাখতেন আমার মা। তাঁর নিজের অভ্যাস ছিল অঙ্গার ও তামাকপাতা চূর্ণ একসঙ্গে মিশিয়ে দাঁত মেজে সন্ধ্যে বেলা স্নান করার। বাবাও একই দন্ত-মাজন ব্যবহার করতেন।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতাম কতক্ষণে পিতৃদেব জলভরা ঘটি নিয়ে অনেকদূরে পুরুষদের পায়খানায় যাবেন। তারপর অন্দরের পুকুরে যাবেন স্নানে। ইতিমধ্যে বাড়ীর অন্য শরিকদের বড়দের কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন, মামুলি দু'একটা কথার আদান প্রদান হবে। আসবেন উত্তর ঘরের জ্যেঠামশাই, বীরেন্দ্র সিংহ, বাবা তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করবেন, তিনি করবেন মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ। বর্ষায় বৃষ্টির পরিমাণ, ইলিশ মাছের দর, বাগানে আম ফলেছে কি রকম, এধরণের দু'চারটে কথাবার্তা হবে। রাঙ্গাঠাকুমা এসে চুপ ক'রে কাছে দাঁড়াবেন কয়েক মিনিট, প্রশ্ন করবেন একটা বা দুটো: শরীর ভালো আছে তো? হাঁপানির কষ্ট কম আছে কিনা। বাবা 'হ্যাঁ' জবাব দেবেন।

বাবা দাঁত মাজতে মাজতে ঘটিভরা জল নিয়ে পায়খানার পথে বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরিৎ বেগে বিছানাটা দখল ক'রে নিতাম। সঙ্গে বোন মধু। দড়ি কাটবার সাহস নেই, অনেক লড়ে তার মরণ বন্ধন খুলতে হতো। বিছানার মধ্যে একটা তোষক, কয়েকখানা ধুতি, একটা পাঞ্জাবী, দুটো গামছা: এই থাকত বাবার নিজস্ব সম্পত্তি। বাকী সব আমাদের। আমরা যারা আছি তার ক্ষীণ পক্ষপুটে, সবার জন্য কিছু না কিছু সাজান রয়েছে বিছানার মধ্যে।

মা'র জন্য দুখানা শাড়ী, সাদা, একখানা লালপাড়ের অন্যটা কয়েরী। অনেকখানি লংক্লথ, সেমিজ, সায়া তৈরী ক'রে নেবার। আমার জন্য দু'তিনটে শার্ট, অন্য বিধবা কাকিমাদের জন্য থানের শাড়ী, রাঙ্গাঠাকুমার ছেলে চিনিকাকুর জন্য ধুতি ও শার্ট; কুন্টিপিসির জন্য ডুরে শাড়ী একটি।

এগুলো ছিল নিয়ম ক'রে বাধা। কোনও বছর তার ব্যতিক্রম হতে পারতো না। আমার জন্য শার্ট এক বছর দুটো, এক বছর তিনটে। মার জন্য কোন গ্রীষ্মের ছুটিতে দুখানার বেশী শাড়ী নয়। আরও দুখানা আসতো পূজার সময়। বছরে মার পাওনা ছিল চার খানা শাড়ী। আমার চার পাঁচটা শার্ট আর হাফ-প্যান্ট। মেয়েকে একটু বেশী নেক নজরে দেখতেন পিতৃদেব, তার ফ্রকের রং বাহার

ফ্যাসন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। পাঁচটার বেশীও ফ্রক কোনো কোনো বছর তার জন্য এসে যেত। কানুর জন্য দুজোড়া হাফ প্যাণ্ট, ফুল শার্ট।

কিন্তু বিছানার মধ্যে থাকতো আরও অমূল্য ভাণ্ডার। আমার জন্য বই—বিদেশী মহাপুরুষের ইংরেজী জীবনী, দেশী মহাপুরুষের বাংলায়; সারা বছরের জন্য রুল কাটা কাগজ দিস্তার পর দিস্তা; একগাদা ব্লটিং পেপার; দু ডজন পেনসিল, রবার, এক্সারসাইজ বুক। মধুর জন্য প্রথম পাঠের কয়েকখানা বই।

দুর্জয় সিংহের মাসিক বেতন ছিল ত্রিশ টাকা। তা থেকে কুড়ি টাকা পাঠিয়ে দিতেন আমাদের ভরণ পোষণের জন্যে। এত সব কেনার মতো অর্থ আসত কোথা থেকে?

এ প্রশ্ন সেই বাল্যকালে আমার মনে খোঁচা মারেনি। প্রাপ্ত ঐশ্বর্যে আমি সম্মোহিত, পুলকিত।

অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম অর্থ উপার্জন করতে কি অসম্ভব পরিশ্রম করতেন দুর্জয় সিংহ।

বাস করতেন গোপাল নাগ নামক জনৈক জমিদারের বাড়ী। তাঁর তিনটি ছেলে ও একটি মেয়েকে রোজ সন্ধ্যে বেলা পড়াতে হোত। শুতেন গোমাস্তাদের জন্য নির্দিষ্ট একটা স্যাঁতসেতে ঘরে কাঠের তক্তপোষে চাদর বিছিয়ে। খেতেন জমিদারের বাড়ীতে।

এ দৃশ্য আমি নিজে দেখতে পেয়েছিলাম ম্যাট্রিক পাশের পর কলকাতায় কলেজে পড়তে যাবার পথে খুলনায় বাবার সাথে চার দিন কাটাবার সময়। তাঁর জীবন-যাত্রার তুলনায় আমরা রাজার হালে গ্রামের বাড়ীতে বাস করতাম, বুঝতে পেরেছিলাম আমি।

হাঁপানির কষ্ট সারা বছর লেগেই থাকত, শীতের মাসগুলিতে আক্রমণ হোত জোরালো। সকাল বেলায় দুর্জয় সিংহ দু'মাইল হেঁটে এক বাড়ীতে গিয়ে ট্যুইশন করতেন। ফিরে এসে স্কুল। স্কুলের শেষে আর একটা ট্যুইশন স্কুল বাড়ীর কাছেই। সন্ধ্যায় নাগমশাই' এর পাঁচটি সন্তানকে পড়ান।

সারা সপ্তাহে একমাত্র রবিবার ছুটি।

এই ছুটির দিনে স্কুলের আপিসে আয় ব্যয়ের হিসেব লিখতেন দুর্জয় সিংহ। ইংরেজী ভাষার ওপর ভাল দখল ছিল, তাই হেড মিস্ট্রেস তাঁকে দিয়ে স্কুলের নানা সমস্যা নিয়ে অনেক আবেদন নিবেদন লিখিয়ে নিতেন জিলা শাসকের কাছে,

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাছে। ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্-এর রিপোর্টে যদি কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ থাকতো তার জবাবও। প্রতি রবিবারে এসব কাজ করে দেবার জন্য স্কুল থেকে বাড়তি পনের টাকা পেতেন আমার পিতা। টিউশনি থেকে আরও পনের। নিজের জন্য প্রতি মাসে দশ টাকার বেশী খরচ হতে দিতেন না।

হাঁপানি বাড়লে এক কবিরাজের থেকে কি একটা ওষুধ খেতেন। সারা বছর চ্যবনপ্রাশ খাবার মতো 'বিলাসিতা'র সংকুলান ছিল না তাঁর। উদ্বৃত্ত অর্থের প্রতিটি পয়সা যক্ষের মতো জমাতেন, জমিদার খাজাঞ্চী ছিল তাঁর ব্যাঙ্ক। এই জমানো টাকা থেকে প্রতি বছর উঁচু ক্লাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সব বই নতুন কেনা হোত আমার জন্য। বছরে তিনবার দেশের গ্রামে আসা হত, সব লালিত-পালিতদের জন্যে শাড়ি-কাপড়-জামা ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে। গ্রামের ছুটির দিনগুলিতে একটু খোলা হাতে খরচ করবার সঙ্গতিও সঙ্গে আনতেন।

বাবা বাড়ী আসার পরের দিনই বাজারে গিয়ে আমাদের বংশানুক্রমিক মুদি মনমোহন কাকার কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রেখে দিতেন। কত টাকা তা আমার জানবার সুযোগ হয়নি। প্রতিদিন বাজারে গিয়ে মনমোহন কাকার কাছ থেকে একটা করে টাকা নিতেন। তাতে বাজার হোত, অন্য সব খরচও। আমরা প্রায় রোজই টাটকা ইলিশ মাছের ঝোল খেতে পেতাম। সপ্তাহে একদিন মাংস রান্না হোত। গণেশপুরের বাজারে মাংসের দোকান ছিল না। তিন-চার বাড়ীর কর্তারা একত্র হ'য়ে কিনে নিতেন একটা পাঁঠা। পাঁঠা বলতে গ্রামের সবচেয়ে পাকা হাত জল্লাদ ছিলেন জ্যেঠামশাই বীরেন্দ্র সিংহ। আমাদের বাড়ীতে কালী পূজার মন্দিরের পিছনে বিরাট একটা কুল গাছের সঙ্গে পাঁঠাকে বেঁধে রাখা হোত। বীরেন্দ্র সিংহ ধুতিতে অর্ধেক দেহ আবৃত ক'রে তার আড়ালে তাঁর ভীষণ ধারালো বলির দা লুকিয়ে রেখে পাঁঠার কাছে এসে দাঁড়াতেন। পাঁঠাটাকে ঘাসপাতা দেওয়া হোত খেতে। কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত ভীত দৃষ্টি এদিক ওদিক নিক্ষেপ ক'রে সে যখন লোভনীয় খাদ্যে মুখ রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তখন পিছন থেকে বীরেন্দ্র সিংহ তাঁর সেই বিরাট দায়ের অব্যর্থ আঘাতে বেচারার শিরটাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতেন। কিছুক্ষণ ছটফট ক'রে নিস্প্রাণ হ'য়ে যেত। তখন সেই দেহকে দড়ি বেধে ঝোলানো হোত গাছের ডালে। চামড়া কেটে ছিড়ে ফেলার কাজে আমরাও হাত লাগাতাম। তারপর মাংস কাটা হোত টুকরো টুকরো করে, ভাগ হোত খদ্দেরদের মধ্যে।

শেখর বিহারী এসে চামড়টা নিয়ে যেত। আমাদের অংশ থেকে ভাগ পেতেন জ্যেঠামশাই বীরেন্দ্র সিংহ।

বাবা বাড়ী এলে আমরা মাঝে মাঝে রসগোল্লা, লেডীকেনী, অমৃত্তি, ক্ষীর এসব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অকল্পনীয় আহার বিলাসের সুযোগ পেতাম।

আরও ঘটনা ঘটত।

কয়লা বোঝাই নৌকা এসে ভিড়ত গণেশপুরের বাজারের সামনে। নদীতীরে। দেখতে পেতাম বস্তার পর বস্তা কয়লা এসে জমা হচ্ছে মার রান্নাঘরের একপাশে। আমার হাতে মুটে এক বস্তা কয়লা রেখে একটা ক'রে বাঁশের টুকরো দিয়ে যেত। দশ বস্তা অর্থাৎ দশমণ কয়লা কেনা হোত প্রতি বছর গ্রীষ্মে।

রজনীকান্তের আমলে 'দক্ষিণের ঘরে' তিনটি প্রকাণ্ড পোড়ো মাটির মাইট (অর্থাৎ জালা) ছিল। তার অন্তত একটা ভরে যেত নতুন কেনা চালে।

আমাদের সব লেপ তোষক মশারীতেই মার হাতে বহু তালি লাগান থাকতো। যেগুলো একেবারে অব্যবহার্য হ'য়ে গেছে বাবা কারিগর ডেকে সেগুলি পুরোনো তুলোর সঙ্গে নতুন তুলো মিশিয়ে নতুন লেপ তোষক তৈরী করিয়ে নিতেন।

গ্রামের অন্য বাড়ীগুলি থেকে বাবার সমবয়সী ও গুরুজনেরা আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। তাঁদের জন্যে তামাক সেজে জলন্ত কয়লা সংযোগ করে কল্কি বসিয়ে হুকো নিয়ে যেতে হোত আমাকে। বাবার অনুপস্থিতিতে এঁরা কদাপি আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করতো না। মা'র কোনো বন্ধু বা সখী ছিল না গ্রামের মহিলাদের মধ্যে। তাঁকে কোনোদিন পাড়াবেড়াতে দেখিনি। প্রতিবেশিনীরাও কদাচ আমাদের বাড়ীতে আসতেন। মার অভ্যাস ও অভিরুচি ছিল, অবসর সময়ে বই পড়া। বই-এর যোগানদার ছিলাম আমি। অবশ্যি আমাদের বাল্যকালে গ্রামের গিন্নীরা বিনা নিমন্ত্রণে খুব কদাচিৎ অন্য বাড়ীতে শ্রেফ গল্প করতে যেতেন। ব্যতিক্রম ছিল তরুণীদের বেলা। বান্ধবীরা অহরহ এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে বেড়াত। তবু কখনও সখনও গৃহিনীগণ যে বান্ধবীদের সঙ্গে মিলিত হতেন না তা নয়। এই সীমিত প্রথার ব্যতিক্রম ছিলেন আমার মা।

তাঁর মধ্যে যে একটি কোমল কবিমন, অনুভূতিশীল কল্পনাপ্রবণ সৃষ্টিশীল লেখকমন উপবাসী, উপেক্ষিত, অনাদৃত থেকে থেকে শুকিয়ে আসছিল, গ্রাম ছেড়ে আমি কলকাতা যাওয়ার আগেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। স্বামীর কাছ থেকে তাঁর কোমল কল্পনাপ্রবণ মন সম্মান, স্বীকৃতি বা উৎসাহ পায় নি। আমার বাল্যকালে

আমরা দুজন বসে বসে এক এক কর্মহীন অলস বিকেলে মাতাপুত্রের সংযুক্ত কল্পনার নৌকোয় চড়ে বেড়াতাম। আমাদের সঙ্গী হোত আকাশ ছোঁয়া বাঁশগাছ। আকাশে উড়ন্ত চিলপাখি, আরও অনেক উচ্চে, দৃষ্টির বাইরে, অসংখ্য নক্ষত্র। আমি অতি সরল ভাষায় কবিতা লিখে মাকে পড়ে শোনাতাম। মা শুনে শুনে যে সব ঝংকৃত শব্দের ছন্দিত লাইন তৈরী করত তা শুনে আমার বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা থাকতো না। আমি বলতাম, মা, তুমি এত সুন্দর কবিতা মুখে মুখে তৈরী করতে পারো। তুমি কবিতা লেখ না কেন?

মা চুপ ক'রে যেতেন। বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস নেমে আসত। দক্ষিণের জানলা দিয়ে হঠাৎ একপলক হালকা হাওয়া ছুটে এসে দীর্ঘশ্বাসটুকুকে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যেত।

আমার স্কুলের মধ্য জীবনে একবার মা'র বড়ভাই বড়মামার বিবাহ উপলক্ষ্যে আমাদের কলকাতা যেতে হয়েছিল। শৈলেশ সেনগুপ্ত, আচার্য প্রফুল্ল রায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন বিজ্ঞান কলেজে, কেমিষ্ট্রিতে এম-এস-সি পাশ করে তাঁর সঙ্গে গবেষণা করতেন। খাদি ছাড়া পড়তেন না কিছু। বাল্যকালে পিতৃহীন দুই ভাই দু'বোন পিসির বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলেন—ছোটমামা সুবোধ জন্মাবার আগেই আমার মাতামহের মৃত্যু হয়েছিল। বড়মামা পরিণত বয়সে বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও ধর্মে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিলেন। কদাচ তিনি ধর্মপ্রচার করতেন না। ধর্ম, ঈশ্বর বৈষ্ণববাদ সবটুকুই ছিল তাঁর আত্মজ অভিজ্ঞান। আমি অনেক পরে বৈষ্ণব ধর্মের শীর্ষ স্থানীয় লোকেদের কাছে শুনেছিলাম আমার বড়মামার জ্ঞান-অভিজ্ঞান উপলব্ধিকে তাঁরা যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখতেন।

সেই বাল্যকালের কলকাতার কোনো ছাপ পড়ে নি আমার মানসে। শুধু মনে আছে মা কর্পোরেশনের শিক্ষিকা হবার জন্য ট্রেনিং নেবার অনুমতি চেয়েছিল বাবার কাছে। তাঁর দুই পিসতুতো বোন কর্পোরেশনের স্কুলে পড়াতেন। তাঁদের সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষা মা'র চেয়ে বেশী ছিল না। তাঁরাই মাকে বলেছিল ট্রেনিং-এর সুযোগ পাওয়া খুব কঠিন হবে না।

বাবা একবাক্যে মা'র আবেদন নামঞ্জুর ক'রে দিয়েছিলেন।

তার প্রধান কারণ ছিল বাবা কোনোদিনও চাননি তার পরিবার গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতাবাসী হোক। সস্তায় খুলনায় বা কলকাতায় তিনি বসত-জমি কিনতে পারতেন। কেনেননি শুধু একটাই কারণ: কর্মজীবনের শেষে অবসর নিয়ে গণেশপুরে নিজের বাড়ীতে বাস করার দৃঢ় সংকল্প।

পিতা রজনীকান্তের শ্মশানে তৈরী হবে তাঁর নিজের শ্মশান। বাবার এটা ছিল সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা।

ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতাগণ অবশ্য সে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা, সুদৃঢ় সংকল্পকে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে দিয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে। গণেশপুর পূর্ব পাকিস্থান হয়ে গেল—আর স্বপ্নের জন্মভূমি, আপন ঘর, হ'য়ে গেল বিদেশ। তারপর ১৯৪৮ সালে খুলনাও চলে গেল পূর্ব পাকিস্তানে।

আমার বাবা দুর্জয় সিংহ হয়ে গেলেন একান্ত পরাজিত একেবারে ভেঙে পড়া অকাল-বৃদ্ধ উদ্বাস্তু।

যে রাজনীতি ভারতবর্ষকে ১৯৪৮ সালে দু'টুকরো ক'রে স্বাধীন করলো তার একটা ছোট, কিন্তু আমার কাছে ঐতিহাসিক, নাটক ঘটে গেল গণেশপুরে।

॥ তিন ॥

এ নাটকের সূচক অনন্তদা। অনন্ত ঘটক। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে বঙ্গে ও পরে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জাগরণের সূচনা। অধীনতার বন্ধন ও শৃঙ্খল ছেড়ে স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা প্রকৃতির সবচেয়ে মুখর ঐশ্বর্য। গাছ বলো, লতা বলো, পোকা মাকড় বলো, পশুপাখি জীবজন্তু সবাই চায় বাড়তে, উঠতে, বিকশিত হতে, প্রসারিত হতে। চায় নদী, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত।

মানুষই একমাত্র জীব যার মস্তিষ্ক ও মন চিন্তা ভাবনা করতে পারে, উদ্ভাবন, আবিষ্কার, অভিযান, বিজয়, বিস্তার তাই মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। গত দুই-তিন'শ বছর এই মানুষ প্রভাবিত বিজয় বিস্তার ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর বেগ পেয়ে এসেছে: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে এ গতি হয়ে উঠেছে দুর্বার, একে বাগে রাখার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মানুষ এখন চাঁদ জয় করেছে। আরও বহু উঁচুতে গ্রহে পৌঁছবার তোড়জোড় করছে, টেষ্ট টিউবে শিশুর জন্ম হচ্ছে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এত বিশাল বিচিত্র পৃথিবীটাকে একটা গ্রামে পরিণত করতে চলেছে, যাকে আমরা বলছি গ্লোবাল ভিলেজ। মনে পড়ছে ১৯৮১ সালে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমি আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তে বার্কলে শহরে বিখ্যাত লস এনজেলেস বিশ্ব বিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী তাদের দৈনিক পত্রিকার জন্য আমার সাক্ষাৎকার ছেপেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম জীবনের পনের বছর কেটেছে আমার একটি 'গণ্ডগ্রামে' যা তখন বাংলাদেশের অন্তর্গত। আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য সার্থকতার কাহিনী, দুনিয়ার দু'চারটে সমস্যা সম্বন্ধে আমার মতামত জানবার জন্যেই মেয়েটি ইন্টারভিউ চেয়েছিল। কিন্তু বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল গণেশপুরে আমার বাল্যকাহিনী শুনে। পরের দিন বার্কলের দৈনিক পত্রিকায় ছবিসহ আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল, শিরোনাম ছিল "গ্লোবাল ভিলেজার টেলস হিজ স্টোরী।"

আমি যখন গণেশপুর হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন গ্লোব বা পৃথিবী সম্বন্ধে আমার ধারণা অতি সামান্য। আমরা অবশ্যি ভূগোল পড়তাম, কিন্তু মাষ্টারমশাই আমাদের পৃথিবী সচেতন করতে পারতেন না। আমরা ইতিহাস পড়তাম, তাতে

ইংরেজ সম্রাট ও সাম্রাজ্যের বিস্তর প্রশস্তি থাকতো। আমরা জানতে পারতাম ইংরেজ প্রভুত্ব আমাদের সভ্য করেছে, সুখে রেখেছে, শান্তি ও স্বস্তি দিয়েছে।

রজনীকান্ত যে বছর মারা যান সেই ১৯২৮ সালে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের থিতিয়ে পড়া সংগ্রামকে একটা প্রাণ সঞ্চারী ইন্‌জেকশন দিয়ে বসল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা রহস্যময় "রীতি"। একাধিকবার যখন ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রাম শিথিল হয়ে এসেছে, তখন ইংরেজ সরকার অবজ্ঞার সঙ্গে এমন একটা কিছু ক'রে বসেছে যার ফলে সে সংগ্রাম আরও প্রাণবন্ত হ'তে পেরেছে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিচারটা সম্ভবত ভুল। ভারতের সংগ্রাম শিথিল হবার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ সরকার চেষ্টা করেছে তার সাম্রাজ্যকে দীর্ঘজীবী করতে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী ভবিষ্যতে কখনও স্বায়ত্বশাসন অধিকার পাবে এই ভরসাকেও কিছুটা সজীব করে।

১৯২৮ সালে ইংরেজ সরকার নিযুক্ত করেছিল সাইমন কমিশন। তার দায়িত্ব ছিল ভারতবাসীকে কতটা সময়-সীমার মধ্যে কতটুকু স্বরাজ দেওয়া যেতে পারে তা নির্ধারণ করা।

ভাইসরয় ছিলেন লর্ড আরউইন।

সাইমন কমিশনের সদস্যরা সবাই বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য। সভাপতি স্যার জন সাইমন। সভ্যদের মধ্যে একজনও ভারতবাসী নন।

সাইমন কমিশনের নিয়োগ স্বাধীনতা সংগ্রামকে আবার চাঙ্গা করে দিল। কমিশনকে বয়কটের আহ্বান দিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। কংগ্রেসের মধ্যে তখন গান্ধী-মতিলাল নেহেরুর 'ধীরে চলো' ও জহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের 'আগে বাঢ়ো' এই দুই দ্বন্দ্বমূলক লাইনের লড়াই চালাচ্ছিলেন। 'আগে বাঢ়ো'-দের ডাকে সাধারণ মানুষের প্রচণ্ড সাড়া গান্ধীজীকে বিচলিত ক'রে দিয়েছিল। ১৯৩০ সালে তিনি তাঁর দ্বিতীয় অসহযোগ সংগ্রামের আহ্বান দিলেন। এই সংগ্রামে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। ১৯৩১ সালে স্বাক্ষরিত হল 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি', তাতে 'ধীরে চলো' নীতির বিজয় হল।

গণেশপুরের এসব ঘটনার খুব সামান্যই আভাস পাওয়া যেত। সারা গ্রামে আসত মাত্র একখানা আনন্দবাজার পত্রিকা, ডাকে, কলকাতায় প্রকাশিত হবার এক সপ্তাহ পরে। আসত পাব্লিক লাইব্রেরীতে, কাড়াকাড়ি পরে যেত পত্রিকা পাঠের জন্য।

শেষ পর্যন্ত উৎসাহী প্রধান বৃদ্ধরাই ঠিক করলেন পত্রিকা এসে পৌঁছাবার পর দিন সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি তা সশব্দে পাঠ করবেন যাতে সবাই শুনতে পায়।

অবশ্যই আমাদের মতো ক্ষুদে বালকদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

পূজার সময় যখন গ্রামের ভদ্র ব্যক্তিরা 'দেশে' ফিরতেন তখন 'নাটক' যেমন জমতো, তেমনি গ্রাম মুখর হোত রাজনৈতিক গল্প শুনতে। গ্রামের দুজন খাদি পরা পুরুষ কলকাতার উকিল ও কংগ্রেসের সভ্য। দাস বাড়ীর অতুল কাকা, সেন বাড়ীর নির্মল কাকা। অতুল কাকার বয়স হবে পঁয়ত্রিশ, তিনি গান্ধীপন্থী, নির্মল কাকা তাঁর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট, তিনি 'জওহর-সুভাষ' পন্থী। আমি নাটকের রিহার্সাল দেখতে প্রায়ই হাজির হতাম। এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনা আমাকে আকর্ষণ করত, যদিও আমি বুঝতাম খুবই কম। যা বুঝতাম না তা নিয়ে প্রশ্ন করার মতো গ্রামে একজনও ছিলেন না।

১৯২৮ সাল থেকে বিপ্লবী সংগ্রামের শুরু ভারতবর্ষে। লালা লাজপত রায়ের পুলিশের হাতে জখম ও পরে মৃত্যু ইংরেজ পুলিস সুপার সনডার্সের হত্যা ঘটাল ১৯২৮ সালে। দিল্লীর লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্ব্লিতে বোমা নিক্ষেপ হল পরের বছর। যতীন দাস ১৯২৭ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন ব্রত ৬৪ দিন পালন ক'রে ম'রে গেলেন ১৯২৯ সালে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হবার পরের বছর, খণ্ডযুদ্ধ হলো জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজ ও ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে। ভগৎ সিং ও তাঁর সহচরদের ফাঁসি দেওয়া হল ১৯৩১ সালে। ইংরাজ ও উঁচু পদের অত্যাচারী ভারতীয় লোকদের হত্যার ঘটনা বাড়তে লাগলো। ১৯২৯ সালে দক্ষিণ ভারত থেকে দিল্লী ফেরার সময় নিউ দিল্লীর সন্নিকটে বোমা ফাটল। লর্ড আরউইনের আয়ু ছিল, তাই বেঁচে গেলেন। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোরে ঝিলম নদীর তীরে বাৎসরিক অধিবেশনে কংগ্রেস সর্বপ্রথম 'পূর্ণ স্বরাজ' দাবী জানিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও অনেকখানি এগিয়ে দিল। 'পূর্ণ স্বরাজের' দাবীতে মিলিত হল নেহেরু-সুভাষের দল, একসঙ্গে তাঁরা কংগ্রেসের তিনরঙ পতাকা উড়িয়ে দিলেন ঝিলম নদীর তীরে। ন'বছর পর নেহেরু-গান্ধী-সুভাষের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সময় জওহরলাল পুরোপুরি গান্ধীর সঙ্গে যোগ দিলেন। সুভাষ বসুর বিপ্লবী পথ তাঁকে দ্রুত জনপ্রিয়তম নেতা ক'রে তুলছিল। এটা সহ্য হল না গান্ধীর বরপুত্র জওহরলালের। অবশ্য ভারতবর্ষের মার্কামারা বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ ও সি-পি-আই, দুই দলই সুভাষচন্দ্রকে পরিত্যাগ অথবা মাঝপথে অবস্থান করে প্রকৃত সংগ্রামের ঐতিহাসিক সুযোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করলেন।

সেই পুরো ত্রিশ দশকে গণেশপুর অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে থাকার সুযোগ পেল না।

১৯৩৪ সালে, আমার যখন তের বছর বয়স ও আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, নির্মল-কাকা সহসা শীতের মাসে গণেশপুর চলে এলেন। সঙ্গে তাঁর বাইশ বছরের একটি যুবক।

আমাদের অনন্তদা।

তাঁর চেহারা এখনও মনে রয়েছে।

বেঁটে মানুষ, পাঁচ ফুটের বেশী নয়, সবল মাংসপেশী, সবচেয়ে প্রথম লক্ষণীয় কপালে একটা বড় দাগ, কোনোও গভীর আঘাতের অবিনশ্বর হস্তাক্ষর। বড় বড় চোখ দুটো বেড়ালের মতো কটা, রাত্রে বেড়াল-চোখের মত সর্বদা জ্বলন্ত ও সতর্ক। দাড়ি-গোঁফ কামানো, একটা দাঁত নেই, মুখ খুললেই তার শূন্যস্থান চোখে পড়ে। যেন সবাইকে ভৎসনা করে যাদের সব দাঁত অটুট। ভীষণ ক্ষিপ্রগতি অনন্তদা। চলেন না তো ছোটেন, চোখের পলকে পথের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সরে যেতে পারেন। কটা চোখের উপর ভারী একজোড়া ভ্রু, যেন দুটো শিশু কাক পাখা ছড়িয়েছে আকাশে উড়বে বলে। মাথার চুল কদমছাঁট, ঘাড় প্রায় নেই বললেই হয়। কাঁধের উপরেই বেশ বড় একটা মাথা। লম্বায় অতটুকু শরীরের ওপর যেন প্রচণ্ড একটা ধমক। অনন্তদা এমনিতে হাসি-খুশি, গলার স্বর নরম। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে বজ্রকণ্ঠের অধিকার পান তিনি প্রয়োজনের সময়! তখন তাঁর কটা চোখ রাগে লাল, তখন তিনি ভয়ের কারণ, তিনি 'ভালো মানুষ' নন।

দাস বাড়ীর কাছে মোড় খেয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে খাল পর্যন্ত। এটা পেরিয়ে আমাদের স্কুলে যেতে হোত। সেই রাস্তা থেকে বেরিয়েছে চলতি সাপের মতো আঁকাবাঁকা আর একটা পথ, একেবারে গণেশপুরের শেষ দক্ষিণ সীমানায় অনেক পুরানো কাঠের পুল পর্যন্ত, যাকে ভয়ে ভয়ে পেরিয়ে আমাদের পৌছতে হতো ডিঙ্গামানিক গ্রামে, যে গ্রাম রামঠাকুরের জন্মস্থান হিসাবে বিখ্যাত। পুল পেরোলেই ছিল আর একটা বর্ধিষ্ণু বাড়ী। বাড়ীর সব গৃহ ইঁট-সুরকির দালান। দুর্গামণ্ডপ প্রকাণ্ড, তার সঙ্গে পাকা চিরস্থায়ী নাট্যশালা, যেখানে পূজার সময় নাটক হোত রোজ রাত্রে। দেওয়া হোত মোষ বলি অষ্টমী পূজার দিন। এ বাড়ীর প্রধান মালিক ডাঃ রাধাকান্ত সেন মালয়ে সিভিল সার্জন, কলোনীয়াল মেডিকেল সার্ভিসের লোক। তিনি কদাচ কখনও গ্রামে আসতেন। নির্মলকাকা এ বাড়ীর মানুষ। থাকতেন

সবচেয়ে ছোট দালানঘরে, তাঁর বাবা কলকাতার উকিল, তিনিও ওকালতি করেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশী করেন স্বদেশী। সুভাষ বসু তাঁর নেতা। নাটকে বিশেষ উৎসাহ ছিল নির্মলকাকার। স্ত্রী লোকের ভূমিকায়, বিশেষ ক'রে তেজী বিদ্রোহী ঝাঁসীর রানী, জাহানারা বেগম এসব ভূমিকায়, তাঁর নাটক প্রতিভা সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেত।

সেন বাড়ীর সংলগ্ন একটি প্রকাণ্ড আম বাগান। জনবিরল ছায়াপথ, জনপথ থেকে দূরে। এই নিরালা আম বাগানে গ্রামের ছেলেদের নিয়ে সভা করলেন নির্মল কাকা। দশ বারোটি যুবক সে সভাতে হাজির ছিল। আমরা তখনও বয়সের অপরাধে সভাতে আহুত হবার যোগ্য নই।

যুবকদের বেশীরভাগই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। দু'তিন জন স্কুলের পড়া শেষ ক'রে—পাশ অথবা না-পাশ—কোনোও কিছু কাজ করছে। যেমন, হেরম্ব শীল ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়েই তার বাবা গ্রামের ডাক্তার মহেন্দ্র শীলের সহযোগী হ'য়ে ডাক্তারী শিখছে, এক-আধটু ডাক্তারী করছেও। যেমন, অতুল ঘোষ ক্লাস নাইন থেকে স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক কেটে কিছুই না করতে পেরে ঘরে বসে আছে, বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছে আছে একটা দোকান খুলবার।

নির্মলকাকা যুবকদের সঙ্গে অনন্তদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যা বললেন তার মর্মকথা হলো : সারা দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে তৈরী হচ্ছে। শাসক ইংরেজ হয়ে উঠেছে হিংস্র, বেপরোয়া। গ্রামে গ্রামে এবার তারা আক্রমণ করবে। নারীদের ইজ্জৎ থাকবে না। জোয়ান যুবকদের ধরে নিয়ে যাবে, বিনা বিচারে হবে বছরের পর বছর সশ্রম কারাবাস। অতএব গ্রামের যুবকদের আত্মরক্ষার জন্যে তৈরী হতে হবে। অনন্তদা এসেছেন কলকাতা থেকে গ্রামের যুবকদের নিয়ে আত্মরক্ষা, সমাজরক্ষা বাহিনী তৈরী করতে।

লাইব্রেরীর সংলগ্ন ব্যায়াম ক্ষেত্রে প্রতিদিন তিনি গ্রামের ছেলেদের ব্যায়াম শেখাবেন। দেহ শক্ত না হলে মন শক্ত হয় না। সপ্তাহে তিন দিন এই আমবাগানে তিনি শেখাবেন লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, যুযুৎসু। স্বেচ্ছায় যারা শিখতে আসবে তাদেরই শেখানো হবে। এ সব বিভায় যারা পারদর্শী হবে তাদের শেখানো হবে পিস্তল চালানো। অনন্তদার কাছে এখন পিস্তল নেই। দরকার হলে উপযুক্ত সময়ে পিস্তল আসবে।

নির্মলকাকা জানতে চাইলেন, ক'জন ব্যায়াম ও লাঠি-ছোরা খেলা শেখার জন্য

তৈরী। হাত তুলতে বললে, সবাই হাত তুলল। যদিও নির্মলকাকা বিলক্ষণ জানতেন, এদের অর্ধেকও শেষ পর্যন্ত আসবে না শিখতে।

অবশেষে নির্মলকাকা বললেন, গণেশপুরে পুলিশ থানা নেই। সবচেয়ে নিকটের পুলিশ থানা দশ বারো মাইল দূর। পাঁচ-ছ মাইল দূরে ভোজেশ্বরে নতুন থানা খোলবার প্রস্তাব রয়েছে। অর্থাৎ ইংরেজ সরকার থানার সংখ্যা বাড়িয়ে গ্রামগুলিকে শায়েস্তা রাখার জন্ত তৈরী হচ্ছে। তবু আমরা থানা থেকে এখনও দূরে। এটা আমাদের মস্ত সুবিধে। কিন্তু এই গণেশপুরেই পুলিশের গোয়েন্দা রয়েছে। সরকারী চৌকিদারকে বলা হয়েছে বাড়ী-বাড়ীর উপর নজর রাখতে, সপ্তাহে তিন দিন পালং থানায় গিয়ে রিপোর্ট করতে। সম্ভবত চৌকিদারের সংখ্যা বাড়িয়ে এক থেকে তিন করা হবে। বাজারে দোকানদারের মধ্যে, জেলে পাড়ায়, মুচি পাড়ায়, গোয়েন্দাগিরির জন্ত লোক খোঁজা হচ্ছে। দু' একজন ভদ্রলোকও এ ধরনের কাজে লিপ্ত হতে পারেন। গণেশপুরের সুনাম বা দুর্নাম আছে দেশপ্রেমের। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় গণেশপুর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। রজনীকান্তকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কিছুদিন বিনা বিচারে তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছিল।

নির্মলকাকা সবাইকে সাবধান ক'রে দিলেন: তোমরা গোয়েন্দাদের বিষয়ে সতর্ক থাকবে। রাস্তায়, বাজারে একত্র হ'য়ে রাজনীতি বা আমাদের আত্মরক্ষী বাহিনী নিয়ে কোনো আলোচনা করবে না। চৌকিদার বা অন্ত কারুর এই সব প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করবে। তোমাদের মধ্যে একজনও আজকের ও ভবিষ্যতের আমাদের কাজকর্মের কথা কাউকে বলবে না। বিশ্বাসঘাতকদের গুরুতর শাস্তি দেওয়া হবে। মনে রেখো, আমাদের নিয়ম নিজেদের উপরও নজর রাখা।

আমি এই মিটিং-এর বৃত্তান্ত জেনেছিলাম বছর খানেক পরে।

কিন্তু এই মিটিংয়ের তিন চার মাসের মধ্যেই ব্যায়াম, লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা গণেশপুরের যুবক ও কিশোরীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। আমার শারীরিক ব্যায়ামে ও খেলাধুলার বিশেষ উৎসাহ ছিল না! কপাটি ছাড়া অন্ত কোনো খেলাতে আমি তেমন যোগ দিতাম না। দু' দশবার ফুটবল খেলতে গিয়ে সারা মাঠ দৌড়ে একবারও বল শট্ করতে না পেরে এবং গোলকিপার হ'য়ে বার বার গোল খেয়ে, খেলার উৎসাহ আমার আরও নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল।

আমিও লাঠি ছোরা খেলার দলে সামিল হ'য়ে গেলাম।

লাঠি তৈরী ক'রে নেওয়া সহজ ছিল। গ্রামে বাঁশঝাড়ের অন্ত ছিল না।

আমাদেরই বাগানে পাঁচটা বাঁশঝাড় ছিল, তার ছুটোর মালিকানা আমাদের। পূর্ববঙ্গে বরা-বাঁশ লোহার মতো শক্ত, উই কাটতে পারতো না সহজে। সাধারণ মানুষদের ঘর বাড়ীর থাম হিসাবে ব্যবহৃত হত বরা-বাঁশ। যখন আমাদের মাসিক কুড়ি টাকার বাজেটে কড়া টান পড়ত, আমরা দু'একটা বাঁশ বেচে দিতাম প্রজাদের কাছে। এক একটা বাঁশ সেকালেও আট আনা থেকে বারো আনায় বিক্রী হোত।

বাঁশের ডাল কেটে তৈরী হ'য়ে গেল লাঠি। প্রত্যেক ছাত্র নিজের লাঠি তৈরী ক'রে নিল।

ছোরা খেলার জন্য ছোট ছোট কাঠের 'ছোরা' তৈরী করা হল। যুযুৎসু খেলাও শুরু হ'য়ে গেল।

অনন্তদা প্রতিদিন প্রশিক্ষার ভার নিতেন। শিক্ষা শুরু হবার আগে দেশপ্রেমের গান হোত সবার সমবেত কণ্ঠে। 'বন্দে মাতরম্' ছিল প্রধান সঙ্গীত। কখনও কখনও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্তে পুষ্পে ভরা'।

যখনকার কথা লিখছি সেটা ১৯৩৪-৩৫। ১৯৩১ সালের 'রাউণ্ড টেবল' ঘটে গেছে লণ্ডনে—গান্ধী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের। ইংল্যাণ্ড তখন রাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের নেতৃত্বে লেবার-লিবারেশন কোয়ালিয়েশন সরকার দ্বারা শাসিত। সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া ছিলেন লর্ড ওয়েজউড্ বেন, লেবার পার্টির মন্ত্রী। তাঁর পুত্র টনি বেন উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত লর্ড উপাধি পরিত্যাগ ক'রে লেবার পার্টির কার্য-শালায় বহুদিন ধরে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। টনি বেন-কে আমি বন্ধুর পর্যায়ে রাখতে পারি। ১৯৯২ সালের জুন মাসে লণ্ডনে তাঁর বাড়ীতে এক প্রাতে সাক্ষাৎকারের সময় টনি বেন আমাকে দেখালেন তাঁর পিতা ভাইসরয় আরউইনকে যে সব 'চিঠি' লিখে-ছিলেন তাদের সংগ্রহ—পুরো পাঁচ ভলিউম, এখনও অমুদ্রিত। লর্ড ওয়েজউড বেন ভাইসরয়কে মৃদু চাপ দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন ত্বরান্বিত করতে। প্রণয়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৯৩৫ সালের ভারত প্রশাসন আইনের—যা পরে বৃটিশ পার্লামেণ্ট গভর্ণমেণ্ট অভ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট নাম দিয়ে অনুমোদন করে। এই আইনের পরিসীমার মধ্যে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ৭টি প্রদেশে গঠন করে সরকার। এই যে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সন্দেহজনক দ্বারায় অনেকটাই ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন কংগ্রেসী নেতারা।

ভারতের স্বাধীনতা ছিল না ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বৈপ্লবিক বিচ্ছিন্নতা। প্রাদেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রায় পুরোপুরি কলোনিয়াল থেকে গিয়েছিল। আছে

এখনও। স্বাধীন হবার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও, ইংরেজ আমলের বহু আইন প্রশাসনের চাকাকে দৃঢ় ও তেজী রেখেছে। স্বাধীন ভারতের সঙ্গে নাট্যমঞ্চ থেকে প্রস্থানকৃত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মর্মের ও দিলের মিল বজায় রাখছে।

এসব প্রসঙ্গে আমি বিস্তারিত ভাবে ফিরে আসব এই পিতৃ-কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ডে। এখানে, পুত্র, তোমাকে বলে রাখছি, আমাদের প্রজন্মের সঙ্গে পরাধীন ও স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ। আমাদের প্রজন্মেই স্বাধীন ভারতবর্ষ তৈরী করা হয়েছে আমাদের পূর্বসূরী প্রজন্মের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। কি ধরণের ভারতবর্ষ আমরা তৈরী করেছি তার বিবরণ আমাদের জীবন ও অভিজ্ঞান কাহিনীর একটা বিরাট অংশ। আমাদের প্রজন্মের যারা কিছু সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, উচ্চতা অর্জন করতে পেরেছে, তাদের জীবনের সঙ্গে স্বাধীন ভারতবর্ষের ধারাবাহিক যোগাযোগ।

আমরা সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন হয়েছি। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব ও রীতিনীতি থেকে মুক্ত হতে পারিনি।

ত্রিশ দশকে সারা ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি দ্রুত বেড়ে উঠেছিল।

॥ চার ॥

পাল্টা শক্তি তৈরীতে লেগে গিয়েছিল ইংরেজ সরকার।

গণেশপুর গ্রামেও আমরা এই পাল্টা শক্তির প্রভাব দেখতে পেলাম। অনন্তদার শক্তির পাল্টা শক্তি।

স্কুলের উঁচু শ্রেণী থেকে কলেজ পর্যন্ত যুবকদের মন অন্তদিকে চালিত করা, পাল্টা শক্তি তৈরী করার প্রধান লক্ষ্য।

একদিন স্কুলে ঘোষিত হল মাদারীপুর মহকুমার আধখানা জুড়ে ২০টি উচ্চ বিদ্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হবে। যে প্রথম হবে তাকে দেওয়া হবে স্বর্ণপদক।

বিতর্কের বিষয়: ইংরেজ শাসন কি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ হয়নি?

আমাদের গণেশপুর হাইস্কুলে মাসে একবার বিতর্ক সভা হোত। তার চালক ছিলেন বৈষ্ণব শাস্ত্রে পণ্ডিত শিক্ষক উমেশচন্দ্র সরকার। ইনি আমাকে নির্বাচন করলেন গণেশপুর হাইস্কুলের প্রতিনিধি। জোর তালিম দিলেন কি বলতে হবে তা নিয়ে। ইংরেজ শাসন যে ভারতবর্ষের এত মঙ্গল-কল্যাণ-শ্রী-সুখ-শান্তি ঘটছে আমার জানা ছিল না।

আমাদের অঞ্চলে পালং সবচেয়ে বড় গ্রাম। পালং হাইস্কুলে বিতর্কের স্থান, দিন, ক্ষণ ধার্য হয়েছে।

বিতর্কে সভাপতিত্ব করতে কলকাতা থেকে এক অধ্যাপক এসেছেন। তাঁর নাম কে. ডি. দাস। তিনি কলকাতার সরকারী ডেভিড হেয়ার টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল।

আমারই মতো আরো উনিশটি ছেলে অনেক উপদেশ ও দীর্ঘ তালিম নিয়ে এসেছিল পালং হাইস্কুলের বিতর্কসভায়।

সামিয়ানা খাটিয়ে চেয়ার আর টুল পেতে তৈরী হয়েছে সভার আসর। উঁচু তক্তপোষকে রঙিন কাপড়ে মুড়ে তৈরী হয়েছে সভাপতির আসন। একখানা বড় টেবিল, লাল শালুর কাপড়ে ঢাকা, তাতে মাটির ফুলদানিতে গাঁদা-পদ্ম-জবা-মালতী নানারকম গ্রাম্য ফুলের অমিল স্তবক। টেবিলের পর তিনটে চেয়ার। একখানা গদি বসানো। দেখলেই বোঝা যায় সভাপতির আসন।

আসর ভরে গেছে ছাত্র ও তাদের পুরুষ অভিভাবকদের উপস্থিতিতে। আসরে প্রথম আমরা ২০জন বিতর্ক-যুদ্ধের যোদ্ধা। বাকী উনিশ জনের চেহারাগুলো চেয়ে দেখতে গিয়ে বুক আমার এমন কাঁপতে লাগল যে চোখ কিছুই দেখতে পেল না।

নির্দিষ্ট সময় কিছুটা পেরিয়ে সভাপতির সমাগমন হল। আমাদের সভ্যতার এই প্রাচীন অভ্যেস মোটামুটি আজও অটুট। শ্রোতাদের, প্রার্থীদের, অনুগতদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হন।

কে. ডি দাসকে নিয়ে সভায় ঢুকলেন পালং হাইস্কুলের হেডমাষ্টার ও আমাদের এলাকার ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্। এঁদের নাম মনে নেই আমার।

পেছনে তাকিয়ে দেখলাম উমেশবাবু উপবিষ্ট। তাঁর দীর্ঘ শরীর, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি এবং মাংসল চওড়া মুখে চরম প্রশান্তি, গভীর ঔদাসীন্য। মনে হল না, তিনি আমার বক্তৃতা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা ভাবিত। তাঁর সারিতে অন্যান্য শিক্ষকরা যারা বসে আছেন তাঁদের চেহারা যতই ভিন্ন ভিন্ন হোক না, আমার মনে হল তাঁরা সবাই উমেশবাবু।

সভার অধিপতি কে. ডি. দাস আমাদের ভাল ছাত্র হতে উপদেশ দিলেন। ভাল ছাত্র হতে গেলে শুধু পড়াশুনা নয়, চরিত্র গঠনও বিশেষ প্রয়োজন। চরিত্র গঠনের জন্য চাই শুভমন, শুভচিন্তা এবং আনুগত্য। আনুগত্য শুধু পিতামাতা, শিক্ষক, সব গুরুজনদের প্রতি নয়, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা-উন্নতি-মঙ্গলের দায়িত্ববাহী শাসকদের প্রতিও। কে. ডি. দাসের একটি বাক্য আমার মনকে কামড়ে দিল—তিনি বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই জানো না, বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী নিজের পরিচয় দেন, 'জনগণের অনুগত ভৃত্য' হিসাবে। এটাই হলো ইংরেজ রাজত্বের মর্মকথা : শাসক শাসিতের একান্ত অনুগত ভৃত্য।

তিনি আরও বললেন, তোমাদের বিতর্কের বিষয়টা খুবই সময়োচিত। আমি একটা কথা পরিষ্কার করে বলত চাই। যারা বিষয়ের প্রতিপক্ষ হবে, তারা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে নিজেদের বক্তব্য রাখবে। আমরা জানি বেশ কিছু লোক ইংরেজ প্রশাসনকে সুনজরে দেখছে না। তারা সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী শোষক ইত্যাদি অনেক গর্হিত শব্দে ইংরেজ শাসনের বর্ণনা করছে। তাদের বক্তব্য অনেক পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, সভা সমিতি শ্রুত হচ্ছে। ও থেকেই বোঝা যায় ইংরেজ শাসকগণ কতোখানি উদার ও ভিন্নমত সহিষ্ণু। বৃটেন গণতান্ত্রিক, জনসাধারণ সেখানে প্রকৃত শাসক। ভারত সম্রাটের উদার উদ্দেশ্য এদেশকে স্বয়ং শাসনের অধিকার দেওয়া। সে পথেই বৃটিশ

সরকার এগিয়ে যাচ্ছেন। "আমার ছোট ছোট বন্ধুগণ, তোমরা নির্ভয়ে বিতর্কে যোগ দাও। মন খুলে কথা বলো।"

সভাপতি যখন বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের দুপক্ষে বিভক্ত হ'তে বললেন, তখন দেখা গেল বিতর্কে ইংরেজ শাসনের স্বপক্ষে বলবার জন্য একে একে সবাই সভাপতির ডানদিকে হাজির হয়েছে। কেউ ইংরেজ শাসককে সমালোচনা ক'রে কিছু বলতে প্রস্তুত নয়। অথবা সবারই বিশ্বাস ইংরেজ শাসনে ভারতের উন্নতি, শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ ও নিরাময় ছাড়া আর কিছু ঘটেনি।

দৃশ্য দেখে আমার মতিভ্রম হয়ে গেল।

আমি পিছন ফিরে উমেশবাবুর দিকে তাকালাম। তিনি তখন বুঁদ হয়ে রাধাকৃষ্ণ জপ করছেন।

আমি উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম সভাপতির বাম দিকে। সমবেত লোকেদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। আরও একটি ছেলে, তার নাম ভুলে গেছি, কোন্ স্কুলের ছাত্র তাও মনে নেই, আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

প্রস্তাবের পক্ষে আঠারটি বক্তা, বিরুদ্ধে মাত্র দুটি।

সভাপতি কে. ডি. দাস খুশি হলেন, না অ-খুশি হলেন বোঝা গেল না।

তিনি বললেন, "প্রস্তাবের পক্ষে যখন এত বেশী তখন তাদের কথাই আগে শোনা যাক। ডান দিকে ন'জনের বক্তব্য শেষ হলে, বামদিকের প্রথম বক্তাকে ডাকা হবে। তারপর বামদিকের আরও ন'টি বক্তা; সবশেষে ডানদিকের দ্বিতীয় বক্তা।"

প্রায় সবাই তাদের বক্তব্য লিখে এনেছিল। একে একে সেগুলি পড়া হল। কেউ পাঁচ মিনিটের বেশী সময় নিল না, যদিও সভাপতি সবাইকে দশ মিনিট সময় দিয়েছিলেন।

ন'জনের বক্তব্য শেষ হবার পর আমার ডাক পড়ল।

মনে আছে, আমি একটি ফর্সা ধুতি, নীল বর্ণের ছিটের শার্ট পরে বিতর্কে গিয়েছিলাম। পায়ে তিন বছরের পুরোনো স্যাণ্ডেল, খুব সামান্য ব্যবহৃত।

কি বলেছিলাম সব, আমার এখনও মনে আছে। উমেশবাবুর তালিমটা আমার পুরো মুখস্ত ছিল। সেটা বৃটিশ শাসনের প্রশস্তি। তাতে ১৯০৮ সাল থেকে কি ভাবে ধীরে মন্থরে ইংরেজ ভারতকে স্বায়ত্ত শাসনের জন্য তৈরী করেছে তার বর্ণনা ছিল। সে মুখস্ত বক্তব্যকে মুক্তি দেবার সুযোগ থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করেছি। কি বক্তব্য রাখবো এখন তার বদলে?

অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে একটা বক্তব্য তৈরী করছিলাম। সভার মানুষদের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম জিভ শুকিয়ে গেছে, গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। তখন নিজেকে একটা তীব্র ভৎ‌সনা আর ধাক্কা দিয়ে উঠলাম। 'এই বোকা, এখন ইঁদুর হয়ে পড়েছিস? তুই না রজনীকান্তের নাতি!"

সে ধাক্কাটা আমাকে তড়াক ক'রে জাগিয়ে দিল। আমি যা বললাম তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যটাই লিখছি তোমার জন্যে। গণেশপুরের লাইব্রেরী থেকে আনা অনেক বই-এর পাতা আমার মনে ভেসে উঠল। আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল। একবার পড়লেই পাঠ্য বিষয় প্রায় মুখস্থ হয়ে যেত। যা পড়তাম তার প্রায় অনেকটাই পরিস্কার মনে থাকতো। আমি মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে রবীন্দ্রনাথের "ভারতবর্ষ" ও "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধ দু'টি পড়েছিলাম। মাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। তার অনেকটা আমার স্বচ্ছভাবে মনে ছিল। আমি ঐ দুটি প্রবন্ধের আশ্রয় নিলাম।

"ইংরেজ শাসনে ভারতের শান্তি, স্থিতি, উন্নতি হয়নি এমন কথা বলব না," —আমি নিবেদন করলাম। "কিন্তু আমরা এখনও অতি দরিদ্র, নিরক্ষর, রোগজীর্ণ, আমরা মানে আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ। আমাদের যা প্রয়োজন, আমরা যা আকাঙ্ক্ষা করছি তা এখনও আমাদের নাগালের অনেক দূরে বলে আমার মনে হয়। কিন্তু একদিন আমরা স্বাধীনতা পাবো, সেদিন দূর হোক, নিকটে হোক। আমাদের ভেবে দেখতে হবে স্বাধীনতা পেয়ে আমরা তার ব্যবহার করবো কি ভাবে? আমরা শুনে আসছি জাতি হিসেবে, সভ্যতা হিসেবে আমাদের বড় দোষ আমরা অল্পে সন্তুষ্ট। আমাদের কি দীক্ষার অভাব? য়ুরোপ অসম্ভবকে আলিঙ্গন ক'রে প্রকৃতিকে জয় করেছে। ভারতবর্ষকে জয় করেছে ইংরেজ। ভারতবর্ষকে প্রকৃত রূপে চিনতে পারলে, ইংরেজ সরকার আমাদের জন্যে কি করেছেন, কি করেননি, এ প্রশ্ন দুর্বল হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এক প্রবন্ধে 'অমর ভারতবর্ষের' কথা লিখেছেন, লিখেছেন, সেই অমর ভারতবর্ষ 'ফললোলুপ কর্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেশিত। এই-যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের আকাল ও উত্তেজক হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন, শোকহীন, মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাহাকে 'ফ্রীডম' বলে সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে

মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল ভীরু, তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর : তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজেদের সমতুল মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবল অন্যকে আঘাত করে, এইজন্যে অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রি-দিন বর্ম-চর্মে অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে—তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর পথ মহত্ব, যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আহ্বান করিয়া আনি, অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট পবিত্র হবে।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উদাত্ত বাণীর পর আজকের বিতর্ক সভার প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ে। আমার বিশ্বাস ইংরেজ রাজত্ব ভারতবর্ষের যতটুকু কল্যাণ মঙ্গল স্থিতি স্থাপন করতে পেরে থাকুক, তার অন্তর বিশেষ ভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। আমাদের অন্তর থেকে, আত্মা থেকে, উপাদান সংগ্রহ ক'রে একদিন আমরা নতুন ভারতবর্ষ গড়বো, তার জন্যে কত বছর অপেক্ষা করতে হয় সেটা মোটেই বড কথা নয়, কেননা ভারতের সভ্যতা, ধর্ম, চিত্ত ও মন কালাতীত।"

মনে আছে, বক্তব্যের শেষে আমি সভাশুদ্ধ লোকেদের করতালি পেয়েছিলাম। সভাপতি কে. ডি. দাসও সেই করতালিতে যোগ দিয়েছিলেন। সম্ভবত সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তের বছরের এক বালককে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা প্রবন্ধের অতখানি একটানা মুখস্থ বলে যেতে দেখে।

বিতর্কে আমার প্রথম হবার সিদ্ধান্ত সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন। আমাকে নিয়ে বেশ একটু হইচই হয়েছিল। পালং স্কুলের হেড মাষ্টার আমাকে ও উমেশবাবুকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের মিষ্টি খাওয়ালেন। বললেন, এ ছেলে ম্যাট্রিকে নিশ্চয়ই ডিষ্ট্রিক স্কলারশিপ পাবে।'

সে ছেলে তা পায়নি। পেয়েছিল সুভাষ ধর, মাদারীপুরের এক উকিলের ছেলে, পরে যে ইউনাইটেড নেশনসে বড় কাজ করছে, এখন অবসর নিয়ে বাস করছে নিউ ইয়র্ক শহরে। বিবাহ করেছিল স্বনামখ্যাত জি. এল. মেহেতার প্রথম কন্যাকে।

আমার মনে আছে বক্তৃতায় আমি নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছিলাম। মন আমার বিষণ্ণ হ'য়ে গিয়েছিল।

উমেশবাবু আমাকে বাহবা দিতে এলে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, "সব মিথ্যে কথা বলেছি। যা বলা উচিত ছিল, বলার ইচ্ছে ছিল, তা কিছুই বলিনি।"

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেও সোনা কেন, কোনো মেডেলই আমার মেলেনি। হেড মাষ্টার মশাই ইন্সপেক্টর অব্‌ স্কুলস্‌কে পত্র লিখে জবাব পাননি।

অবশেষে আমি নিজেই কে. ডি. দাসকে চিঠি লিখেছিলাম। মনে আছে, তিনি ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা।

তিন মাস পরে জবাব এসেছিল। কে. ডি. দাস আমার জীবনে প্রথম "বড় মানুষ"। লিখেছিলেন কি ভীষণ ব্যস্ত তাঁকে থাকতে হয়, কতো বড় বড় ব্যাপারে তিনি জড়িত। তবু আমাকে তাঁর মনে আছে। "তোমার সুন্দর বক্তৃতাটাও আমি ভুলে যাই নি।"

কিন্তু মেডেলের কোনো উল্লেখ ছিল না সেই চিঠিতে। "বড় মানুষদের" সম্বন্ধে একটা সন্দেহ আমার মনে লেগেই রইল। এঁরা কি কথার দাম দেন না? সীমান্ত গ্রামের একটি ছেলেকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোল তা পালনের কি কোনো দায়িত্ব নেই এই "বড় মানুষটির"?

'ঢুলি' নৌকায় পালং যাওয়া আমার জীবনে প্রথম ঘর ছাড়া, 'বিদেশ' যাত্রা। স্কুল থেকে পাঠানো হচ্ছে, শিক্ষক উমেশবাবু আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, জ্যেঠামশাই কোনো আপত্তি করলেন না, মা তাঁর অন্তরের ভয় ও দুশ্চিন্তাটুকু চেপে রেখে হাসিমুখে মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। ছোট্ট নক্সাকাটা টিনের বাক্সে আমার জন্য একটা ধুতি, একটা শার্ট, দুটো ফতুয়া দিয়েছিলেন মা।

ফেরার সময় সন্ধ্যের একটু আগে 'ঢুলি' নৌকায় চেপেছিলাম আমি ও উমেশবাবু। উমেশবাবুর বিপুল বপু ধুতি-পাঞ্জাবী ও নামাবলী চাদরে আবৃত। ছোট মাংসল গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কাঁচাপাকা চুল বাবরি না হলেও বেশ বিস্তর ও ঘন। নাকে লোহার ফ্রেমে মোটা কাচের চশমা। সর্বদা পান চর্বন করেন উমেশবাবু দোক্তার সঙ্গে। অনেক সময় মুখ থেকে পান-দোক্তার লালা ঝরে। আস্তিনে তা মুছে নেন। ঘন ঘন পিক ফেলেন উমেশবাবু।

পদ্মাতীরে ঢুলি নৌকা সওয়ারীর অপেক্ষা করছিল। আমরা দুজনে নৌকায় চড়ে দেখলাম আরও তিনটি যাত্রী আগেই এসে গেছে: এক দম্পতি, তাদের বছর পাঁচেকের এক কন্যা। ঘোমটায় বৌটির সারা মুখ ঢাকা, তার স্বামীর দেহে জামা নেই, পরণে

আধময়লা ধুতি। বাচ্চা ছেলেটা পরেছে ছিট কাপড়ের ইজের, যা এখন আর গ্রামাঞ্চলেও চোখে পড়ে না।

আরও দু'জন যাত্রী এল। এরা মাঝ বয়সী জেলে, পথে একটা গ্রামে নেমে পড়বে, সেখানে ওদের নৌকা কাল থেকে বাঁধা রয়েছে। উমেশবাবুর প্রশ্নের জবাবে তারা বলল, এ বছর নদীতে মাছের অভাব, জেলেদের সংখ্যা বেড়েছে, তাদের রোজগার কমে গেছে। এরা, শুনতে পেলাম, দুই ভাই, সেনচৌধুরীদের প্রজা। নৌকা ছাড়ল। তখনও অন্ধকার নেমে আসেনি পদ্মার বুকে, চৈত্র মাসের আকাশে উড়ন্ত মেঘ, রং মাত্র কালো হ'তে শুরু করেছে। মেঘ, কচি ছেলে-মেয়েদের মতো স্বচ্ছন্দ চঞ্চলতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে। নদীর কিনারে গাছ—আম, বকুল, কদম, শিরীষ, কাঠাল, জামরুল, নারিকেল, সুপারী। কামিনী ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে হাল্‌কা বাতাসের সঙ্গে, কদম গাছে তখনও ফুল আসেনি, অপেক্ষা করছে বর্ষার। চৈত্র মাসেই বর্ষার প্রথম পদক্ষেপ আমাদের গ্রামে। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি, খুব তেজ নেই সে বর্ষণে, বর্ষা ভৈরব গর্জনে আসবার মাসখানক বাকী। চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে গ্রামের খালের পাড়ে বসে যায় তিন দিনের মেলা, চাষীরা নিয়ে আসে চাল, ডাল, কুমড়ো, লাইনের পর লাইন পড়ে যায় চুড়ির দোকানের। সস্তা সব খেলনার। কামারেরা সাজিয়ে বসে বটি, দা সব রকমের কোদাল, খুপরী, লোহার কাটা, (যা দিয়ে ডাল গলান আমাদের মায়েরা) খন্তা, আরও কত কী! মুদীরা সাজায় দোকান মশলাপাতি, ডালচালের দোকান। বসে যায় কাপড়ের দোকান। তখন সবে মাত্র তৈরী শার্ট, শায়া বাজারে আসতে শুরু করেছে। বসে যায় জুতোর দোকান, রবারের জুতো, কেম্বিসের, চামড়ারও। বর্ষা ঋতুতে সব কিছুরই অভাব, গ্রাম ভেসে যাবে নদীর উদ্বৃত্ত জলে, গৃহীরা বর্ষা মাসের জন্য কুমড়ো কিনে রেখে দেয়, গায়ে চুন লাগিয়ে, যাতে না পচে, পোকায় না কাটে। অনেকে সারা বছরের মশলাপাতি কিনে রাখে। চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় সব কিছুর দাম কিছু কম।

জেলে দুই ভাই, অন্য লোকটি ও উমেশবাবু আসন্ন চৈত্রের মেলার কথা বলছিলেন। গত বছর বৃষ্টি ভাল হয়নি, শস্য ভাল ফলেনি আশানুরূপ, কিন্তু খুব খারাপ দশা নয় মাঠে, কিছু বর্ষা এসেছিল ভাদ্র-আশ্বিনে। বৃষ্টি না আসলে গড়পড়তায় প্রতি দু বছরে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হোত, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা নদীমেখলা বঙ্গভূমিও বাদ পড়ত না। তখন চালের দাম মন প্রতি দু'টাকা বেড়ে যেত। আমাদের কুড়ি টাকা মাসিক বাজেটে ভীষণ টান পড়তো। মধু ও আমি বেড়িয়ে পড়তাম জঙ্গল থেকে

ঢেকী শাক, পুকুর থেকে কলমী শাক সংগ্রহে, চিনিকাকু ও আমি যেখানে যতটুকু জমি মিলত সব্জিখেত তৈরী করতাম। পুকুর থেকে মাটির কলসী করে জল তুলে নিয়ে এসে সিঞ্চিত করতে হতো ক্ষেতকে, ফলত ডাটা, পুঁইশাক, কুমড়ো-লাউ-শশার লতা, ঝিঙে, ঢুন্দুল, সীম, বেগুন। মাঝে মধ্যে চুরি করে সেজদাদুর পুকুর থেকে মাছ ধরতাম। বাইরের পুকুরে বরশি পেতে সারাদিন বসে থাকতেন জ্যেঠামশাই। যেদিন রুই, কাতলা, মৃগেল ধরা পড়ত, ভাগ পেতাম আমরা। পশ্চিমের প্রতিবেশী বাড়ীর সঙ্গে সীমানা ছিল একটি সরু খাল, কেবল বর্ষার সময় এটা জীবন্ত হয়ে উঠত। নদীর জল আসত বাইরের পুকুরে। বর্ষার স্রোতের সময় আমরা চিংড়ি ধরার জন্য সরু বাঁশ ও বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরী করতাম বেড়াজাল, গলদা মাঝে মাঝে ধরা পড়তো। কুচো চিংড়ির জন্য গামছা পাততাম পুকুরের জলে, গামছার সঙ্গে উঠে আসত অন্তত আধ-মুঠো কুচো চিংড়ি। ডোবার জল নিংড়ে কই, শিঙি, মাগুর, শোল মাছ ধরতাম, সারা শরীরে কাদা মেখে, অনেক পরিশ্রমে।

দুর্ভিক্ষের বছরেও আমাদের মত গরীব মধ্যবিত্ত মানুষদের পেটে ক্ষুধা নিয়ে দিন বা রাত কাটাতে হোত না।

নৌকায় চারজন পুরুষের আলোচনা আমার মনে এ সব ভাবনা এনে দিয়েছিল। চলতি নৌকার সঙ্গে সঙ্গে তীরের গাছ, বাগান, বসত, ধীরে ধীরে পেছনে সরে যাচ্ছে। একটা নিথর স্থির পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে নদী, আকাশ, সমাগত অন্ধকারের মিলনে। পুরুষদের কথা আমার কানে আসছে না, আমি বৈঠা চালক মাঝির পাশে এসে বসেছি, কানে আসছে শুধু বৈঠার সঞ্চালনের ছলছল শব্দ, সে শব্দ বাজছে আমার বুকে, আমার কল্পনায়।

তরুছায়া সীমারেখা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। নদী ক্ষুরধার, উচ্ছল নয় শান্ত সমাহিত! স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে কচুরীপানা, কাঠের টুকরো, মরা কুকুর বেড়ালের শব। মাঝি নৌকাকে রাখছে তীরের কাছাকাছি, যাতে স্টেশনে নামতে সুবিধা হয়। মায়ের আঁচলের মত বিস্তৃত শান্তি, নিস্তব্ধতা, সন্ধ্যা অন্ধকার। আমি যেন অসীম সময়ের সীমা ছাড়িয়ে কোথায় চলে গেছি, আমার মনে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। পালং স্কুলে বিতর্ক সভা গেছি ভুলে। ইংরেজ রাজত্ব কি আমি কতটুকু জানি? তার আঘাতে ভারত কতটা ক্ষতবিক্ষত, দগ্ধ, তাও আমার জানা নেই। আমি কেবল জানি আমার গ্রাম গণেশপুর, তার পাশ কেটে প্রবাহিত পদ্মা, আমাদের জেলে প্রজাদের সরল ব্যবহার, আমার মার গভীর স্নেহ। আমার ভক্ত-

ভাইবোন, যাদের কাছে আমার উপরে কেউ নেই। আমার কৈশোর মানসের প্রান্তদেশে পিতা দুর্জয় সিংহ, যাঁকে আমি একই সঙ্গে ভয় করি, ভালোবাসি। বিলক্ষণ জানি আমাদের বেঁচে থাকার, বড় হবার মূলে তিনি।

ক্রমে ক্রমে অন্ধকার ঘনকৃষ্ণ হয়ে বসেছে। এরই মধ্যে দ্বিতীয় মাঝি রান্না করছে মোটা চালের ভাত আর ইলিশ মাছের ঝোল। সবার সঙ্গে খেয়ে আবার আমি মাঝির পাশে এসে বসেছি। নিস্তব্ধ রাত্রে নদীতীরে আম্রবন, গৃহবাড়ী, শস্যক্ষেত্র, বিপণী-বাজার সব একাকার হয়ে গেল এক সময় অন্ধকারের সঙ্গে। মাঝি আমাকে বলল, খোকাবাবু তোমার ঘুম আসছে, ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমার কিশোর মনে আঁকা আশার কবিতা নিরবে ঝংকৃত হচ্ছিল, আশার সঙ্গে আকাশের বুকে এক চিলতে চাঁদের তৎক্ষণাৎ মিতালি হয়ে গেল।

আজকে আমি সুখে রব
কিছুই না নিয়ে—
আপন হ'তে আপন মনে
সুধা ছানিয়ে।
বনে হ'তে বনান্তরে
ঘনধারায় বৃষ্টি ঝরে
নিদ্রাবিহীন নয়ন-পরে
স্বপন বানিয়ে।
আজকে পরান ভরে লব
কিছুই না নিয়ে।

॥ পাঁচ ॥

তরুণদের স্বাধীনতা সংগ্রাম. বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদ থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে ইংরেজ সরকার সারা বঙ্গের স্কুলে কালচারেল আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন। তার নাম 'ব্রতচারী'। এক ডাকসাইটে আই-সি-এস গুরুসদয় দত্ত যিনি পরে 'নাইটহুড' পেয়ে স্যার গুরুসদয় দত্ত হয়েছিলেন, এবং যাঁর নাম দক্ষিণ কলকাতার একটি রাস্তায় অমর হ'য়ে রয়েছে, তিনিই 'ব্রতচারী' আন্দোলনের প্রণেতা। ছড়া বেঁধে তাতে সুর লাগিয়ে, নৃত্য-গানের রূপ দেওয়া হয়েছিল ব্রতচারী আন্দোলনের। অনেকগুলি ছড়ার সঙ্গে দেশের মাটির সম্পর্কে চাষী, মজুর, ধোপা, গোয়ালা এদের সঙ্গে ব্রতচারীদের জীবনের সংযোগ।

গণেশপুর হাই স্কুলেও 'ব্রতচারী' চালু হয়েছিল। মহকুমা প্রশাসন থেকে এক বিশেষ যুবক শিক্ষক এসেছিলেন আমাদের ব্রতচারীর নাচ-গান শেখাতে। সব নাচ গুলোকেই ফোক-ড্যান্স, গ্রামের মানুষদের বিশেষ করে সাঁওতালদের নাচের অনুকরণ বা সমীকরণ। লাঠি হাতে নিয়ে করতে হোত কয়েকটা নাচ, কয়েকটা নাচ হাতে হাত মিলিয়ে, বাহুতে বাহু সংলগ্ন করে। গানগুলি বলত, আমরা চাষীর বন্ধু, কোদাল দিয়ে মাটি কাটি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুজি রোজগার করতে হয় আমাদের, আমরা দুঃস্থের সেবক, ক্ষুধার্তকে অন্ন, রোগীর সেবা, নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করা, রাস্তা বানানো, খাল কাটা, এসব আমাদের জীবনযাত্রার উপাদান, লেখাপড়া শেখবার সঙ্গে সঙ্গে। ভদ্রলোক বাড়ীর সন্তান হ'য়ে আমরা গরীব গ্রামবাসী মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাইনি, তারাই আসলে আমাদের প্রকৃত বন্ধু তারাই দেশের নব্বুই ভাগ লোক।

ব্রতচারী নৃত্যসঙ্গীত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বেশ ভালোই হতে পারতো, যদি না সবাই জানতো কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ভূমিষ্ঠ করা হয়েছে। গানগুলি বেশ ভালোই রচিত, সুরের মধ্যে ছিল গ্রামের মানুষের মনের টান, নৃত্যের মধ্যে ছিল গ্রামীন জীবনের হিল্লোল। তথাপি গণেশপুরের হাই স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রদের মন কেড়ে নিতে পারেনি 'ব্রতচারী'।

যে যুবক শিক্ষকটি মাদারীপুর থেকে এসেছিলেন ব্রতচারী শেখাতে, তাকেও কেমন

কেমন দোষা হিসেবে দেখতো সবাই। তাঁর নাম মনে নেই, আমার বাল্য ও যৌবনের প্রখর স্মৃতিশক্তি এখন এই তিন-কুড়ি দশ পরিণত বয়সে হারিয়ে গেছে। এখন নাম ভুলে যাই, মুখ মনে রাখতে পারি না। যদি ভদ্রলোকের নাম যতীন হয়ে থাকে, যতীনবাবু মানুষটি বড় সুন্দর ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর জোরাল ও মধুর, ছিপছিপে শরীর নৃত্যপটু। তিনি সর্বদা হাসিখুশি, বন্ধুত্বপূর্ণ। নাচ শুরু হবার আগে ও শেষ হবার পরে তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, গ্রামের খবর নিতেন, কি হচ্ছে না হচ্ছে জানতে চাইতেন। মাঝে মধ্যে বাতাসা লজেন্স নিয়ে আসতেন পকেটে করে। বিলিয়ে দিতেন আমাদের। 'ব্রতচারী' ছাড়াও অন্য খেলাতেও ছাত্রদের সঙ্গে তিনি যোগ দিতেন।

যতীনবাবু থাকতেন ডিঙ্গামানিক গ্রামে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ীতে। তখন গণেশপুর গ্রামে দু-তিনটে সাইকেল এসে গেছে। প্রত্যেকটাই জমিদার বাড়ীর কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য, মাঝে মাঝে জমিদারের ছেলেরাও সাইকেলে চেপে স্কুলের পাশ দিয়ে যে বড় রাস্তাটা পদ্মাপার পর্যন্ত চলে গেছে তার ওপর ছুটোছুটি করতো। যতীনবাবুরও একটি সাইকেল ছিল। এটা ছিল আমাদের কাছে বড় এক বিস্ময়। স্কুলের শিক্ষকেরা যা বেতন পেতেন তাতে তাদের কোনোক্রমে সংসার সংকুলান হোত। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন এক রাজবন্দী শিক্ষক এলেন, বি. এ. পাশ, অঙ্কের ভুখোর। বেশীর ভাগ শিক্ষকরাই ইণ্টারমিডিয়েট পাশ ছিলেন। এই নতুন শিক্ষকটিকে আমরা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম, তিনি স্বদেশী ক'রে জেল খেটেছেন, ডেটিনিউদের নিয়ে আমাদের বুকে একটা রোমান্টিক চাঞ্চল্য ছিল, আমরা ভাবতাম এরা ভীষণ বীরপুরুষ, ইংরেজের সঙ্গে লড়ছে। এই মাষ্টার মশাই, যার নাম ছিল পুলিন রায়, বেতন পেতেন মাত্র কুড়ি টাকা। নিজেই একদিন আমাদের ক্লাসে বলেছিলেন। বছর দুই আমাদের হেডমাষ্টার ছিলেন না, যিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন তাঁর নাম যতীন চক্রবর্তী, তিনি অন্য স্কুলে চলে গিয়েছিলেন। আমার দশম ক্লাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, চব্বিশ-পরগণা থেকে এলেন এক নতুন হেডমাষ্টার। পুরো এম. এ. বি. টি। চমৎকার সহজ ইংরেজী লিখতেন, আর সব শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ইংরাজীতে গলগল বক্তৃতা করতে পারতেন। তাঁর মাইনে ছিল ষাট টাকা। স্কুলের সংলগ্ন হেড মাষ্টার মশাইয়ের জন্য একটা বাড়ী ছিল, অনেকখানি জায়গা নিয়ে; সে বাড়ীর পরেই পথের উপর পোষ্ট অফিস, যাকে সরকারী ভাষায় বলা হোত সাব-পোষ্ট অফিস, স্কুলের খেলার মাঠ ও এই দুটো বাড়ীর মধ্যে ছিল বেশ বড় একটা

পুকুর। নতুন হেড মাষ্টার প্রমোদবাবুকে আমরা সবাই ভালোবাসতাম। যতীনবাবুর মতো তিনি বেত হাতে নিয়ে ক্লাসে ঢুকতেন না, মারতেন না কাউকে। আমার সঙ্গে তাঁর একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। তিনি বলতেন, ইংরেজীতে দশম শ্রেণীতে আমি সবচেয়ে ভাল ছাত্র, অঙ্কে সবচেয়ে খারাপ। প্রমোদবাবুর ষাট টাকা (তখনকার দিনে এত অনেক টাকা আমি কল্পনা করতে পারতাম না।) মাইনে পেয়েও সাইকেল কিনতে পারেন নি। পায়ে হেঁটেই তাঁকে যাতায়াত করতে হোত।

'ব্রতচারী' শিক্ষক 'যতীনবাবু আমাকে কাছে ডেকে একদিন জানতে চাইলেন আমাদের পরিবারের কথা। আমি অবাক হলাম যখন তিনি বললেন, রজনীকান্তের কাহিনী তাঁর অজানা নয়, তিনি বিখ্যাত বক্তা ছিলেন, তাঁর একটা 'ডাকাত' দল ছিল, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি জেলে গিয়েছিলেন। আমার পিতা খুলনায় বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন জেনে খুশি হয়েছিলেন যতীনবাবু: "তোমার বাবা ও আমি একই জীবিকার মানুষ।" আমি মা আর ভাই-বোনেদের নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে থাকি শুনতে পেয়ে জানতে চেয়েছিলেন আমাদের অভিভাবক কে। আমি বলেছিলাম, অভিভাবক দুজন, মা এবং জ্যেঠামশাই, যিনি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিজের সামাজিক ওজন বাড়াবার জন্য 'যতীন'বাবুকে জানিয়েছিলাম, আমার কাকা সুদূর পাঞ্জাবে গণিতের অধ্যাপক, তিনি প্রথম শ্রেণীতে এ. এম. পাশ করেছিলেন। এসব আলাপচারীর পরে যতীনবাবু বললেন, "তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে আমাকে? তোমার মা'র সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছে হচ্ছে।"

দারুন খুশিতে মা'র অনুমতি নিয়ে যতীনবাবুকে আমি একদিন বাড়ী নিয়ে এসেছিলাম স্কুল ছুটির পর। পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছিল তাঁকে, খালের ওপর বাঁশের সাঁকো, সাইকেল পথ অবশ্য নয়, তাছাড়া, আমি সাইকেলের পেছনে চাপতে রাজী নই।

মার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন যতীনবাবু। আমার মা সুন্দর কথা বলতে পারতেন, বোঝা যেত তিনি হাই স্কুল পাশ না করেও বেশ শিক্ষিতা। অনেক তাঁর পড়া, এমন'কি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিও, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র তো বটেই। অনেক বই নিয়ে'আলোচনার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। এক সময়ে যতীনবাবু বললেন, "মাসিমা, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশী সাহিত্য পড়েছেন। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সাহিত্য বেশী পড়িনি।"

যতীনবাবু আমাকে গ্রাম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন। গণেশপুর লাইব্রেরীতে

কত বই, কারা রীতিমত লাইব্রেরীতে আসে, বিশেষ ক'রে যুবকরা. ব্যায়াম করে ক'জন, ব্যায়াম কে শেখায়, আমি ব্যায়াম করতে যাই কিনা। ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন।

কথায় কথায় যতীনবাবু অনন্তদার প্রসঙ্গে পৌছলেন।

—"তুমি চেন অনন্তদাকে ?"

—"চিনি, তবে দূরে থেকে।"

—"তাঁর তো সুনাম গণেশপুরে।"

—"অনন্তদা দারুন ভালো, আমাদের সবাইকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।"

—"কি করতে বলেন তোমাদের ?"

—"বলেন, শরীর ও চরিত্র গঠন করতে হবে, তা না হলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না।"

—"খুব ঠিক কথা, অনন্তদার খ্যাতি দশখানা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে।"

—"আমি চেনেন অনন্তদাকে ?"

—"না, পরিচয়ের সুযোগ হয়নি।"

—"ব্যায়াম যেখান হয় সেখানে গেলেই পরিচয় হবে।"

—"তোমাদের গ্রামে তো নির্মল কাকা আছেন, তাই না ?"

—"হ্যাঁ, তবে তিনি কলকাতায় আছেন।"

—"তুমি তাকে চেন ?"

—"দেখেছি নির্মলকাকাকে।"

—"তিনি তো রাজবন্দী ছিলেন, তাই না।"

—"তাই শুনেছি আমরা।"

—"রাজবন্দী মানে জানো।"

—"না।"

—"যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে রাখা হয়। বিচারের প্রয়োজন হয়না। কিছুদিন পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরাই হলেন রাজবন্দী। ইংরেজীতে 'ডেটিনিউ' অর্থাৎ যাকে 'ডিটেন' করা হয়েছে, আটক করা হয়েছে।"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, বুঝেছি।

যতীনবাবু বললেন, "তুমি বড় হ'য়ে কি করবে।"

আমি এ কথাটা একদম ভাবিনি। বললাম, "জানি না। সে তো অনেক দূরের কথা! স্কুল পাশ করে কলকাতার কলেজে পড়ব. এখন এটুকুই জানি।

—"স্কুলে তো তোমার খুব ভাল ছাত্র হিসাবে সুনাম। হেডমাষ্টার তোমার ইংরেজী ও বাংলার ওপর দখলের কথা কমনরুমে প্রায়ই বলেন।"

"আমি অঙ্কে ভীষণ কাঁচা। অঙ্ক করতে আমার একটুও ভালো লাগে না। দেখবেন আমার অঙ্কের সব খাতা. এ্যারিথমেটিক, এ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি! তিনটে খাতাই খালি পাতায় ভরা।

—"অঙ্ক তো খুব ইণ্টারেস্টিং। একবার মন বসলে আর মন সরাতে পারবে না। আমি তোমাকে অঙ্ক শেখাবো।"

আমাকে চুপ থাকতে দেখে বললেন, "না. না, ট্যুইশনি নয়। আমি এমনিতেই সপ্তাহে একদিন তোমার বাড়ী এসে তোমাকে অঙ্ক শেখাবো। তোমার মাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। অপরকে সহজে আপন করে নিতে পারেন।"

মা যতীনবাবুকে মুড়ি ও চা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন. 'বিস্কুট নেই আমাদের ঘরে। আমার ছেলে মেয়েরা সারা গ্রীষ্ম ও শরৎ সকালে পান্তা খায়. লঙ্কা আর নারকেলের টুকরো দিয়ে। এটাই এদের 'ব্রেকফাস্ট'।

যতীনবাবু বলেছিলেন, "পান্তা খেতে আমিও ভালোবাসি। কিন্তু ঘুম পেয়ে যায়। জানেন তো পান্তা থেকে আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা ঘরোয়া মদ তৈরী করে।"

এ খবরটা আমারও জানা ছিল। আমি বলে উঠলাম, "মহুয়া থেকেও মদ তৈরী হয়। আমাদের গ্রামে অবশ্যি মহুয়া তৈরী হয় না।"

যতীনবাবু বিদায় নিলেন। মা বললেন, "বড় ভালো ছেলেটি। খুব সহজে ভাব জমাতে পারে।" সপ্তাহে আমাকে একদিন বাড়ী এসে অঙ্ক শেখাবেন শুনে মা যতীন-বাবুর উপর আরও খুশি হলেন।

এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে যতীনবাবুকে কে বা কারা খুন করে ফেলল। তাঁর নিজের শয়ন ঘরে, বড় এক পাথর খণ্ডে তাঁর ঘুমন্ত মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে।

গণেশপুরে ভীষণ শোরগোল হয়ে গেল।

আমরা শুনতে পেলাম যতীনবাবু সরকারের স্পাই, গোয়েন্দা!

॥ ছয় ॥

স্বদেশী সংগ্রামের হাওয়াকে রুখতে কর্তৃপক্ষ আরও একটা হাওয়া গণেশপুরে নিয়ে এলেন। এ হাওয়ার নাম মুসলিম লীগ। স্কুলের স্থাপন মুসলমান জমিদারদের হাতে। তাঁদের অট্টালিকা বা প্রাসাদের সংলগ্ন স্কুল। কিন্তু মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা খুব কম, মুসলমানরা খুব গরীব, ছেলেরা একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে যায় বাবা কাকা দাদাদের সঙ্গে, স্কুলে তাদের পাঠানো হয় না। নীচের ক্লাসে যদিও বা দু-দশটা মুসলমান ছাত্র আসত, সেভেন-এইটে তাদের প্রায় সবাই কেটে পড়ত। আমার সঙ্গে ক্লাস এইটে একটি মাত্র মুসলমান ছেলে ছিল। আবদুল খালেক। তার সঙ্গে ছিল আমার গভীর বন্ধুত্ব।

মাষ্টারমশাইদের মধ্যেও মাত্র দুজন মুসলমান। একজন মৌলবী, তিনি ছাত্রদের আরবী, উর্দু পড়াতেন, আমাদের সঙ্গে ছোট একটা কথাও বলতেন না। চেহারা থেকে বোঝা যেত তিনি বাঙ্গালী নন। উত্তর ভারত থেকে আমদানী—থাকতেন জমিদার বাড়ীতে—জমিদারদের ছেলে-মেয়েদের আরবী, উর্দু শেখানোই ছিল তাঁর প্রধান কাজ।

দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন মান্নান সাহেব। সরু চেহারা, লম্বা দেহ, দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট চোখে এমন ভাবে তাকাতেন যেন বিশেষ কিছু দেখতে পেতেন না। সেজন্য তাঁর বিশেষ কিছু অসুবিধা হোত না। সর্বদা সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবী পরতেন, মাথায় সাদা মুসলমানী টুপি। মিহি স্বরে কথা বলতেন মান্নান সাহেব। আমরা সবাই তাঁকে ভালোবাসতাম। তিনি সত্যিকার ভালোমানুষ ছিলেন। মান্নান সাহেব অঙ্কের মাষ্টার ছিলেন বলেই সম্ভবত গণিতে আমার আতঙ্ক ও অনীহা জন্মেছিল। কোনো কিছুকে আকর্ষণীয় করার ক্ষমতা বা প্রচেষ্টা ছিল না মান্নান সাহেবের। নিজেকেও না।

কিন্তু ক্লাস এইটে পড়বার সময় এক নতুন এসিস্টেন্ট হেড মাষ্টার এলেন। রহমান আজিজ সাহাব। তিনি চুড়িদার ও সেরেওয়ানী পরতেন, মাথায় আরবী টুপি, বয়স নিশ্চয়ই কম ছিল, দাড়ি, গোঁফ, চুল কালো। সরু কপাল, খাঁদা নাক, হঠাৎ ভেঙ্গে পড়া চিবুক, চোখে মুখে সর্বদা একটা তীব্রতা। অমন চেঁচিয়ে পড়াতে দেখিনি আর

কাউকে। আমাদের ইংরেজী পড়াতেন রহমান আজিজ সাহেব। ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত তিনি ইংরেজীর শিক্ষক।

দু-তিন মাসের মধ্যে দেখা গেল স্কুলে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। দূর দূর গ্রাম থেকে তারা গণেশপুর হাই স্কুলে ভর্ত্তি হল। কেউ কেউ ছোট ডিঙ্গি নৌকা করে আসত। কয়েকজনের জন্য তৈরী হল স্কুলের পিছনে মুসলমান ছাত্র হস্টেল। এ সব ছাত্ররা হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে দরকার না হলে কথা বলত না। আমার ক্লাসেও একজন এসে বসতে লাগল। লেখাপড়ায় তার একেবারই মন ছিল না। নেহাৎ ক্লাসে আসতে হবে তাই আসা। কিন্তু তার দুষ্টবুদ্ধি বেশ প্রখর ছিল। আবদুল খালেক ও আমার মধ্যে বন্ধুত্ব সে সহ্য করতে পারতো না।

আবদুলই বলল কথাটা আমাকে।

—"জানিস, ঐ যে মহম্মদ আক্রাম, যে সামনের বেঞ্চে বসে, আর ঘুমোয়, ওর একদম ইচ্ছে নেই আমি তোর সঙ্গে মিশি।"

আমি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলাম, "কেন ?"

আবদুল বলেছিল, "ও বলে হিন্দু মুসলমানে বন্ধুত্ব হতে পারে না, হওয়া উচিৎ নয়।"

—"কিন্তু আমরা তো বন্ধু।"

—"ও চায়না আমরা বন্ধু থাকি। বলে আমি যদি তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখি, ওরা মারবে আমাকে।"

—"ওরা ?"

—"দেখছিস না কত মুসলমান ছাত্র হঠাৎ স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে। এরা সব মুসলীম লীগের লোক। এদের নিয়ে এসেছেন আজিজ সাহাব। আজিজ সাহাবকে আনিয়েছেন ছোট চৌধুরী সাহাব। তিনি এ এলাকায় মুসলীম লীগ তৈরী করছেন।

আমি খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। আমার জন্যে আবদুল ওদের হাতে প্রহৃত হতে পারে এই সম্ভাবনাটা আমাকে ভীষণ কাবু করে দিল।

বললাম, "তুই তাহলে আমার সঙ্গে মিশিস না।"

আবদুল চুপ করে রইল।

তারপর বলল, "আমাদের এতদিনের বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যাবে? দেখি কি করে ওরা! এক্ষুণি আমি তোকে ছাড়ছি না।"

সারা বছর স্কুলে একটা উৎসব হোত ছাত্রদের উদ্যোগে। সরস্বতী পূজা। মুসলমান জমিদাররা কোনোদিন আপত্তি করেনি। স্কুলের পিছনে একটা ছোট ঘর ছিল। টিনের চাল। টিনের দেওয়াল ও মাটির মেঝে। বিশেষ একটা ব্যবহার হোত না। সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, ঘাস সবুজ। সরস্বতী পূজো হোত ঐ ঘরে। কুমোরপাড়া গণেশপুরের গায়েই, সেখান থেকে ছাত্ররা মূর্ত্তি নিয়ে আসত। স্কুলেরই কোনো না কোনো ব্রাহ্মণ শিক্ষক পূজা করতেন। টাকা তোলা হোত ছাত্রদের কাছ থেকে। পূজার দিন রাত্রে ভোগ হোত। একশ'র বেশী ছাত্ররা খেত, ভাইবোনদের সঙ্গে আনা নিষিদ্ধ ছিল না। বিকেলে কবিতা প্রতিযোগিতা হোত, কোনো কোনো বছর ছেলেরা নাটক করত। জমিদারদের আদেশ ছিল পূজার পরদিন ঘর ও সংলগ্ন এলাকাকে পুরো সাফ করে দিতে হবে। এ কাজে ছাত্ররা কোনো ত্রুটি রাখেনি। সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন করা হোত না। কোন না কোন ছাত্র তা নিজের বাড়ী নিয়ে যেত। পূজার দায়িত্ব থাকতো ক্লাস নাইনের ছাত্রদের উপর। একখানা সরস্বতী প্রতিমা আমাদের ঘরেও স্থান পেয়েছিল।

রহমান আজিজ সাহেব ঘোষণা করলেন স্কুলের মুসলমান ছাত্ররা ঈদ উৎসব করবে। রমজানের পুরো একমাস মুসলমান দিনে আহার করে না। মাস শেষ হলে ঈদের চাঁদ আকাশে দেখার পরে ঘোষিত হয় উৎসবের দিন ও সময়।

সরস্বতী পূজায় স্কুলের সব ছাত্র নিমন্ত্রিত হোত। ঈদের উৎসবেও সবাইকে নিমন্ত্রিত করা হল। উৎসবের প্রারম্ভে আজিজ সাহেব এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। তাতে কংগ্রেস ও তার নেতাদের তীব্র নিন্দা করা হল।

মুসলমানদের 'জাতীয় দাবী' জোরের সঙ্গে হল উচ্চারিত।

তখনও মুসলমান লীগ 'পাকিস্থান তার একমাত্র লক্ষ্য' এই সংকল্প ঘোষণা করেনি। সারা দেশে ১৯৩৫ সালের 'গভর্ণমেণ্ট অব, ইণ্ডিয়া এ্যাকট' অনুসারে প্রাদেশিক নির্বাচনের কথাবার্তা চলছে। বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুক হক। তিনি তখনও মুসলমান লীগে সামিল হননি। লীগের নেতা নাজিমুদ্দিন ঢাকার নবাব বংশের প্রমুখ রাজনৈতিক চরিত্র। রহমান সাহেব মুসলমান ছাত্রদের বললেন, সমবেত শক্তিতে তাদের রক্ষা করতে হবে নিজেদের স্বার্থ, মনে রাখতে হবে মুসলমান স্বার্থ হিন্দুদের হাতে নিরাপদ তো নয়ই, বরং বিপন্ন। সন্ত্রাসবাদ ইংরেজদের ভীত করে তুলছে, তারা কংগ্রেসের সঙ্গে পরামর্শ করতে এগোচ্ছে। মুসলমানদের সন্ত্রাসবাদ থেকে দূরে থাকতেই হবে, ইংরেজদের পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে কংগ্রেস ব্রিটিশ

কম্প্রমাইজ তারা সহ্য করবে না। "প্রয়োজন হলে আমাদের আল্লাহ, আকবর" ধ্বনি তুলে সংগ্রামে নামতে হবে……'

সভার সভাপতি আসনে উপবিষ্ট ছিলেন জমিদার বাড়ীর ছোট চৌধুরী সাহেব। বেঁটে মোটা, ফর্সা, টাক-মাথা, চশমা পরা, চোখ টেরা।

হেড মাষ্টার মশাই থেকে সব শিক্ষক ও অনেক হিন্দু ছাত্র গণেশপুর হাইস্কুলের প্রথম ঈদ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। 'ঈদ মোবারক' মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বে ও সমত্বের ধ্বনি, তাতে সব মানুষের মঙ্গল কামনা। ছোট চৌধুরী সাহেব বক্তৃতা করলেন না। সভার শেষ হেড মাষ্টার মশাই ও অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। করলেন আজিজ সাহেবও, তাঁর মুখে কিন্তু হাসি-আনন্দ অনুপস্থিত। আবদুল ও আমি দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ হলাম।

॥ সাত ॥

এই সব গুরুগম্ভীর অশনি-সংকেত ঘটনাই শুধু গণেশপুরের চালচিত্র তৈরী ক'রে নি আমার তের বছর বয়সে। আমাদের গ্রামীন জীবনে ছোটখাটো কৌতুক, কোমলতা ও ব্যথা বেদনার ক্ষুদে নাটক ঘটে যেত প্রায়ই। মানুষ মারা যেত, তার আপনজনদের কান্নার রোল ভেসে ভেসে বেড়াত বাতাসে। নতুন শিশুর জন্ম হোত, মৃত্যুর শূণ্যতা পূর্ণ করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। বিয়ে হোত সারা বছর ধরে, শুধু তিনটে মাস বাদ দিয়ে: চৈত্র, ভাদ্র ও পৌষ। বর্ষায় গ্রাম প্লাবিত হ'য়ে যেত। পদ্মা হঠাৎ যৌবনে উচ্ছল, তার প্রসারিত বহু তরঙ্গবাহুতে আতঙ্কময় আলিঙ্গনের আহ্বান। প্রচুর ইলিশমাছ ধরা পড়ত জেলেদের জালে। এক একটা বড় মাছ বিক্রী হোত তিন-চার পয়সায়। দু-একবার বিনে পয়সায় প্রজা জেলেরা মাছ দিয়ে যেত আমাদের। কালবৈশাখী ও আশ্বিনের ঝড়ে অনেক বৃক্ষ উৎপাটিত হত, অনেক ঘরের চালের টিন উড়ে গিয়ে অন্য বাড়ীর জমিতে পড়ত। কলেরায়, বসন্তে মরত মানুষ দলে-দলে, দশে-বিশে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয় ছিল বহু মানুষের নিত্য সঙ্গী। স্কুল পাশ করা ডাক্তার মহেন্দ্র শীল ও কবিরাজ গগন রায়ের ডিস্পেন-সারীতে রোগী জমত। ছেলেমেয়েরা খেলা করত রাস্তায়, মাঠে, বাগানে, নদীতীরে। বাড়ীতে বাড়ীতে পালাকীর্তন হোত। নিমাই সন্ন্যাস, নৌকাবিলাস, এ দুটোই আমার বিশেষ করে মনে আছে। আমার গলা ভাল ছিল, আমি নিজেই বাড়ীর সমবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিমাই সন্ন্যাস পালা গাইতাম। তাতে আমাদের বাড়ীর বিভিন্ন শরিকদের বাইরে, আর কাউকে ডাকা হোত না। মা আমাকে একটা গৈরিক কাপড়ের পাঞ্জাবী তৈরী করে দিয়েছিলেন গ্রামের দর্জির হাতে। যে পুরোহিত মাসে চার টাকা ও প্রতিদিনের নৈবিদ্য প্রণামী পেয়ে প্রতিদিন দশ মিনিট নারায়ণ পূজা করতে আসতেন, তিনি আমাকে তার একখানা পুরান ও কিছুটা ছেঁড়া নামাবলী দান করেছিলেন। গৈরিক পাঞ্জাবী আর নামাবলীতে দেহ আবৃত করে আমি নিমাই সন্ন্যাস গাইতাম। তবলা তো ছিল না, জ্যেঠা মশাইয়ের ঘরে ছিল একটা অনেক পুরোনো খোল, সেটাকে সারিয়ে নিজের হাতে নিজেই বাজাতাম। করতাল বাজাত আমার সমবয়সী স্বরাজ, যে পরিণত বয়সে ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ পদ

থেকে অবসর নিয়ে এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে ? নিমাই যখন সন্ন্যাস নেবার জন্ম গৃহত্যাগ করছেন, নিদ্রিত বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলছেন, "মায়ের কাছে থেকো, মা বলিয়া ডেকো, তাঁকে মা বলিবার কেউ নেই গো", তখন দুচোখ থেকে জল নেমে এসে আমার গাল ভিজিয়ে দিত, শ্রোতাদের মধ্যে অনেকের চাপা কান্না শুনতে পেতাম। বাড়ীর বাইরে আমার নিমাই সন্ন্যাস দল কখনও কীর্তন করেনি।

এক গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবা বাড়ীতে এসেছেন। তাঁর দ্বিপ্রহর কাটাবার দুটো অভ্যাস ছিল। কখনও কখনও মধ্যাহ্ন আহারের পরে একখানা পাটি ও একটা বালিশ নিয়ে দুর্গামণ্ডপের বাইরে চলে যেতেন, জামরুল গাছের নীচে পাটি পেতে বালিশে মাথা রেখে তাঁর দিবানিদ্রা হোত। জামরুল গাছে তখন অনেক ফল, মৌমাছি ভনভন করত পাকা জামরুলের চারপাশে, কিছু জামরুল ছড়িয়ে থাকতো গাছের নীচে, পথের উপর। মৌমাছিদের পরোয়া করতেন না বাবা। খুব কাছাকাছি ছিল কালীপূজার ঘর। তিনি কালী-সাধক ছিলেন, আমার মনে হোত কালীপূজার ঘরের নিকটস্থ তাঁকে বেশি আকর্ষণ করত জামরুল গাছের ছায়ার চেয়ে।

আবার অনেক সময় তিনি 'দক্ষিণের ঘরে' পিতামহ রজনীকান্তের খাটে দিবানিদ্রা দিতেন। আমাকে মাটির ওপর মাদুর বা পাটি পেতে তাঁর দেওয়া টাস্ক করতে হোত। অঙ্ক এবং ইংরেজী এই দুটোই করিয়ে নিতেন আমাকে দিয়ে, অঙ্কে আমি আগাগোড়া ফাঁকি দিতাম। কিন্তু খুলনা থেকে নিয়ে আসা ভারী এক একটা ইংরেজী বই পড়ে প্রত্যেকটা আলাদা শব্দকে খাতায় লিখে আশুতোষ চৌধুরীর ইংরেজী-বাংলা অভিধান ঘেটে তাদের অর্থ লিখতে হোত। বানান লিখতে হোত। এ পরিশ্রমটা আমার একদমই মনঃপুত হোতনা। তাই ইংরেজী শব্দের স্টক আমার বেশ বেড়ে গেলেও বাগানে আমি দুর্বল হয়ে রইলাম অনেক বছর। বাবা একবার গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেলেই আমি গুটি গুটি পালিয়ে গিয়ে মা'র (এবং আমাদের) বিছানায় দক্ষিণের জানলার পাশে বসে বাংলা উপন্যাস পড়তাম। এ সময়ে আমি বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত চালর্স ডিকেন্সের উপন্যাসগুলির বাংলা অনুবাদ পড়ে নিয়েছি, সেক্সপীয়রের দু-চার খানা নাটকের বঙ্গানুবাদও আমার পঠিত। ডেভিড কপারফিল্ড ছিল আমার প্রিয়তম ইংরেজী উপন্যাস। বাংলায় পড়া। ডেভিড ও আগনেসের প্রেম কাহিনী অহরহ একটি ক্ষুদ্র দীপ শিখার মত আমার অন্তরে জ্বলতো। উড়িয়া হিপ ছিল আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য। মিঃ মিকাবার সবচেয়ে মজার মানুষ। উপন্যাসের শেষ দিকে ডেভিড ও আগনেসের মধ্যে মর্মভেদী কথাবার্তার মধ্যে ডেভিডের ব্যাকুল বাক্য—

"আগনেস, আমি তোমাকে ভালোবেসে দূরে চলে গিয়েছিলাম। তোমাকে ভালোবেসে দূরে থেকেছি। তোমাকে ভালোবেসে ঘরে ফিরে এসেছি"—পড়বার সময় আমি অশ্রু ধারণ করতে পারতাম না। বার বার পড়ে, বার বার কাঁদতে ভাল লাগতো আমার। এই কথাবার্তার শেষ বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছিল আগনেসের মুখে যা তার সারা যৌবন বছরগুলিতে গোপন থেকেছে। যে কথা সে কাউকে কোনোদিনও বলতে পারে নি, বলতে চায় নি।

আগনেস বলছে ডেভিডকে, "আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েছি তোমার কথা থেকে। আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু একটা কথা তোমাকে শুনতে হবে।

ডেভিড: "কি কথা, প্রিয়তমে?"

আগনেস তার কোমল হাত দুখানা ডেভিডের কাঁধের উপর রাখলো। গভীর গাম্ভীর্যের সঙ্গে চোখ রাখলো তার চোখে।

—"তুমি কি এখনও জানো না সে কথাটা?"

—"আমার আন্দাজ করতে ভয় হচ্ছে, তোমার মুখে শুনতে দাও।"

—"আমি তোমাকে সারা জীবন ধরে ভালোবেসে এসেছি।"

আমার এখনও ভাবতে অবাক লাগে ১৮৬৭-৭০ সালে লেখা চার্লস ডিকেন্সের এক অক্ষয় উপন্যাস ১৯৩৫ সালে বঙ্গভূমির সুদূর এক গ্রামে অন্য ভাষায় পাঠিত হয়েও একটি তের বছরের ছেলের বুকে তুফান তুলতো। চোখের জলে গাল ভাসিয়ে দিত। পুত্র, তোমাদের কলেজ জীবনে চার্লস ডিকেন্স পাঠ্য লেখক। আমার বিশ্বাস সৃজনশীল, কলেজের পাঠ্যপুস্তক হ'য়ে গেলে, গবেষণার ক্ষেত্র হলে, তার সাধারণ আবেদন নিস্তেজ হতে থাকে। ক'জন এখন আর ডিকেন্স পড়ে, বলো? ক'জন পড়ে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, কেবলমাত্র রসাস্বাদন ও জীবনের বিরাটত্বর মহানতর অনুভূতি অভিজ্ঞানের সন্ধানে?

বাবা একদিন বাড়ীর সবাইকে জানিয়ে দিলেন অমর কাকা সন্ধ্যেবেলা আসবেন তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত গ্রামোফোন এবং রেকর্ড নিয়ে আমাদের সবাইকে তাক ক'রে দিতে। আমি তো বলেই রেখেছি, উপন্যাস, গান বাবার খাদ্য ছিল না, তার মধ্যে ধর্মীয় অথবা উদ্বোধক চেতনা জাগরণের উপাদান না থাকলে। কিন্তু তাঁর অমরকাকা নিজে থেকেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁকে সাগ্রহে গ্রহণ করতে হয়েছিলো।

সন্ধ্যের আগেই শেষ অপরাহ্নে অমরদাদু তাঁর ভৃত্যের মাথায় রেকর্ডের বাক্স চাপিয়ে উপস্থিত হলেন আমাদের বাড়ীতে। রজনীকান্তের ভক্তপোষকে আমি গানের

আসরে পরিণত করে রেখেছিলাম একখানা সতরঞ্চি পেতে। অমরদাদুকে বাবা তার উপর বসালেন। আমরা দশ-পনের জন বসলাম মাটির ওপর। দু-চার জন রইল দাঁড়িয়ে।

দক্ষিণের জানলা দিয়ে হালকা হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। বর্ষা শেষ হয়ে এসেছে, অনেক সবুজ পাতার গন্ধও মিশে গেছে ফুলের গন্ধের সঙ্গে। ভিজে মাটির গন্ধ পেয়ে, আমাদের সবাইকে সমবেত হতে দেখে ঘরের আস্তরে তক্ষক-গুলি ইতস্তত ছুটে বেড়াচ্ছে, গলা থেকে বিশ্রি আওয়াজ ছেড়ে। বাড়ীর আশ্রিত কুকুর কিছুক্ষণ ঘেউ ঘেউ ক'রে থেমে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘরের বাইরে ঘুমোচ্ছে। প্রকাণ্ড চোঙওয়ালা এইচ. এম. ভি. গ্রামোফোন। হিজ মাষ্টার ভয়েসে গণেশপুর গ্রামে তার প্রথম পদার্পণ। অমরদাদুর ছেলে কলকাতায় চাকরী করেন। তিনি কিনে এনেছেন বাবা মা ভাই বোন কাকা কাকী পিসি পিসো গ্রামবাসীদের মনোরঞ্জনের জন্য।

ভৃত্য গ্রামোফোনটা তক্তপোষের উপর রাখলো। কাঠের বাক্সে সেটা রক্ষিত ছিল, বাক্স খুলে তাকে বার করা হল। চোঙাটা হল লাগানো। অমরদাদু সযত্নে একটা পরিষ্কার রুমাল দিয়ে মুছলেন। তারপর রেকর্ড বাছাই হল, তাও রুমালে মোছা হল। হ্যাণ্ডেল দিয়ে পাম্প করলেন গ্রামোফোনকে অমরদাদু। তারপর রেকর্ড বসালেন, গ্রামোফোনের ছুঁচ রেকর্ড স্পর্শ করলো। আমরা প্রথম 'কলের গান' শুনতে পেলাম। কৃষ্ণচন্দ্র দে, রেণুকা রায়, পঙ্কজ মল্লিক এই তিন গায়কের নামই মনে আছে। একটা গান ছিল, অমরদাদুর ভাষায়, "পোয়েট লরিয়েট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের" রচিত: "কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই। দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।"

॥ আট ॥

যতীনবাবু খুন হবার পরেই ঝড় উঠল গণেশপুর গ্রামে। ঝড় তো নয়, প্রভঞ্জন। একপাল বন্দুকধারী পুলিশ পাঁচখানা গ্রাম ছেয়ে ফেলেছে। যোল সতের বছর বয়সের ছেলেরা যে-সব বাড়ীতে, সেখানে পুলিশ ঢুকে খানাতল্লাসী করল। পনেরটি তরুণ ও যুবককে হাতবেড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে গেল। তার মধ্যে গণেশপুর হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর চারটি ছাত্র। গণেশপুরের বাড়ী থেকে আরও দুজন যুবক।

পাবলিক লাইব্রেরী বন্ধ করে দেওয়া হল। ব্যায়ামাগার উঠে গেল।

পুলিশ অনেক খুঁজেও অনন্তদাকে পেল না। আমাদের বাড়ী পর্যন্ত খুঁজতে এসে-ছিল। আমাদের বাড়ী থেকে চারটে ছেলে স্কুলে যেত। আমি ছাড়া বাকী তিনটি 'পুবের ঘরে' জ্ঞাতি ভাই। সবচেয়ে বড়টি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি। আমি তো মাত্র অষ্টম শ্রেণীর বালক।

তাই পুলিশ যখন আবার আমাদের বাড়ীতে ঢুকলো আমরা সবাই চকিত ও ভীত হলাম।

রণজিৎ জ্যেঠামশাই শনিবার রাত্রে বাড়ী ফিরতেন, সোমবার প্রত্যুষে ভোজেশ্বর চলে যেতেন।

তিনি বাড়ীতে নেই। 'উত্তরের ঘরে'র জ্যেঠামশাই বাইরের পুকুরে ছিপ ফেলে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মাছের জন্য ব্যর্থ অপেক্ষা করছিলেন। তিনিই দুটো পুলিশকে নিয়ে এলেন বাড়ীতে। একজনের হাতে বন্দুক, অন্যজনের হাতে লাঠি।

পুলিশ জানতে চাইলো, এ বাড়ীতে বিজন সেনগুপ্ত বলে কেউ আছে কিনা।

জ্যেঠামশাই বললেন, "না"।

—"বিজন সেনগুপ্ত এ বাড়ীর লোক নয় ?"

জ্যেঠামশাই বললেন, হ্যাঁ, এ বাড়ীর লোক, কিন্তু তার বাস কলকাতায়, সে গ্রামের বাড়ীতে আসে না।

—"বিজন সেনগুপ্ত তো টেররিস্ট !"

জ্যেঠামশাই বললেন, "বিজন আমার খুড়তুতো ভাই। সে কয়েক বছর রাজবন্দী

ছিল। এখন ছাড়া পেয়ে কলকাতায় আছে শুনতে পাই। পিতার মৃত্যুর পর সে আর গ্রামে ফিরে আসে নি। তার খবর আমাদের জানা নেই।"

—"অমলেন্দু দাসগুপ্ত কি এ বাড়ীর কেউ হয়?"

—"অমলেন্দু এ বাড়ীর জামাই। বিজনের ভগ্নিপতি। মাদারীপুরের লোক।"

—"অমলেন্দু দাসগুপ্ত তো ভীষণ টেররিস্ট!"

—"সেও রাজবন্দী ছিল। এখনও হয়তো আছে। দেউলিতে। আমরা তার কোনো খবর রাখি না।"

—"এটা তো রজনীকান্তের বাড়ী?"

—"তিনি আমার স্বর্গত জ্যেঠামশাই।"

—"তাঁর পরিবারের কে কে আছে এই বাড়ীতে?"

—"বড় ছেলে দুর্জয় খুলনাতে স্কুলমাষ্টার। ছোট ছেলে সূর্যকান্ত পাঞ্জাবে অধ্যাপক। দুর্জয় সিংহের পরিবার এ বাড়ীতে বাস করে। তার স্ত্রী, দুটি ছেলে, একটি মেয়ে।

জ্যেঠামশাই ভুলে গেছেন আমার আর একটি ভাই জন্মেছে বছর খানেক আগে। তার নাম ভানু।

—"ছেলের বয়স কত? কোন ক্লাসে পড়ে?

—"ছেলের বয়স তের, পড়ে অষ্টম শ্রেণীতে।"

—"তাকে ডেকে দিন।"

আমাকে নিয়ে এসে পুলিশের সামনে দাঁড় করালেন জ্যেঠামশাই।

—"তুমি লাইব্রেরীতে যেতে প্রতি সপ্তাহে, তাই না?" লাঠিধারী পুলিশ প্রশ্ন করলো আমাকে।

—"হ্যা।"

—"কেন?"

—"বই আনতে।"

—"কি বই?"

—"বাংলা বই।"

—"কয়েকটার নাম করতে পারো?"

—"আমি একসঙ্গে অনেকগুলো উপন্যাসের নাম বলে দিলাম। পুলিশ দুজনই কেমন ভড়কে গেল। এত লেখক ও বইয়ের নাম এর আগে একসঙ্গে তারা কোনদিনও শোনেনি।

—"খুব পড়ুয়া ছেলে তুমি ?"

আমি চুপ করে রইলাম।

—"ব্যায়াম করতে যেতে ?"

—"না।"

—"ছোরা খেলা, বা লাঠি খেলা ?"

—"না।"

—"কেন ?"

—"আমার খেলতে ভালো লাগে না।"

—"তুমি অনন্তদাকে তো চিনতে ?"

—"এক দুবার দেখেছি।"

—"তোমার সঙ্গে কথা বলতেন না ?"

—"আমি তো ছোট্ট ছেলে।"

—"এ বাড়ীতে এসেছে কখন ?"

—"না।"

বন্দুকধারী পুলিশ বলে উঠল, "অনন্ত তোমাদের ঘরে লুকিয়ে রয়েছে, আমরা জানতে পেরেছি।"

কথাগুলো শুনে আমি হেসে ফেললাম।

পুলিশ দুজন একেবারেই তৈরী ছিল না আমাকে হাসতে দেখতে।

বললাম, "আসুন না, ঘরে খুঁজে দেখুন, অনন্তদা আমাদের বাড়ী চেনেনই না।"

এবার পুলিশ দুজন হেসে ফেলল। অবাক হবার পালা আমাদের। আমাদের জানা ছিল না পুলিশও হাসে।

বন্দুকধারী পুলিশ বলল, "খুব স্মার্ট ছেলে তুমি ! স্কুলের হেড মাষ্টার আমাদের বলেছেন, তুমি ইনটার স্কুল বিতর্কে প্রথম হয়ে সোনার মেডেল পেয়েছ। ইংরেজ সরকারের দারুণ প্রশংসা করেছ।"

আমি বললাম, "মেডেল দেবার কথা ছিল। দেয় নি।"

পনেরটি যুবককে বন্দী করে হাজতে রেখে দিল পুলিশ একমাস। তারপর একে একে পাঁচজনকে ছেড়ে দিল। এদের সবাইকে মহকুমা শহর মাদারীপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ছাড়া-পাওয়া পাঁচজনের মধ্যে একজন সত্যদা, সত্য চক্রবর্তী, আমাদের

স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। তার পিতা মাদারীপুরে উকিল। তাকে স্কুলে পড়তে দেওয়া হবে কি না এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল মাষ্টারমশাইদের মধ্যে। কয়েকজন শিক্ষক একত্র হয়ে বলেছিলেন, রাজনৈতিক অপরাধের সন্দেহে ধৃত ছাত্রকে স্কুলে রাখলে কর্তৃপক্ষ বিরূপ হবেন, জমিদার বাড়ীর চৌধুরীরা আপত্তি করতে পারেন। আমরা শুনেছিলাম ছোট চৌধুরী সাহেব আপত্তি তুলেও ছিলেন। কিন্তু নতুন হেড মাষ্টার মশাই, যিনি মাত্র বছর খানেক ২৪ পরগণার একটি স্কুল থেকে এসেছেন আমাদের স্কুলে, প্রবল আপত্তি জানালেন। নির্দোষ বিবেচিত হ'য়ে পুলিশ যাকে ছেড়ে দিয়েছে, আদালতের হুকুমে নয়, স্কুল তাকে দোষী করতে পারবে না। তিনি নাকি ছোট চৌধুরী সাহেবকে বলেছিলেন সত্য চক্রবর্তীকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে তিনি পদত্যাগ করবেন। আরও বলেছিলেন, দেশপ্রেম, দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম কোনো গর্হিত কাজ নয়, যদিও সন্ত্রাসবাদ নিশ্চয়ই অত্যন্ত গর্হিত।

আমাদের সত্যদা, অতএব স্কুলেই রয়ে গেল। তার মুখে শোনা গেল পুলিশ পনেরটি ধৃত যুবককে বিস্তর মারধোর করেছে অপরাধ স্বীকারের জন্য। সে নিজেও প্রহৃত হয়েছে, পিঠে তার প্রহারের দাগ রয়েছে। আদালতে কেস তোলবার আগে পুলিশ রাজসাক্ষী পাওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে রয়েছে।

এক বছরের মধ্যে গণেশপুর 'ছাত্র-যুবকদের মামলা' (সংবাদপত্রের ভাষায়) আদালতে উঠল। আদালত বসল জমিদার চৌধুরী বাড়ীর বিশাল অভ্যর্থনা কক্ষে। মাদারীপুরের মহকুমা শাসক বিচারক। তিনি একটা চকচকে-ঝকঝকে মোটর লঞ্চে গণেশপুরের নদীতীরে দু'সপ্তাহের নিবাস নিলেন। জমিদার বাড়ীর আতিথ্য গ্রহণ করলেন না, কিন্তু তাঁদের পাঠান প্রাতঃরাশ থেকে সান্ধ্য ভোজনের আহার্যে তাঁর আপত্তি হল না।

যতদূর মনে পড়ছে এস-ডি-ও মহাশয়ের নাম ছিল সুশীল কুমার চ্যাটার্জী। আই-সি-এস, খুব অল্প বয়স, পঁয়ত্রিশের বেশী নয়, ছিমছাম সুপুরুষ, 'বোট' থেকে নেমে ঘোড়ায় চেপে কোর্টে আসতেন প্রতিদিন সকালে, চারজন বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার রক্ষী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে। ঠিক সাড়ে দশটায় আমাদের স্কুলের মাঠ পেরিয়ে জমিদার বাড়ীর সদর দরজায় প্রবেশ করতেন। আমরা ছাত্রেরা, আমাদের শিক্ষকরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে লাইন ক'রে দাঁড়িয়ে যেতেন এই অভিনব দৃশ্য দেখার জন্য। একমাত্র হেডমাষ্টার মশাই নিজের অফিস ঘরে বসে কাজ ক'রে যেতেন।

গণেশপুরে 'ছাত্র ও যুবকদের' বিচার সাড়া বঙ্গে আলোড়ন তুলেছিল। বন্দীদের

পক্ষে দশ বারোজন উকিল, দুজন এ্যাডভোকেট, এঁরা সবাই হয় মাদারীপুর, নয় জিলা শহর ফরিদপুর, নয় বঙ্গের রাজধানী কলকাতা, থেকে এসেছেন। ভিজামানিক, মধুপুর, চাকদহ এই তিনখানা পাশাপাশি গ্রামের বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ বাড়ীতে তাঁদের আবাসন তৈরী হয়েছে। এঁরা টাকা পয়সা না নিয়েই বন্দীদের জন্যে লড়ছেন। যাতায়াতের খরচও কলকাতার বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস যোগান দিচ্ছেন। দুজন এ্যাড-ভোকেট, যদিও তাঁদের নাম আমি একদম ভুলে গেছি, ছিলেন আইনজীবী হিসেবে খ্যাতিসম্পন্ন।

সরকারের পক্ষে জিলা ও মহকুমার প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটার ও তাঁদের সহকারীবৃন্দ। গুজব শোনা গেল কলকাতা থেকে স্বয়ং এ্যাডভোকেট জেনারেলও একদিনের জন্য আসবেন, কিন্তু এলেন না।

কোর্টে যেতে কোনো বাধা ছিল না। শুধু ৫০ জনের বেশী দর্শককে ঢুকতে দেওয়া হত না। আসামীদের পিতা, কাকা, জ্যেঠা ইত্যাদির প্রথম প্রবেশ, অধিকার। আমরা ছাত্রেরা প্রতিদিন পাঁচজন যাবার অনুমতি পেয়েছিলাম। কিন্তু দেখা গেল কোর্টে যাবার উৎসাহ বেশি ছাত্রের নেই।

তাই আমি দুদিন কোর্টে বিচার দেখার সুযোগ পেয়ে গেলাম। হেড মাষ্টার মশাই এ সুযোগ ক'রে দিলেন। শুধু বললেন, আমাকে এসে বলবে কি হচ্ছে-না-হচ্ছে। আমি যা বলতাম, তা থেকে তিনি কতটুকু আদালতের আবহাওয়া ও মতি-গতি বুঝতে পারতেন আমার জানাবার উপায় ছিল না। আমি নিজেই বুঝতাম খুব সামান্য। পুলিশ অনেক সাক্ষী জোগার করেছিল। তাদের মধ্যে ছিল গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক, আরো অনেক বেশি 'ছোটলোক'। মাদারীপুর, কলকাতা, বরিশাল থেকে নিয়ে আসা কয়েকজন পুরুষ, দশটি নারী, যাদের বলা হত বেশ্যা, যে শব্দটার সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বেশ্যা মানে কি, শুনেছিলাম, "ওরা খারাপ মেয়ে মানুষ।"

দুজন রাজসাক্ষীও পুলিশ তৈরী করতে পেরেছিল। তাদের মধ্যে একজন গণেশ-পুরের যুবক হেরম্ব, ডাক্তার শীলের ছেলে, যার মাত্র দু'বছর বিয়ে হয়েছিল, প্রথম বন্দীদের মধ্যে যে ছিল একজন।

সরকার পক্ষের সাক্ষীরা বলেছিল আসামীরা অনন্তদার মন্ত্র শিষ্য, তারা রোজ ছোড়া, তলোয়ার, লাঠি খেলা শিখত। তাদের ব্রত ইংরেজ ও তাদের বশংবদ ভারতীয় রাজপুরুষদের হত্যা করা, গোয়েন্দাদের খুন করা বা পঙ্গু ক'রে দেওয়া।

তারা বাড়ী বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ করত। বলত সব টাকা সন্ত্রাসবাদ সংগ্রামের জন্যে। তারা অনুশীলন করত পিস্তল খেলা, পিস্তল চালানো। একথা তারা নিজেরাই সগর্বে ঘোষণা করত। অনন্ত ছিল অনুশীলন দলের নেতা। জঙ্গলে দেখা যেত আসামীদের সে গরিলা যুদ্ধ শেখাচ্ছে, আসামীরা বলত তারা ধনীদের বাড়িতে হানা দিয়ে টাকা পয়সা ধনদৌলত লুঠ করবে। দুজন ব্যক্তি সাক্ষী দিলেন আসামীদের তিন-চারজন তাদের বাড়িতে ডাকাতি করেছে। সবাইকে পিস্তল দেখিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠ ক'রে বড় গলায় ঘোষণা করেছে, এ ধন আমরা নিচ্ছি ইংরেজদের মারবার জন্য, আপনারা পুলিশ ডাকলে আপনাদেরও খুন করা হবে। দু-তিন বছর ধরে আসামীদের ও তাদের অনুগতদের অত্যাচারে গ্রামের বিত্তবান পরিবারগুলোকে সর্বদা আতঙ্কের সঙ্গে বাস করতে হয়েছে······

কয়েকটা কোর্ট দৃশ্য এখনও আমার মনে আছে।

হেড মাষ্টার মশাই-এর সাক্ষ্যটা সবচেয়ে বেশি।

তাঁকে সাক্ষীর চেয়ারে বসিয়েছেন জেলার প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটার।

—"আপনি কবে থেকে গণেশপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক?"

—"এক বছর ন মাস তের দিন।"

—"এর আগে কোথায় শিক্ষকতা করেছেন?"

—"চব্বিশ পরগণার—গ্রামের হাই স্কুলে।"

—"হেড মাষ্টার ছিলেন?"

—"না। এ্যাসিস্টেণ্ট হেড মাষ্টার।"

—"গণেশপুর, ডিঙ্গামানিক গ্রাম আপনার ভাল ক'রে জানা আছে?"

—"মোটামুটি জানা আছে।"

—"আপনি গ্রামের ভদ্রলোকের বাড়ি যান? বন্ধু পরিবার তৈরী হয়েছে আপনার?"

—"বিশেষ নয়।"

—"গণেশপুর যে সন্ত্রাসবাদীদের একটা কেন্দ্র হয়ে গেছে এ খবর আপনি জানতেন?"

—"না।"

—"এ বিষয়ে আপনার কোনো সন্দেহ আছে?"

—"না, যা আমি জানি না তা নিয়ে নিশ্চিত হতে পারি কি করে!"

—"আপনার স্কুলের ছাত্ররা যে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে শিক্ষা পাচ্ছিল সেটা জানতেন ?"

—"এমন খবর আমি এখনও পাই নি।"

—"আসামীদের মধ্যে আপনার স্কুলের দশম শ্রেণীর তিনটে ছাত্র রয়েছে, নাম রমেশ বসু, ধনঞ্জয় রায়, আর সুভাষ মল্লিক, এদের আপনি কতটুকু জানেন ?"

—"স্কুলের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে যতটুকু জানা দরকার ও সম্ভব ততটুকু।"

—"আপনি এদের পড়ান ?"

—"দশম শ্রেণীতে আমি ইংরেজী পড়াই। সব ছাত্রকেই ইংরেজী পড়তে হয়।"

—"স্কুলে এদের আচার ব্যবহারে আপনি উগ্র রাজনৈতিক ব্যবহার নিশ্চয়ই পেয়েছেন।"

—"না, তা পাই নি।"

—"স্কুলে বাইরে এরা কি করতো না করতো আপনার জানার কথা নয় ?"

—"না। কোনো নালিশ আমি পাইনি এদের সম্বন্ধে।"

—"আপনাকে যা প্রশ্ন করা হয়েছে ঠিক তারই জবাব দেবেন, বাড়তি কিছু বলা আপনার পক্ষে অনুচিত হবে, বে-আইনীও।"

—"আপনার প্রশ্নের জবাব তো দিয়েছি !"

—"আমাদের কাছে খবর আছে আপনি নিজেই সন্ত্রাসবাদের সমর্থক। এ বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন ?"

—"খবর সত্যি নয়।"

—"আপনি সুভাষ বসুকে প্রশংসা ক'রে প্রবন্ধ লেখেন নি ?"

—"লিখেছি।"

—"তার মানে আপনি ইংরেজ সরকারের বিরোধী।"

আসামী পক্ষের উকিল প্রশ্নে আপত্তি জানালেন। এ প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আপত্তি অগ্রাহ্য করে হেড মাষ্টার মশাইকে প্রশ্নের জবাব দিতে আদেশ করলেন।

হেড মাষ্টার মশাই বললেন, "আমি সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর প্রশংসা করি।"

—"আপনি কি চান না ইংরেজ সরকার ভারত থেকে বিদায় নিক ? হ্যাঁ, কি না, জবাব দিন।"

—"হ্যাঁ।"

—"তাহলে নিশ্চয়ই যারা ইংরেজ শাসন খতম করবার জন্য সহিংস পথ নিয়েছে তাদের প্রতি আপনি সহানুভূতিশীল?"

—"এ ধরণের সিদ্ধান্ত ভুল। ইংরেজ শাসন দূর করবার অহিংস পথও আছে। আমি তারই সমর্থক।"

"সুভাষচন্দ্র বসু কি অহিংস পথের নেতা?"

—"আমি তার মধ্যে সহিংস কিছু দেখতে পাই নি।"

—"হেড মাষ্টার মশাই, আপনার স্কুলের ছাত্ররা সন্ত্রাসবাদী হয়ে গেছে, আপনি কি তারও খবর জানেন না। এতে কি প্রমাণ হয় না যে প্রধান শিক্ষক হিসেবে আপনি হয় ব্যর্থ নয়তো ছাত্রদের সন্ত্রাসবাদী হতে আপনি সক্রিয় অথবা পরোক্ষ উৎসাহ দিয়ে থাকেন?"

—"আমার বিশ্বাস গণেশপুর হাই স্কুলের কোনো ছাত্র সন্ত্রাসবাদী নয়।"

—পাবলিক প্রসিকিউটার চেঁচিয়ে উঠলেন, "আপনার বিশ্বাস ভুল। এ মামলায় তা প্রমাণিত হবে। আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।"

আসামীদের পক্ষ থেকে একজন উকিল হেড মাষ্টার মশাইকে প্রতি-জেরা করলেন।

—"চব্বিশ পরগণার—গ্রামের হাই স্কুলে আপনার বেশ সুনাম ছিল, তাই না?"

—"আমার তো তাই ধারণা।"

—"তাঁরা আপনার পদত্যাগ গ্রহণ করতে চান নি। তাই না?"

—"তাঁরা আমাকে রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন।"

—"আপনি হেড মাষ্টার পদের আকর্ষণেই কি শুধু গণেশপুর হাই স্কুলে চাকরী নিলেন?"

—"একটা কারণ ছিল তাই। অন্য কারণ ছিল আমি শহর থেকে দূরে প্রকৃত গ্রামে ছাত্রদের শিক্ষক হ'তে ইচ্ছুক ছিলাম।"

—"এ ইচ্ছার কারণ?"

—"কিছুটা আদর্শবাদ বলতে পারেন। তা ছাড়া শহর, শহরতলীর জীবন আমার ভাল লাগে না।"

—"হেড মাষ্টার মশাই, আপনার পিতা কি মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য ছিলেন?"

—"হ্যাঁ, গান্ধীজীর ওয়ার্ধা আশ্রমে তিনি বাস করতেন। ওখানকার স্কুলে পড়াতেন।"

—"পিতার প্রভাব আপনার ওপর প্রবল ছিল নাকি?"

—"ছিল। এখনও আছে। আমার জীবনে তাঁর চেয়ে শ্রদ্ধেয় আর কেউ নেই।"

—"তিনি কি আপনাকে জীবন যাপন বিষয়ে কোনো উপদেশ দিয়েছিলেন ওয়ার্ধায় চলে যাবার আগে?"

—"আমার পিতৃদেব আমাকে বলেছিলেন, শিক্ষকতার চেয়ে মহান জীবিকা নেই। যদি পারো গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা কোর।"

উকিল মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলেন, "আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।"

বিচারের ছ'মাস পরে হেড মাষ্টার মশাই স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন। অনেকে বলল, তিনি নিজেই স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন। আবার এও শোনা গেল জমিদার ছোট চৌধুরী সাহেব তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেছিলেন। তাঁর মতে আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টার আসলে উগ্র জাতীয়তাবাদী।

একদল স্ত্রীলোক সরকার পক্ষের সাক্ষী ছিল। এরা খড়িসার বাজার থেকে নিয়ে আসা বেশ্যা। এরা আদালতকে বলেছিল, আসামীরা নিয়মিত এদের কাছে যেত, মদ খেত, হল্লোর করতো, অনেক টাকা খরচ করত। সে সব টাকা, আসামীরা বলত, আসত ডাকাতি থেকে।

একটি বেশ্যার সাক্ষী মনে আছে।

ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটার, "আপনার নাম কি?"

ছোটখাটো মোটাসোটা পান-চিবানো অনেক গহনা-পরা স্ত্রীলোকটি বলেছিল 'জবা'।

—"কোথায় থাকেন?"

—"খড়িসার বাজারে।"

—"কাজ করেন?"

—"হ্যাঁ।"

—"কি কাজ করেন?"

—"বাবুদের সেবা করি।"

—"আসামীদের মধ্যে কাকে কাকে আপনি চেনেন?"

—"তিনজনকে।"

—"কি তাদের নাম ?"

—"পলাশ, তুফান, হিমালয়।"

—"এগুলি কি আসল নাম ?"

—"ও নামেই আমি এদের চিনি।"

—"এই তিনজনকে আপনি আসামীদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন ?"

—"পাচ্ছি।"

—"আদালতকে দেখিয়ে দিন কারা এই পলাশ, তুফান, হিমালয়।"

স্ত্রীলোকটি তিনজন আসামীকে দেখিয়ে দিল।

—"কি ক'রে এদের চেনেন আপনি ?"

—"এরা আমার কাছে আসত।"

—"কেন ?"

—"ফূর্তি করতে।"

—"মদ নিয়ে আসত ?"

—আসামী পক্ষের উকিল এ প্রশ্নে আপত্তি জানালেন। আদালতকে বললেন, "ইয়োর অনার, পাবলিক প্রসিকিউটর লীডিং কোশ্চেন" করছেন।

বিচারক তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে 'জবা'-কে প্রশ্নের উত্তর দিতে আদেশ দিলো।

জবা বলল, "নিয়েও আসত, বাজার থেকে কেনাও হত।"

—"আর কিছু আনত ?"

—"অনেক টাকা থাকত এদের কাছে।"

—"আর কিছু ?"

—"অন্তত দুদিন এদের কাছে পিস্তল ছিল।"

—"আপনি দেখেছিলেন ?"

—"হ্যাঁ, পিস্তলটা এরা আমার চোখের সামনে মাটিতে রেখেছিল।"

—"কি বলত এরা নিজেদের মধ্যে ? যা আপনি নিজে শুনতে পেতেন ?"

—"বলত, কটা বাড়িতে চুড়ি-ডাকাতি করে টাকা পেয়েছে।"

—"আর কিছু ?"

—"বলত নাশিলন দলের নেতারা এখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে সন্ত্রাসবাদী দল তৈরী করছে।"

—"নাশিলন বলতে কি আপনি অনুশীলন বোঝাচ্ছেন? সন্তারবাদী বলতে সন্ত্রাসবাদী!"

আসামী পক্ষের উকিলরা একসঙ্গে আপত্তি করে উঠলেন। একজন বললেন, "ইয়োর অনার, পাবলিক প্রসিকিউটার আসামীকে প্রকাশ্যে তালিম দিচ্ছেন।"

এবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আপত্তি মেনে নিলেন।

পাবলিক প্রসিকিউটার জেরা করলেন, "এই তিন আসামী প্রায়ই আপনার ঘরে যেত?"

—হ্যাঁ, সপ্তাহে একবার তো বটেই। মাঝে মাঝে দুবার।"

—"মদ্যপান করত?

—"করত।"

—"আপনাকেও মদ খেতে হত?"

—"হত।"

—"এরা আপনার সঙ্গে আর কি করত?"

—"সবকিছুই করত!"

—"তিনজনেই?"

—"তিনজনেই।"

—"একসঙ্গে, না পর পর?"

—"দুটোই।"

—"কত টাকা দিত আপনাকে?"

—কখনও পঞ্চাশ, কখনও ত্রিশ।"

—"আপনার সাধারণ প্রাপ্যের বেশি?"

—"প্রারপ্যো মানে কি?"

—"যা আপনি সাধারণত নেন খদ্দেরের থেকে তার চেয়ে বেশি?"

—"হ্যাঁ।"

—"আপনার কাছে আসামীরা কখনও কিছু গচ্ছিত রেখেছিল?"

—"দু'তিনবার রেখেছিল।"

—"কি?"

—"কাগজপত্র।"

পাবলিক প্রসিকিউটার কতগুলি ইস্তাহার পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে স্ত্রীলোকটির চোখের কাছে রেখে জানতে চাইলেন, "এগুলি ?"

—"হ্যাঁ।"

—"তুমি জান এগুলি কি ?"

—"ওরা বলেছিল এগুলি খুব গোপন দরকারী কাগজপত্র।"

—"তুমি পড়তে পার ?"

পাবলিক প্রসিকিউটার সহজেই 'আপনি' থেকে 'তুমি' তে নেমে এসেছিলেন সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে করতে।

—"না।"

—"আসামীরা বলেছিল এগুলি গোপন ?"

—"হ্যাঁ।"

আসামী পক্ষের উকিল আপত্তি করলেন। বিচারক আপত্তি গ্রহণ করলেন না।

—"তুমি রাখতে রাজী হয়েছিলে কেন ?"

—"আমাকে একশ টাকা দিয়েছিল।"

—"এগুলো পুলিশের হাতে গেল কি করে ?"

—"পুলিশ আমার ঘরে এসেছিল, আমিই পুলিশকে দিয়েছিলাম।"

আসামী পক্ষের জেরা করেছিলেন কলকাতা থেকে আসা এক নামকরা এ্যাডভোকেট।

—"আচ্ছা জবা দেবী, পলাশ মানে কি জানেন ?"

—"পলাশ মানে পলাশ ফুল।"

—"তুফান ?"

—"তুফান মানে—ঐ যা প্রতি বছর হয়ে থাকে। ঝড়, বৃষ্টি, বাতাস।"

—"হিমালয় মানে জানেন ?"

—"না।"

—"কখনও শুনেছেন নামটা ?"

—"না।"

—"প্রথম কার মুখে শুনলেন ?"

—"পুলিশের মুখে।"

—"পলাশ আর তুফান কথাদুটোও তো তাই ?"

—"হ্যাঁ।"

—"কথাগুলো পুলিশই আপনাকে শিখিয়েছিল, তাই না? আপনি বেশ বুদ্ধিমতী- চটপট শিখে নিয়েছিলেন।"

জবাদেবী প্রশংসা শুনে হাসলেন।

—"আসামীদের নাম পুলিশই আপনাকে বলে দিয়েছিল, তাই না?"

—"না, আসামীরাই বলেছিল।"

"—জবাদেবী, আপনার খদ্দেররা নিজেদের নাম বলে?"

—"বলে।"

—"আর কয়েকটা নাম বলতে পারেন?"

—"মনে নাই।"

—"কিন্তু এ নাম তিনটে তো খুব মনে আছে। এটা কি করে হল?"

জবাদেবীর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

—"পুলিশ বার বার বলে শিখিয়ে আপনাকে মুখস্থ করিয়েছে, তাই না?"

জবাদেবীর কপাল থেকে ঘাম ঝরছে।

—"দেখুন জবাদেবী, এই আসামীরা যুবক। এদের মা বোন আছেন, বাবা আছেন, এরা কেউ বিয়ে ক'রেনি। আপনার সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে এরা মদ খায়, চুরি-ডাকাতি করে, বেশ্যা বাড়ী যায়, মানে, এরা খুব বদ ছেলে। আপনি এদের সবার দিকে পরিষ্কার করে তাকিয়ে দেখুন। এরা কি বদ ছেলে বলে মনে হয় আপনার?"

জবাদেবী আসামীদের মুখের পানে তাকাতে পারছেন না। মাথা নীচু করে আছেন।

—"আচ্ছা, জবাদেবী, আপনার ব্যবসায়ে পুলিশদের সর্বদা খুশি রাখতে হয়, তাই না।"

—"হ্যাঁ, আমরা সবাইকে খুশি রাখতে চেষ্টা করি।"

—"কিন্তু পুলিশদের তো খুব ভয় করেন আপনারা, তাই না-কি? পুলিশ আপনাদের কারণে অকারণে ধরে নিয়ে যায়। এসব এড়ানোর জন্ত পুলিশকে মাসে মাসে টাকা দিতে হয় আপনাকে। আমি কি ভুল বলছি?"

জবাদেবী চুপ ক'রে রইলেন।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ করলেন, "প্রশ্নের জবাব দাও।"

এ্যাডভোকেট বললেন, "ইয়োর অনার, ইনি বেশ্যা হতে পারেন, তবুও স্ত্রীলোক। এঁর মান, সম্মান, লজ্জা, সরম আছে। আমাদের পণ্ডিতেরা বলেছেন, "মৌনং সম্মতি লক্ষণম।"

এ্যাডভোকেট বললেন, "এ মাসে পুলিশ আপনাকে পাকড়ে হাজতে রেখেছিল। রাখে নি?"

—"রেখেছিল।"

—"আর কাকে? আপনার সঙ্গে যে সব বেশ্যারা এসেছেন তাদেরও তো?"

—"আমি জানি না।"

—"কিন্তু পুলিশ দাবী করছে, আপনাদের ঘরে ভীষণ বিপদকারী স্বদেশী যুবকরা আসে, ফুর্তি করে, গোপন কাগজপত্র রেখে যায়, সে জন্যে অনেক টাকা দেয়। আপনাকে তাই বলেনি?"

—"বলেছিল।"

—"আপনাকে ভয় দেখান নি, যদি আপনি পুলিশদের শেখানো কথা সাক্ষীতে না বলেন আপনার ব্যবসা বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে, আপনাকে জেলে পাঠানো হবে?"

—"না।"

—"সহসা সারা আদালত কাঁপিয়ে কলকাতার এ্যাডভোকেট ভীষণ চড়া গলায় পৃথিবীর সবটুকু ক্রোধ ও হিংসা টেনে এনে জবাদেবীর একেবারে মুখোমুখি হয়ে গর্জে উঠেছিলেন, "সত্যি কথা বলুন, মিথ্যা বললে পাপ হবে আপনার। এতগুলো যুবকের জীবন নিয়ে মিথ্যে খেলবেন না। আপনি নারী। আপনার নিজেরও একটি ছেলে আছে। সত্যি কথা বলুন। আদালতে সর্বদা সত্যি বলতে হয়। আপনি ধর্মসাক্ষী করে সত্যি ছাড়া আর কিছু বললেন না কবুল করেছেন। বলুন আমি যা বলেছি তা সত্যি কিনা?"

জবাদেবী এবার একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলেছিলেন, "সত্যি।"

আদালতে দারুণ চাঞ্চল্য। সরকারী পক্ষের উকিলরা উত্তেজিত, পুলিশরা ক্রুদ্ধ।

এ্যাডভোকেট বললেন, "জবাদেবী আসামীদের দিকে তাকান।"

জবাদেবী চোখের জল মুছে তাকালেন।

—"হিমালয় কার নাম বলুন তো?"

—"কি নাম?"

—"হিমালয়।"

জবাদেবী তখন সব শেখানো নাম ভুলে গেছেন।

বললেন, "জানি না।"

এ্যাডভোকেট মশাই আদালতকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন, "ইয়োর অনার, এসব সাক্ষীকে পুলিশে মিথ্যে শেখান হয়। আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।"

বিচার একসঙ্গে পনের দিন চলেছিল। একমাস পরে এস. ডি. ও, সুশীল চট্টোপাধ্যায় 'রায়' ঘোষণা করেছিলেন। চারজন আসামীকে নির্দোষ সাব্যস্ত ক'রে মুক্তি দিয়েছিলেন। বাকীদের পাঁচ বছর থেকে আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড। 'রায়ে' যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ প্রবেশ করার জন্য প্রচুর খেদ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রত্যেক স্কুলের কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করা হয়েছিল। এস. ডি. ও. ভয় দেখিয়েছিলেন, এ সন্ত্রাসবাদের অঙ্কুরগুলি এখনি উৎপাটিত না হলে সরকারকে ভাবতে হবে স্কুলগুলিকে চালু রাখা হবে কি না।

আসামী পক্ষ থেকে আপীল করা হল সেসন্স কোর্টে। বিচারক ছিলেন শৈবাল গুপ্ত। বিখ্যাত মানুষ। আই-সি-এস-দের মধ্যে যাঁরা কিছুটা স্বাধীনমনা, তাঁদের প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগে সরিয়ে দেওয়া হত। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁরা বিচারের স্বাধীনতায় সারা দেশের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায় ও শৈবাল গুপ্তের মান প্রথম পংক্তিতে। অন্নদাশঙ্কর একই সঙ্গে স্বাধীন বিচারক ও লেখক হিসেবে আমাদের কৈশোরেই নাম করেছিলেন। আমি তাঁর 'দেশে বিদেশে' পড়ে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। পরবর্তী জীবনে অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি।

শৈবাল গুপ্ত পুরো মামলাটাকে ডিসমিস করিয়ে দিয়েছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুশীল চট্টোপাধ্যায়, অনুসন্ধানী পুলিশ, গণেশপুর হাই স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান, জমিদার বাড়ীর ছোট চৌধুরী: কেউ তাঁর থেকে রেহাই পাননি। এতগুলো যুবকের নবীন বয়সকে এভাবে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেওয়ার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর 'রায়ে' ধিকৃত হয়েছিল। শৈবাল গুপ্তের 'রায়' সারা বাংলাদেশে তীব্র চাঞ্চল্য এনেছিল। 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার', তো বটেই, ইংরেজ শক্তির মুখপাত্র 'স্টেটসম্যান' ও 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া'তেও পুলিশ নিন্দিত হয়েছিল এ ধরণের একটা প্রচ্ছন্ন মিথ্যে কেস তৈরী করার জন্য। শুধু হার্ড লাইন 'ক্যাপিটাল' সাপ্তাহিক শৈবাল গুপ্তকে বিচারকের সীমানা 'অতিক্রম করার' জন্য সমালোচনা করেছিলেন। 'ক্যাপিটাল' কট্টর

সাম্রাজ্যবাদী সাপ্তাহিক। সম্পাদকের নাম টাইসন। পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, পুলিশ ভুল করেছে নিশ্চয়ই। এ কেসটা তৈরী করা ঠিক হয়নি। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিষ যে ক্রমে-ক্রমে তরুণ-যুবক মানসে ঢুকে গেছে এর প্রমাণ রয়েছে অনেক। অতএব জজ, গুপ্ত পুলিশ ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে অত তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করে বিচারের সীমানা উৎড়ে রাজনীতির সীমানায় প্রবেশ করে ফেলেছেন।

এ মামলা গণেশপুরকে আরও একবার বঙ্গবাসীর মানসপটে চিহ্নিত করে দিল। প্রথমবার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রজনীকান্তের ভূমিকা।

॥ নয় ॥

স্কুল থেকে হেড মাষ্টার মশাই বিদায় নিলেন আমি যখন মাত্র দশম শ্রেণীতে উঠেছি। ছাত্ররা তাঁকে বিদায় দিয়েছিল সভা ক'রে, মালা পরিয়ে, শত শত হাত ছুঁয়েছিল তাঁর চরণ। আমাদের অনেকের চোখ থেকে অশ্রু নেমে এসেছিল। আমরা মুছবার চেষ্টা করিনি।

বিদায় নেবার আগে একদিন হেড মাষ্টার মশাই আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর আলাদা ঘর ছিল না। ঘরের এক কোণে জানলার পাশে বসতেন কেরাণী বলরাম-বাবু। তিনি ছাত্রদের মাইনে নিতেন, মাষ্টার মশাইদের মাইনে দিতেন, খরচের টাকা যোগাতেন, হিসাবপত্র রাখতেন, কেরানীর আর যা যা কর্তব্য সব করতেন। তাঁর পেছনে দুটো বড় আলমারী কেরানীর 'ঘর' হেডমাষ্টারের অফিস আলাদা করে রেখেছিল।

পিয়ন নটবর আমাকে ক্লাস থেকে ডেকে হেডমাষ্টারের কাছে নিয়ে গেল।

দেখতে পেলাম, হেডমাষ্টারের পাশে একটা চেয়ারে বসে আছেন উমেশবাবু।

হেডমাষ্টার মশাই আমাকে বললেন, "তুমি বার্ষিক পরীক্ষায় সব বিষয়ে প্রথম হয়েছ। ইংরাজী ও বাংলায় খুব ভাল করেছ, ৮০ এর বেশী মার্কস পেয়েছ। কিন্তু অঙ্কে পাশ করতে পারোনি, মাত্র ২৫ নম্বর পেয়েছ।"

আমি লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে রইলাম।

হেড মাষ্টার মশাই বললেন. "আমি তোমার পিতৃদেবকে এ নিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি তার জবাবে লিখেছেন, তোমাকে ক্লাস টেনে বাড়তি এক বছর রেখে দিতে। তুমি তাতে রাজী আছ?"

আমি বললাম, "না, ম্যাট্রিকে অঙ্কে আমি পাশ ক'রে যাব।"

তিনি বললেন, "আমারও ধারণা এক বছর তোমাকে আটকে রেখে কোনো ভালো ফল হবে না, যদি তুমি অঙ্কে উৎসাহের সঙ্গে মনোনিবেশ না করো। আমরা মানে, এই স্কুল আশা করছে, তুমি ম্যাট্রিকুলেশনে খুব ভাল ফল করবে, জিলা স্কলার-শিপ পাবে। কিন্তু অঙ্কে খুব উঁচু নম্বর না তুলতে পারলে তুমি তা পাবে না। অতএব এ বছরটা অঙ্কে তোমাকে গভীর মনোনিবেশ করতে হবে। আমি উমেশবাবুর

সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি অনুগ্রহ ক'রে তোমাকে অঙ্ক শেখাতে রাজী হয়েছেন। প্রত্যেক সন্ধ্যায় তুমি ওঁর বাসায় গিয়ে অঙ্ক শিখবে।"

আমি খুব নিচু গলায় বললাম, "প্রাইভেট টিউশনির পয়সা নেই আমাদের। সারা মাস মাত্র কুড়ি টাকায় চালাতে হয়।"

হেডমাষ্টার মশাই বললেন, "তোমার পিতৃদেবের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র আদান-প্রদান হ'য়েছে। তিনি প্রতি মাসে উমেশবাবুকে টাকা পাঠাবেন। তুমি কাল থেকেই ওঁর কাছে অঙ্ক শিখতে শুরু করে দাও। সন্ধ্যায় একটু আগেই যেও। তোমার পিতৃদেব খুব সুন্দর ইংরেজী লেখেন। বুঝতে পারছি ভাষার দখলটা তোমার জন্মগত উত্তরাধিকার। তোমার পিতামহ রজনীকান্তর নামও অজানা নেই। শুনেছি ইংরাজীতে খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারতেন। আচ্ছা, তুমি এখন এসো। তোমার ম্যাট্রিক পাশের সময় আমি এই স্কুলে থাকবো না। কিন্তু তোমার ফলের উপর নজর রাখবো। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে, আমাদের সবাইকে, হতাশ করবে না।"

॥ দশ ॥

উমেশবাবু আমার অঙ্ক-আতঙ্ক দূর ক'রে দিয়েছিলেন। এই প্রথম অঙ্কে আমার আকর্ষণ জন্মেছিল। বিশেষত গণিত ও এ্যালজেব্রায়, জিওমেট্রির সঙ্গে কিছুতেই আমার সম্ভাব হল না। প্রব্লেমটা উমেশবাবু শুধু সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন না, আমার মনে হত প্রত্যেকটা একটা চ্যালেঞ্জ, তার পরাজয় আমার হাতে হতেই হবে। তিন মাসের মধ্যে অঙ্কে চতুর হয়ে উঠলাম। দশম ক্লাসের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় চুয়াত্তর নম্বর পেয়ে সবাইকে বিস্মিত চকিত করে দিলাম। হেড মাষ্টার মশাই তখন স্কুল থেকে চলে গেছেন। তাঁর ঠিকানা আমার কাছে ছিল, তাঁকে লিখে জানালাম আমি তাঁর আদেশ পালন করেছি। চিঠির জবাব না পেয়ে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলাম বৈকি। আমার ১৪ বছরের পাকা মন অবশ্য বুঝতে পেরেছিল ভদ্রলোক নতুন চাকরীতে মনোনিবেশ করতে গিয়ে পেছনে ফেলে আসা একটি ছাত্রের চিঠির জবাব দিতে না পারলে আমার দুঃখ পাওয়া উচিত নয়। পিতৃদেবকে আমি অঙ্কে উন্নতির কথা জানাইনি। মাকেও বলে দিয়েছিলাম না লিখতে। যদি সত্যি অঙ্কের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়লাভ করতে পারি ম্যাট্রিক পরীক্ষায়, তখন তিনি জানতে পারবেন।

উমেশবাবুর স্থানটা রয়ে গেছে আমার জীবনে অন্য কারণে, অঙ্কের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। উমেশবাবু ছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্যে ও ধর্মে দীক্ষিত পণ্ডিত। বৈষ্ণব পদাবলী ছিল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বিজড়িত। মিনিট চল্লিশ অঙ্ক শেখানোর পর তিনি চলে যেতেন তাঁর স্বক্ষেত্রে। আমার চৌদ্দ বছরের মন তাঁর সঙ্গে চলে যেত এক অনাস্বাদিত অভূতপূর্ব জগতে, যেখানে কৃষ্ণ আর রাধার প্রেম ছাড়া আর কিছু নেই। উমেশবাবু আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাধাকৃষ্ণের প্রেম পবিত্র, বৈষ্ণব কবিগণ যতই বিরহ মিলনকে দেহ বিলাসের মাধুর্যে রসালমুকুলমধু করে থাকুন না কেন। তাঁরা আসলে ছিলেন দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের সাধক। তাঁদের কাব্যের চিরন্তন ব্যঞ্জনা, ধ্বনি ও ভাবা, যা যুগ যুগ পরেও বহু মানুষের মন উত্তাল-পাতাল করছে, ছিল দেহ থেকে দেহাতীর প্রেমের ভাবা, প্রকৃতিকে প্রেমে আপ্লুত, প্লাবিত ক'রে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা প্রকৃতি-অতীত জীবন-সঙ্গীত। রাধা কৃষ্ণ তাঁদের আত্মজ্যোতী, রাধার সখীগণ। তাঁদের মান-অভিমান, বিরহের তপ্ত দাহন তাঁদের

অভিসার, মিলনের জন্য পরিপূর্ণতা, এ সব অভিব্যক্তির সঙ্গে, উমেশবাবু বলতেন, বিভিন্ন সঙ্গীতের তালে, রমনের মাধুর্যে মিশে যেত যমুনার জল ও তটভূমি, আকাশ, বনরাজি, পথ, জনপদ। এক কথায় সম্পূর্ণ প্রকৃতি-পৃথিবী-পুরুষ নারীর অপূর্ব মিলন গাঁথা বৈষ্ণব কবিতা।

উমেশবাবু চণ্ডীদাসের একটি কবিতা প্রায়ই সুর দিয়ে আবৃত্তি করতেন, যেখানে কৃষ্ণ রাধার দেহের স্তরে স্তরে শুধু ফুলশোভা দেখতে পাচ্ছিল। বলতেন, পৃথিবীর আর কোনোও সাহিত্যে সম্ভবত প্রকৃতি ও প্রেমিকাকে এমন রস সৌন্দর্যে শোভিত করেনি। গানটি আজও আমার কানে বাজে :

তমলে কুসুম চিকুর গণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে॥
সুপট নামা তিলফুলে
দেখি তোর গন্তযুগ মহুলে॥
অধর সুরঙ্গ বন্ধুলী ফুলে।
কর্ন যুগ তোর ও বলহুলে॥
মুকলিত খুন্দ তোর দশনে।
খন্তরী কুসুম তোর যোনে॥
ভুজযুগ হেম যুথিকা মালে।
অশোকতবক বরযুগলে।

উমেশবাবু কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণ রোমাঞ্চে অধীর হ'য়ে উঠতেন। বিহারে, বঙ্গে এত যে ফুল আছে তাই বা চণ্ডীদাস জানলেন কি ক'রে? রাধার কেশ কলাপে তমাল ফুল, নয়নে নীল কুরুবক, তীক্ষ্ণ পুষ্ট নাসায় তিলফুল, দুই গালে মহুয়া, সুরক্ত অধরে বান্ধুলী পুষ্প, দুই কানে বকফুল। রাধার গণ্ডকৌমুদি মুকুলিত কুন্দ, বসনে আস্তরী পুষ্প, বাহুযুগল অলংকৃত। করযুগলে অশোকগুচ্ছ। রাধার স্তন মুকুলিত স্থলকমল, আস্তরী ফুলের মতো রোমরাজি, গভীর নাভিতে নাগকেশর জঙ্ঘায় স্বর্ণকতকী। রাধার চরণকমল স্থলপদ্ম, আঙুলিগুলি চাঁপা কলি, সারা তনু শিরীষ কুসুম। শরীরের কান্তি কনকচম্পক ফুলের পংক্তির মত, নবমল্লিকা ফুটে রয়েছে ঈষৎ মধুর হাস্যে, তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রাধা, আমি তোমার কুসুমিত দেহ দেখছি। চণ্ডীদাস বাসলী বরে গান গাইলেন।

উমেশবাবুর বিপুল দেহ, প্রকাণ্ড উদর, বিশাল বদন, ঘনগম্ভীর কণ্ঠে বৈষ্ণব পদাবলী আবৃত্তি ও গান ক'রে যেত। আমার চৌদ্দ বছরের নবীন শরীরে নানা বর্ণের রেখাঙ্ক বদলে যেত, আমি ভেসে যেতাম কোনো এক শেষহীন প্রেমের প্লাবনে। চৈতন্যদেবের যুগ আরম্ভ হবার আগেই চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গুণরাজ বৈষ্ণব পদাবলীর জোয়ার ডেকে আনেন। তারপর চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও তাঁর পরের প্রায় দুই'শত কবি এই প্লাবনকে যুগের পর যুগ অব্যাহত রেখেছেন। এ বার্তা উমেশবাবু আমাকে প্রথমে দিয়েছিলেন। কীর্তন আমার প্রধান সঙ্গীত ছিল, আমি নিমাই সন্ন্যাস পালা গাইতাম। তাই এত সহজে ভেসে যেতে পেরেছিলাম উমেশবাবুর সহজীয়া সঙ্গীতের প্লাবিত ধারার সঙ্গে। মেঘচিহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে বাঁশীর শোকে আমার চোখেও জল নেমে আসত। আমিও অহোনিশি—

যোগ যে আই,
মন পবন গগনে রহাই,
আমার চোখের সামনেও 'যমুনার কূলে,
ব্রজের নন্দন, হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ানো তরুমূলে।

রাধার লজ্জা আমাকেও শিহরিত ক'রে তুলত—"কুচ নখ লাগত সখি জন দেখ। বইস মুকানত গিরি সখিরেন।" জ্ঞানদাসের দুটি লাইন উমেশবাবু বিশেষ আবেগের সঙ্গে গাইতেন: "যত যত পিরীতি করয়ো পিয়া মোরে, আখেরেতে লেখা আছে হিয়রে মাঝারে।" বলতেন, বৈষ্ণব ধর্মের এই হল মর্মকথা, তুমি যতটুকু প্রেম দিচ্ছ আমাকে, সবটুকু আমার অন্তরে চিহ্নিত, স্বাক্ষরিত হ'য়ে রয়েছে। প্রেম বিস্মৃতির নয়, স্মৃতির, সুন্দরের। যদি কারুর মনে চিহ্ন রাখতে চাও তাকে ভালোবাসো, ভালোবাসার স্বাক্ষর কোনোদিনও মুছে যায় না।

উমেশবাবু থাকতেন ভিঙ্গামানিক গ্রামের এক বাড়ীর অংশ ভাড়া করে। আমাদের বাড়ী থেকে চার মাইল পথ। গ্রাম ছাড়িয়ে এক প্রকাণ্ড জনশূন্য মাঠ, তার মাঝখানে এক বিরাট বৃদ্ধ বটগাছ। লোকে বলতো বটবৃক্ষে ভূতেরা বাস ক'রে। রাত্রিতে চলাচল ক'রে নির্জন অন্ধকার মাঠে। আমি বেশ বেলা থাকতেই উমেশবাবুর কাছে হাজির হতাম, কিন্তু, বিদায় নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়ানোর সময় আকাশ জুড়ে অন্ধকার। আঁধার নেমে এসেছে গাছে, বনে, মাঠে, খালে। আঁধারের বুকে দূরে

দূরে এক একটি গৃহে জ্বলছে কেরোসিনের লণ্ঠন, অথবা 'কুপি'। মাঠের কাছাকাছি হতেই ভয়ে শরীরে রোম দাঁড়িয়ে উঠত। বৈষ্ণব কবিদের রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা মন থেকে একেবারে পলাতক। আমি বড় বড় পা ফেলে, উর্দ্ধতম গলায় যা কিছু গানের লাইন মনে পড়ত তাই গাইতাম, সবটাই কৃষ্ণ বা হরির গান, যা শুনলে ভূতেরা পালিয়ে যায়। নিমাই সন্ন্যাস, নৌকাবিলাস, মাথুর, যে কোনও পালাকীর্ত্তনের যা মনে আসত তাই চেঁচিয়ে গাইতাম—"উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল, নদীয়ার সব লোক জাগিয়া উঠিল"—অথবা "কেমন ক'রে এমন ছেলে মা হ'য়ে বিদায় দিয়েছে, অথবা 'সুর ধনী তীরে নব ভাণ্ডারী তলে, বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণ মেলে"···মাঠ পেরিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়লে আমার কণ্ঠ নীরব হত, তখনও বুকের কাঁপন কানে আসত, ভয় চলতো সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো, একেবারে বাড়ী পৌঁছে ম'ার কাছে দাঁড়ানো পর্যন্ত। মাকে কিন্তু একদিনও বলিনি মাঠ পেরোতে ভীষণ ভয়ের কথা। বরং গ্রামের লোকেদের মুখে শুনেছি সন্ধ্যেবেলা দুর্জয় সিংহের ছেলেটা সুন্দর কীর্তন গেয়ে রোজ ডিঙ্গামানিক থেকে গণেশপুরে ফেরে, মাষ্টার মশাইয়ের কাছে পড়া শেষ ক'রে।

আমি বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হইনি, সারাজীবন ধর্ম থেকে দূরে থেকেছি, কোনও গুরু নেই আমার, ধর্মীয় দীক্ষা নিইনি আমি, মন্দিরে পূজা দিতে আমি যাইনে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী আমার পরিণত কিশোর মনে গভীর স্বাক্ষর খোদাই ক'রে দিয়েছিল। ক'রেছিলো আমাকে রোমান্টিক ও নারীপ্রবণ। ভানুসিংহের পদাবলীর বৈষ্ণবতা আমার কানে ও মনে ধরা পড়েছিলো সেই সময়েই। আমি বুঝতে পেরেছিলাম বৈষ্ণব ধর্ম না হজম করতে পারলে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করা সম্ভব নয়। পরিণত জীবনে আমি বেদ-উপনিষদ-গীতা থেকে হিন্দু দর্শনের উদার আত্মপ্রশ্ন কুড়িয়ে নিতে পেরেছিলাম, আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসাকে যতটুকু সম্ভব ধারালো করার জন্যে। যে সাধারণ অর্থে হিন্দুধর্ম কথাটি ব্যবহার হয় তা কখনও আমাকে আকর্ষণ করেনি। দুর্জয় সিংহ কালীপূজক ছিলেন। আমার মনের গভীরে 'দুর্গা' আন্ত অক্ষরের আসন দখল ক'রে রেখেছে, দিনের প্রথমে ও শেষে স্বতঃউচ্চারিত ঐ নাম আমার অজ্ঞাতে একটা শক্তি ও আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। দুঃখ থেকে আনন্দ, বিপদ থেকে সান্ত্বনা, বিয়োগের উত্তীর্ণ মিলন, হারানোর মধ্যে প্রাপ্তি, সর্বোপরি মানুষ সম্বন্ধে অমর আশাবাদ, বলিষ্ঠ ভবিষ্যত দৃষ্টি। এর সঙ্গে কৈশোরের বৈষ্ণব পদাবলীর কোনো যোগাযোগ নিশ্চয় নেই। উমেশবাবু আমাকে যে মৌল ও মূল শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন, নিজে না জেনে, না অনুমান করে, তা হল : ভালবাসা।

আমি তাঁর কাছে সেই কৈশোরে শিখেছিলাম, ভালবাসা ও প্রেমের চেয়ে সুন্দর জীবনে নেই কিছুই।

॥ এগার ॥

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার জন্য মহকুমার সব স্কুলের পরীক্ষার্থীদের যেতে হল মাদারীপুর। সেখানে তো হোটেল ছিল না, মাদারীপুর শহর হলেও, আধা গ্রাম। বরিশাল ও ফরিদপুরের সমানপ্রভাব এই মহকুমা শহরে, লোকেদের কথাবার্তায় বরিশালী টান। আমাদের গ্রামের আনন্দ সেন মহাশয় মাদারীপুরে সুদক্ষ মোক্তার, স্কুল পাশ করা ডাক্তারের মতো, কলেজ পাশ করা উকিলের নিচে। গণেশপুরের পরীক্ষার্থীদের বেশীরভাগই তাঁর গৃহে আতিথ্য পেত। বেশ বড় একটা বাইরের ঘরে প্রকাণ্ড সতরঞ্চি, তার উপর সাদা চাদর পেতে দেওয়া হয়েছিল, আমরা চারটি পরীক্ষার্থী সেখানে সাদরে আশ্রিত হয়েছিলাম। পরীক্ষায় বসতে হত দশটা থেকে পাঁচটা, অন্নদা সেন মশাই'র বাড়ীতে ফিরে আসতেই জলখাবার, রাত্রিতে তাঁদের রান্নাঘরের বারান্দায় পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে আহার।

মাদারীপুর যেতে হল গণেশপুর থেকে নৌকায় স্বরেশ্বর, সেখান থেকে ষ্টীমার। গণেশপুর ছেড়ে 'দূর দেশে' যাবার অভিজ্ঞতা আমার তিনবার হয়ে গেছে। মামার বিয়ের সময় মার সঙ্গে কলকাতা, তখন আমি নিতান্তই বালক, তার কোনো স্মৃতি নেই মনের পর্দায়। বিজনকাকার বিয়েতে ঢাকা গিয়েছিলাম, তার আবছা স্মৃতি রয়ে গেছে একটি পরম সুন্দরী বালিকাকে ঘিরে। অষ্টম ক্লাসে পড়ার সময় নাক-ভর্তি পালিপাশ অপারেশন করার জন্য বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন ঢাকা, অপারেশন মোটেই ভালো হয়নি, ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ই-এন-টি সার্জন ছিল না। আমার নাক থেকে রক্ত ঝরে জামা ভেসে গিয়েছিল, তাতে বাবা খুব কেঁদেছিল, এটা আমার মনে আছে। আরও দুটো স্মৃতি রয়ে গেছে মনে। আমার রাঙা ঠাকুমার বাবা ঢাকা শহরে, রমনা পেরিয়ে 'উয়ারী' পল্লীতে বাড়ী করেন, আমরা বাপ ছেলে সেখানে আতিথ্য পেয়েছিলাম। এই মহাশয় 'বৈদ্যরা ব্রাহ্মণের চেয়ে জাতিতে বড়' এই 'শাস্ত্রীয় সত্য' প্রমাণ ক'রে কয়েকখানা কিতাব ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি নিজের পদবী বদলে দিয়েছিলেন 'শর্মা'-তে—তিনি ছিলেন দাসশর্মা। আমার পিতৃদেবকে অনেক বুঝিয়েও 'সেনশর্মা' বা 'সেনগুপ্তশর্মাতে' উত্তীর্ণ করতে পারেননি। তিনি বাড়ীর সব পুজো, দুর্গাপুজো পর্যন্ত নিজে করতেন, 'পুরোহিত দর্পণ' ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। তাঁর নিজেদের পুত্রদের

নিয়ে হতাশার কথা আমার মত কিশোরকেও অনেকক্ষণ ধরে বলে যেতেন, বলা শেষ হলে প্রশ্ন করতেন, "বুঝেছ আমার দুর্ভাগ্য?" আমি ভয়ে ভয়ে বলতাম 'বুঝেছি' তিনি তৎক্ষণাৎ জোর গলায় বলে উঠতেন, 'ছাই বুঝেছ'। তাঁর মাথার বিরাট টিকি দু'তিনবার লাফ দিত।

সেই ঢাকা শহরের এক টুকরো সোনার স্মৃতি সারা জীবন আমার মনে লেগে রয়েছে। বর্ষা সন্ধ্যার মেঘলা আকাশে এক ছটা লাল আবিরের মতো।

একটি মেয়ের সঙ্গে আমার 'ভাব' হয়েছিল।

তার নাম ভুলে গেছি। সে আমার চেয়ে বছরখানেকের ছোট ছিল। শুধু মনে আছে তার মা পরমা সুন্দরী ছিলেন, মেয়েটি ছিল কাঞ্চন বর্ণ, বড় বড় চোখ, মাথায় এক ঝাঁক ঝাঁকড়া চুল, মুখে সব সময় হাসির হিল্লোল।

তারা নিশ্চয়ই যোগেশচন্দ্র দাসশর্মা মশাইদের আত্মীয় ছিলেন, থাকতেন রমনায়, বড় একটা মাঠ ও মন্দির পেরিয়ে পৌঁছতে হতো তাদের বাড়ী। আমি ক'বার তাদের বাড়ী গেছি মনে নেই, শুধু মনে আছে, গেলে আমাদের আলাদা করা যেত না, কত কী সব কি যে কথা বলেছি ঈশ্বর জানেন, কিন্তু, খুব মনে আছে তাকে বলেছিলাম, এই, জানো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, জবাবে সে বড় বড় চোখ দু'টি আমার চোখে রেখে বলেছিল, আমিও ভালোবাসি তোমাকে।

এই নাম ভুলে যাওয়া মেয়েটি আমার জীবনে প্রথম প্রেম।

নামহীন বনফুলের মতো আমার জীবন-জঙ্গলে সে অমর।

প্রেমে পড়া, ভালোবাসা আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল। সেই উমেশবাবুর বৈষ্ণব পদাবলী আমার মনকে নরম-গরম ক'রে দিয়েছিল। জীবনে আমি অনেক নারীকে ভালোবেসেছি, পেয়েছি অনেক নারীর ভালোবাসা, তাদের প্রত্যেকের প্রভাব চিহ্নিত হ'য়ে রয়েছে তিনকুড়িদশের ইতিহাসে। পুত্র, তোমাকে তাদের কথা বলব, তাদের বাদ দিলে আমার জীবনের অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ডালপালা কেটে নিলে বৃক্ষের কাণ্ডটা যেমন প্রবল হয়েও দুর্বল হয়ে পড়ে।

ভাল পড়ুয়াদের খাতির একটু বেশী জোটে। স্কুলে 'ভাল ছাত্র' এই সুনাম অন্নদা সেন মহাশয়ের বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছেছিল। অন্নদাবাবু নিজে আমাকে বলেছিলেন, "তোমাকে কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ, পেতে হবে।"

তাঁর একটি মেয়ে, বয়স আমারই মত হবে, পনের-পা-দেওয়া, আমাদের রাত্রির

আহারের সময় উপস্থিত থাকতো। সরল, সুশ্রী, খোলা মন, ঈষৎ প্রগলভ মেয়ে, শোভনা। শোভনা আমাকে একদিন বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। তাঁর মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে।

আমার পিতামহ রজনীকান্ত বিখ্যাত ব্যক্তি, পিতা দুর্জয়সিংহ শান্ত নিবিড় পুকুরের মত গভীর, সুস্থির, নিঃসঙ্গ স্কুল মাষ্টার।

সেকালের সমাজে এই টিকেট নিয়ে অনেকের বাড়ীতেই প্রবেশ করা যেত।

শিক্ষকদের সম্মান ছিল গ্রামীন সমাজে প্রচুর। পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের মতোই।

শোভনার মাকে প্রণাম করতে তিনি একটা কাঠের হাতহীন চেয়ারে বসতে বললেন আমাকে।

মা, বোন, ভাইদের—তখন আমার দুটি ভাই—খবর নিলেন। বাবা সুস্থ আছেন কি না জিজ্ঞাসা করলেন। শোভনা একটা প্লেটে ক'রে নাড়ু ও মোওয়া এনে দিল। বলল, "এগুলো সব খেতে হবে।" আমি বাধ্য ছেলে, সবগুলো খেয়ে নিলাম।

শোভনা মাকে বলল, "ছেলেটি ভালই, কি বলো মা? বেশ কথা শোনে।" বলেই খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। আমি ভীষণ সংকুচিত হয়ে গেলাম।

শোভনা বলল, "পড়াশোনায় ভাল ছেলেরা সাধারণত বোকা-বোকা হ'য়ে থাকে। তোমাকে দেখে তা তো মনে হচ্ছে না।"

মা ধমকে উঠলেন, "কি সব বলছিস, খুকি! ও কি ভাববে?" আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "এই মেয়েটা ভীষণ বাজে বকে। যাকে যা বলতে নেই, তাকে তাই বলে বসে। কিছু মনে ক'রে বলে না কিন্তু।"

শোভনা বলল, "ক্লাসে ফেল করা মেয়ের মুখের কথার মানে হয় নাকি?"

মা বললেন, "ও কিন্তু আবার বাজে কথা বলছে। প্রথম বিভাগে নাইন থেকে টেনে উঠেছে। আসছে বছর ম্যাট্রিক দেবে।"

এবার আমি বললাম, "তারপর?"

শোভনা বলল, "তারপর দুটো পথ খোলা। একটা পথ নিয়ে যায় কলেজে, য়ুনিভারসিটিতে। অন্য পথ শ্বশুর বাড়ী।"

শোভনা আমাকে 'তুমি' বা 'তুই' একটা সম্বোধনও করেনি।

আমি প্রশ্ন ক'রে বললাম, "তুমি কোন্ রাস্তা নেবে?"

শোভনা বলল, "গাঁয়ের ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে শেখে না। 'তুমি' বলছ কেন? 'আপনি' বলবে।"

আমি বললাম, "আমি তোমার এক ক্লাস উপরে পড়ি। তুমি আমাকে আপনি বলবে, আমি তোমাকে বলব তুমি।"

—"ওরে বাবা! এক মুহূর্তে দাদা হতে চাইছে!" চেঁচিয়ে উঠল শোভনা, সঙ্গে সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

চারদিন পরীক্ষা চলছিল আমাদের। চারদিনই শোভনার সঙ্গে সন্ধ্যে বেলায় গল্প হত। আমাদের সম্বোধন স্বাভাবিক সরলতায় প্রথম থেকেই 'তুমি'-তে ধার্য হয়েছিল। শোভনা কথাবার্তায় সপ্রতিভ, আমিই বরং লাজুক। শোভনার ভাষায় "গ্রামের ছেলে!"

পরীক্ষা শেষ হ'লে আমি গণেশপুরে ফিরে গেলাম। রিক্সা চেপে ষ্টীমার স্টেশনে যেতে হবে। শোভনা রাস্তায় এসে আমাকে বিদায় দিল।

বলল, "মনে থাকবে আমাকে?"

আমি বললাম, "গ্রামের ছেলেরা সহজে কাউকে ভোলে না।"

—"তুমি কবে যাচ্ছ কলকাতা?"

—"পাশ তো করি।"

শোভনা হেসে উঠল, "পাশ করা নিয়েও সন্দেহ! লোকে বলে তুমি তুখোর পড়ুয়ে।"

আমি বললাম, "ভালো পাশ না করলে আমার কলেজে পড়া হবেনা।"

বিস্মিত হ'য়ে শোভনা বলল, "কেন?"

—"কলেজে পড়ার খরচ বাবা নাও যোগাতে পারেন।"

শোভনা আবার হেসে উঠল, "ভগবানকে ডেকো, হবেই হবে।" তখুনি মিহি গলায় গেয়ে উঠল শোভনা: "নিশিদিন / ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে / যদি পণ ক'রে থাকিস / সে পণ তোমার রবেই রবে।"

আমি বললাম, "তুমি যে গাইতে পারো তা তো জানতাম না।"

শোভনা বলল, "যাবার আগে জানিয়ে দিলাম, আরও অনেক গুণ আছে, ধৈর্য ও সময় থাকলে ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে। পুজোয় সময় গ্রামে আসছ তো?"

—"নিশ্চয়ই।"

—"আমরাও যাবো। তখন আবার দেখা হবে।"

আমরা দুজনে দুজনের চোখে চোখ রাখলাম। চারটি চোখেই জল।

পনের বছরের বুক কত সহজেই ভরা নদী হয়ে ওঠে। পনের বছরের আঁখি কত সহজে শিশিরভেজা সবুজ পাতার মতো কাঁপে।

আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম শোভনার চুলে একগুচ্ছ করবী। ওপরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম আকাশ ঘন নীল।

পনের বছরের গ্রাম বাংলার ছেলেটি স্বতস্ফূর্ত ভাবে বলে উঠল :

"অলকে তার একটি গুছি করবী ফুল রক্তরুচি,
নয়ন ক'রে কী ফুল চয়ন নীল গগনে দূরে দূরে।"

—"বাপরে বাপ!" চমকে উঠল শোভনা, "তুমি এ-সব কবিতা শিখলে কি ক'রে?"

আমি বললাম, "এটা একটা গান, কলের গানে শুনেছি।"

—"কলের গান! ও! গ্রামোফোন!" শোভনা হেসে ভেঙ্গে পড়ল। "ওঃ একেবারে গেঁয়ো ছেলে তুমি।"

আমি তখন রিক্সায় বসে পড়েছি। বললাম, "চলি তাহলে শহরে যেয়ে!"

শোভনা আমার জীবনের প্রথম মেয়ে বন্ধু। বেশী দিন বাঁচে নি সেই বন্ধুত্ব। শোভনাই বাঁচে নি বেশীদিন। শোভনা দীর্ঘজীবি হলেও আমাদের বন্ধুত্বের আয়ু নিশ্চয় দীর্ঘ হতে পারত না।

পঞ্চান্ন বছর আগে ছেলে-মেয়েদের বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ ছিল। এইটুকু আমার চেয়ে শোভনা ভালো জানত।

তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল বের হ'য়ে গেল। আমি ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ, পেলাম না। তিনটি বিষয়ে 'লেটার' পেলাম—ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত।

গণিতে পেলাম ৬১ নম্বর।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দিলনা কেউ আমাকে। স্কুলে হেড মাষ্টার ছিলেন না। অন্য শিক্ষকগণ খুশি হলেন, সঙ্গে সঙ্গে জিলায় প্রথম না হতে পারার জন্য দুঃখিত। মা খুশি হলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনটে বিষয়ে 'লেটার' পাওয়ার মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছেন তা মনে হল না। জ্যেঠামশাই এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। শরিকদের পরিবারের গুরুজনদের মুখে হাসি ফুটলো না।

কয়েকদিন পরে পিতৃদেবের পোষ্টকার্ড এলো। মাকে লেখা। "শ্রীমান ম্যাট্রিকুলেশনে ভালই ফল করিয়াছে। এইবার তাহাকে কলিকাতায় গিয়া কলেজে পড়িতে হইবে। যাইবার পথে আমার কাছে কয়েকদিন থাকিয়া যাইবে, ইহাই স্থির

করিয়াছি। সুরেশ্বর হইতে ষ্টীমার মেঘনা ও ভৈরবী নদী পথে খুলনা আইসে। শ্রীমান তাহাতেই আসিবে।"

আমার কাকামনি তখন কলকাতায়, বেকার। তিনি খুব বাহবা দিয়ে চিঠি লিখলেন আমাকে। "তুমি আমাদের বংশের সবচেয়ে ভাল ফল লাভ করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছ। তোমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

উমেশবাবু দুঃখ পেয়েছিলেন অংকে 'লেটার' না পাওয়াতে কিন্তু সে দুঃখে ভার ছিল না। তিনি বলেছিলেন তোমাকে বৈষ্ণব পদাবলী শিখিয়েছি। রস, রূপ, গন্ধে ভ'রে উঠবে তোমার জীবন। জীবন মধুময়, পৃথিবী সুন্দর, পবন সুগন্ধ, কৃষ্ণপ্রেম যে পেয়েছে তার বৈভবের অভাব নেই।

আজ মঝু গেহ গেহ করি মানলু
আজ মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু তিহি মোহে অনুকূল হো অল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা।

"তোমার জীবন অনুকূল হোক। তুমি যেখানেই থাকো, 'মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ।" উমেশ মাষ্টার স্রোতের বুকে তৃণের মতো ভেসে অতীত হ'য়ে যাবে, কত কিছু ঘটনা ঘটবে তোমার জীবনে, সুখের পরে দুঃখ আসবে, রৌদ্রের পরে প্রভঞ্জন, শুধু মনে রেখো : "জাতি জীবন ধন তুমি।"

বিষাদ মেঘ ঘনিয়ে এলো গণেশপুরের একটা প্রাচীন বাড়ীর 'দক্ষিণের ঘরে।" পুত্র গ্রামের পাঠ শেষ ক'রে যাচ্ছে কলকাতা, কলেজে পড়বে, মানুষ হ'বে, সেই বিষাদ মেঘে ঘনঘন বিদ্যুতের ঝিলিক : এই বিয়োগের সতরঙ্গি আশা, উত্তেজনা, স্বপ্নের সুতোয় বোনা। আমার চোখে সবকিছু নতুন। নতুন ক'রে দেখছি আমি পদ্মানদীর ছলছল ঢেউ, বকপাখিগুলিকে মনে হচ্ছে সুদূরে হাতছানি, তৃণ-লতা-বৃক্ষরাজির নিবিড় সবুজের অশ্রুস্নিগ্ধ স্পর্শ লাগছে আমার শরীরে। ডালিম গাছটা তার অসংখ্য লাল ফুলগুলি প্রজাপতির ডানার মতো রং-এর দাপটে তুলে ধরেছে আমার সামনে। ভবিষ্যতের ইশারা জানাচ্ছে পনের বছরের একটি ছেলেকে। এত পাখির এত কূজন এর আগে কানে বাজেনি আমার, বাতাস কোমল পরশ দিয়ে যাচ্ছে এক তরুণ দেহে, আকাশ কোন দিগন্ত থেকে অজানা ভবিষ্যতের দিকে হাতছানি দিচ্ছে। মালতী, কামিনী, যুঁই, স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ, গাঁদা, কচুরীপানা, শাপলা যতকিছু ফুটতো আমাদের বাগানে, জঙ্গলে, পুকুরে, পথের ধারে! তাদের সকলের মন্ত্রহীন বাঙ্ময়তার মধ্যে

আমি চরে বেড়াচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত বুক ফেটে কান্না আসছে, যখন দেখছি মা'র বিষন্ন মুখ, আমার এক-আত্মা বোন মধুর মুখ ও চলাফেরা, দু'ভাই কানু ও ভানুর ব্যাথাতুর চোখ। পনের বছর বয়সে আমি অনেক পাকা হ'য়ে গেছি, পাঁচ বছর মা'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংসার চালিয়েছি, পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব যেন আমারও কাঁধের ওপর এসে গেছে। এখন মাকে সবকিছু একা সামলাতে হবে। জ্যেঠামশাই অভিভাবক হিসেবে সবকিছু দেখবেন নিশ্চয়, তবু মা'র সঙ্গে বসে বসে সংসার চালাবার দৈনন্দিন অনেক 'সমস্যা' আমি আলোচনা করেছি। আমি বুঝতে পারছি মা-মধু-কানু-ভানু-সবাই অদূর ভবিষ্যতে গণেশপুর ছেড়ে চলে যাবে, মাকে একা একা গ্রামে বেশীদিন রাখা চলবে না। মধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া শেষ ক'রে তিন বছর বাড়ীতে পড়ছে, ওকে স্কুল কলেজে পড়াতে হবে। আমার গণেশপুর ছাড়া আর একটি ভদ্র পরিবারের গ্রাম ছেড়ে শহরবাসের সূচনা এ কথাটা আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, সবাইকে যে "শীঘ্রই" খুলনা অথবা কলকাতা যেতে হবে তা নিয়ে রোজ আমাদের মা ছেলেমেয়েদের মধ্যে উত্তপ্ত উৎসাহিত আলোচনা।

কানু বলে রেখেছে, দাদা, আমরা যখন কলকাতা যাব, খাটগুলো সব নিয়ে যাব কিন্তু! আমরা ওর কথা শুনে হেসেছি, কিন্তু এত বড় একটা ব্যবহারিক ঘোষণার মধ্যে হাসির কি আছে কানু তা একেবারেই বুঝতে পারছে না।

বাবা খুলনা পর্যন্ত যাবার ভাড়া পাঠিয়েছিলেন। মা তাঁর বহুকষ্টে জমানো তহবিল থেকে পুরো দুটো টাকা আমাকে বাড়তি খরচার জন্য দিলেন। একটা টিনের বাক্সে ধুতি, তিনটে শার্ট, দুটো গেঞ্জি, একখানা গামছা, একখানা পাঞ্জাবী গুছিয়ে দিলেন মা।

মা'র চরণধূলি আর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, সব গুরুজনদের প্রণাম ক'রে নারায়ণ ঘর, দুর্গা মণ্ডপ, কালীপূজার ঘরে প্রণত হয়ে আমি এক বসন্ত প্রভাতে গণেশপুরের পদ্মা নদীতীরে নৌকায় চেপে বসলাম। জ্যোঠামশাইয়ের সঙ্গে কানু, মধু, ভানুও এলো আমাকে তুলে দিতে। নৌকাতে আরও তিনজন যাত্রী ছিল, জ্যেঠামশাই তাদের বারবার করে অনুরোধ করলো, আমার উপর তারা যেন নজর রাখে।

জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে আমি প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু সেই আমার জীবনের প্রথম ঐতিহাসিক যাত্রার সঙ্গে কোনো যাত্রার তুলনা হতে পারেনি। একটি নিতান্ত সাধারণ স্বল্পবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের পনের বছরের ছেলের জীবনে এ্যাডভেঞ্চার বলে কিছু ছিল না। আমাদের প্রথম ও শেষ মন্ত্র ছিল আত্মরক্ষা। আমি

ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো' পড়েছিলাম। সেই দুঃসাহসী ইংরেজ সমুদ্রের অলঙ্ঘনীয় আহ্বানে আত্মীয়-স্বজনের উপদেশ অগ্রাহ্য করে জাহাজে চেপে বেড়িয়ে পড়েছিল, ভীষণ প্রভঞ্জন, পাহাড় প্রমাণ সমুদ্রের ঢেউ, বার বার জাহাজডুবি, লোকজন হীন আফ্রিকার দ্বীপে বছরের পর বছর কাটিয়েছিল। সেই অসম দুঃসাহসিক ভ্রমণ কাহিনী পড়ে বারে বারে দেহ রোমাঞ্চিত, মন ভীতচকিত হয়েছে আমার। আমি পরাধীন দেশের সবে মাত্র স্কুল পাশ করা তরুণ, বাবা আমার দরিদ্র স্কুল মাষ্টার। মা'র বছরে চারখানার বেশী শাড়ী জোটে না, অনেক আত্মীয়-স্বজন আমার পিতার সামান্য রোজগারের উপর নির্ভরশীল। আমি গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যাচ্ছি যেমন যায় সব ভদ্রঘরের ছেলেরাই, ভবিষ্যতের ডাকে। পরিষ্কার নয় সে ডাক, আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই পড়াশুনার পর কি আমি হব—শিক্ষক, না ডাক্তার, না উকিল! কলেজে পড়তে পারবো কিনা তাও নিশ্চিত নয়, যদিও মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস আমার বাবা ব্যবস্থা করবেনই। আমার যাত্রার মধ্যে নাটক নেই, কাহিনী নেই, শুধু আছে তরুণ বুকের দুরুদুরু ভয় মাখা স্বপ্ন, আর ছেড়ে-আসা মা-ভাইবোনদের জন্য ব্যথা। সঙ্গে রয়েছে পনের বছরের জীবনের বাড়তি প্রাপ্তি—উমেশবাবুর মুখে উচ্চারিত বৈষ্ণব পদাবলী, ঢাকার রমনার সেই (এখন) নাম ভুলে যাওয়া মেয়েটির বড় বড় চোখের চাহনি, শোভনার সপ্রতিভ হাসির ফোয়ারা। রয়ে গেছে, আমার লুকানো একেবারে একতরফা প্রেম, খুড়তুতো দিদি গৌরীর মধুর স্মৃতি।

আমি পিছুটান মানুষ নই, অতীত মন্থন নয় আমার স্বভাব। যে যায় সে যায়ঃ জীবন চলে, চলে, চলেঃ 'চরৈবেতি', বলেছেন উপনিষদের ঋষি। সুদূর, তুমি সুদূর, আমাকে পেছনে টেনো না, আমার কাছে তুমি অশান্ত নীরব অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, 'তরঙ্গ উঠে প্রাণে, দিগন্তে কাহার পানে / ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে, নাহি নাহি কথা।' গণেশপুর কোনোদিনও আমার মন থেকে নিশ্চিহ্ন হবে না আমি জানতাম। পরিণত বয়সে দেখেছি যে সব স্মৃতি ছায়াছবির মনের পর্দায় সবচেয়ে পরিষ্কার ভাবে গাঁথা রয়েছে, গণেশপুর তার মধ্যে প্রথম। কিন্তু গণেশপুর কখনও আমাকে পিছু ডাকে নি। দুবার আমি ফিরে এসেছি গণেশপুরে, পূজার সময়, দুবারই মনে হয়েছে আমি শেষ ত্রিশের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছি, যেখানে জীবনের প্রবাহ প্রবল, যেখানে পৃথিবী এসে মিশেছে, ক্ষীণ ধারায় বা স্রোতধারায়, আমার মত এক যুবকের জীবনেও। ইতিহাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সেই সময়, ভারতবর্ষে সুভাষ বসুর নেতৃত্ব নিয়ে কংগ্রেসে বিরাট আলোড়ন, অবহিত নেতাদের মনে বিরাট আতঙ্ক।

বহু মানুষের স্নায়ুতে সংগ্রামের নতুন প্রবাহধাক্কা দিচ্ছে য়ুরোপের রাজনৈতিক ঘটনাবলী। হিটলার আমাদের কমবেশী প্রিয়, কেননা তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ফরাসী শক্তির শত্রু। গণেশপুরে এ সব প্রবল ঘটনাপ্রবাহের সামান্য উত্তাপ আমি অনুভব করেছি। জেনেছি ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো, তাঁর তালগাছ-সম উঁচু শরীর ও বিরাট নাসিকা নিয়ে একমনে ভারতের গাভীকুলের সেবা করে যাচ্ছেন, গো-পালনই তাঁর মতে ভারতকে সবল করবে, স্বরাজের অনিশ্চিত সীমানার দিকে ধীরে আস্তে নিয়ে যাবে।

এই ইতিহাসের চৌমাথায় যখন ভারত ও পৃথিবী পৌঁচাচ্ছে, একটি বাঙ্গালী তরুণ অথবা প্রথম প্রবাহের যুবক, তার মাতৃভূমি, পনের বছরের মাতৃ-আশ্রয় গণেশপুর গ্রাম ত্যাগ করে চলল কলকাতার উদ্দেশ্যে, 'আমার অনেক পথ পাড়ি দিবার আছে, আছে অনেক অঙ্গীকার পালনের অপেক্ষায়'—কিন্তু পদ্মায় নদী একটুও বাড়ন্ত উচ্ছ্বাস দেখাল না। প্রকৃতি দেখালনা এতটুকুও বেশী চাঞ্চল্য। আমার বুকের স্বপ্ন ও আশা ভেসে গেল চোখের নোনা জলে।

॥ বার ॥

"হে জীবন, স্বাগতম! লক্ষ লক্ষ মানুষের মত আমিও চলেছি অস্তিত্বের বাস্তব পাহাড়, মরু, উপত্যকা, সমতলের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য তৈরী হ'য়ে। আমার আত্মার যাত্রাপালায় এবার আমাকে নিজের হাতে মানুষের উপযুক্ত বিবেক তৈরী করে নিতে হবে। হে বৃদ্ধ পিতা, হে প্রাচীন কারীগর, এখন এবং সর্বদা আমাকে সাহায্য করো।"

এই প্রার্থনা নিয়ে জেমস্ জয়েস তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা করেছিলেন—"শিল্পীর প্রতিকৃতি জনৈক যুবক"—"এ পোর্ট্রেট অব দ্য আরটিষ্ট এ্যাজ এ ইয়ং ম্যান"।

১৯৩৭ সালের তপ্ত গ্রীষ্মে সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করা পনের বছরের যে তরুণ গণেশপুর গ্রামের পদ্মাতট থেকে ডুগি নৌকায় চাঁদপুর রওয়ানা হয়েছিল গ্রাম জীবনের সুরক্ষিত মন্দগতি জীবন থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতার মত অচেনা অজানা এক মহাদানব শহরের উদ্বেলিত কোলাহলের মধ্যে বেঁচে থাকার পাথেয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, তার মুখে ঐ রকম কোনো বিপুল প্রার্থনা নীরবে উচ্চারিত হতে পারেনি। মা নদীতটে এসে বিদায়কালে আশীর্বাদ জানাতে না পারলেও তাঁর জলভরা চোখ ও হাসিভরা মুখ ছেলেটির বুকে নদীর তরঙ্গের মতই উচ্ছ্বলিত হচ্ছিল। পদ্মাতটে বিদায় দিতে সমবেত হয়েছিলেন আমার স্বজন ছাড়া জেলে পাড়ার প্রজাদের কয়েকজন। গ্রামের অধ্যয়ন শেষ হল, সে চলল এবার কলকাতায়, যেখানে দানব ও মানুষের সংঘাতী সহবাস। সেখানকার অজানা যন্ত্রে তৈরী হয়: হাজার হাজার গ্রামছাড়া মধ্যবিত্তের কিশোরের ভবিষ্যৎ। কলকাতা আমার কাছে অনেক কিছুর জটপাকানো অবাস্তব একটা প্রতিমূর্তি মাত্র। তার সামনে মানস চোখে দাঁড়াতে পর্যন্ত আমার হৃদয় ভীতকম্পিত। অথচ তার টানে আমাকে চলতেই হবে নৌকো, ষ্টীমার, রেল চেপে যতক্ষণ না তার অন্ধকার গহ্বরে ঢুকে পড়েছি আলোর সন্ধানে। যেটুকু আলো, যতটুকু আলো, ছিনিয়ে নেওয়া যায় সময়ের কৃপণ হাত থেকে।

নৌকা ছাড়ল। তখনকার দিনে বাই-বাই ক'রে বিদায় দেবার কায়দা ছিল না। আমি আমার ভাই-বোন, আত্মীয়দের ওপর নজর রেখেও দেখতে পাচ্ছিলাম বাড়ীর বাইরের ও ভেতরের পুকুর দুটোকে। জামরুল গাছ, সারি সারি নারকেল ও সুপুরী

গাছ, মানুষের পায়ে হাঁটা সরু সরু গ্রাম্য পথ, হাসনাহানা ভরতি সাদা ফুলের স্তবক, যার সৌরভে ভরে গেছে পুরো বাড়ীর বাতাস। আমার পড়বার ভাঙ্গা টেবিলের ওপর দেওয়ালের গা বেয়ে সুর সুর করে এগিয়ে যাওয়া মাকড়সা গাছ ছেয়ে গেছে বকুল ফুলে। দুর্গা মণ্ডপের দক্ষিণে এবং বাড়ীর ভেতরের উঠানের দক্ষিণ কোণে বিছানা পেতে রেখেছে ঝরা শেফালি।

বড় বড় আম-কাঠাল-সেগুন গাছের সারি সরে গেল আমার চোখের সামনে পদ্মা-তীরে। নদীর বুকে আরও কিছু নৌকা, জেলেরা জাল পেতে বসে আছে জোয়ারের অপেক্ষায়। আকাশ জুড়ে হালকা মেঘের খেলা। নদীর ঢেউ, আকাশ আমাকে নিয়ে যাচ্ছে পুরাতন থেকে নতুনে। কিন্তু আমার মনে কোনো প্রভাত পাখি গাইছে না। শুনতে পাচ্ছি সন্ধ্যেবেলা নীড়ে ফেরা পাখির গান। সারি সারি বক আকাশ সাঁতরে ঘরে ফিরছে। নিশ্চয়ই আমার গণেশপুরের বক এরা, এদের সঙ্গ ধরে আমারও ইচ্ছে করছে ফিরে যাই ঘরে, মা ভাইবোনদের নিশ্চিত পরিচিত সান্নিধ্যে। একই সঙ্গে মনের তারে ঝংকৃত হচ্ছে মার মুখে পুনঃ পুনরক্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা: "যাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন, হেরিব না দিক—গণিব না দিনক্ষণ"—তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পেরেছি, ভারত পথিক আমি নই। আমার দৃষ্টি ধাবিত অগ্রে ও পশ্চাতে, বন্ধন ক্রন্দন হ'য়ে আমার গলা চেপে ধরেছে, আমি এগোতে এগোতে যেন পিছে পড়ে যাচ্ছি, আমার পনের বছরের জীবন কিছুতেই অতীত হ'তে রাজী নয়। গণেশপুর, যার মাটিতে আমি জন্মেছি, কিছুতেই হতে চাইছে না ইতিহাস।

আমার যাত্রা নৌকা চেপে চাঁদপুর, বারো ঘণ্টার নদীপথ। চাঁদপুরে ষ্টীমার বন্দরে জাহাজ চেপে খুলনা। খুলনায় পিতৃদেব দুর্জয় সিংহের সঙ্গে তিন-চার দিন বাস ক'রে ট্রেনে চেপে শিয়ালদহ, অর্থাৎ কলকাতা। জীবনে এই আমার প্রথম একলা যাত্রা নয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার জন্য সুরেশ্বর থেকে একাই আমি মাদারীপুর গিয়েছিলাম। তথাপি এবারের একক যাত্রায় আমার নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হল। ডুগি নৌকায় আরও পাঁচজন যাত্রী সংগ্রহ করেছিল মাঝি। যারা সবাই গ্রামীন মধ্য বয়সী পুরুষ, তাদের সঙ্গে আমার একটাও বাক্যালাপ হল না। আমি খোলা আকাশের নিচে মাঝির কাছাকাছি আমার বিছানার ওপর ভর দিয়ে বসে রইলাম। আসার সময় একটা ছোট নতুন মাটির হাঁড়িতে মা খিচুরী দিয়ে দিয়েছিলো, তাই দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন হল। হাড়ির মধ্যে একটা বোতলে জল ছিল, তাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হলাম। নদীর তটভূমির কাছাকাছি চলছে নৌকো।

কয়েকবার দ্বিতীয় মাঝি তীরে নেমে গিয়ে 'গুণ' টানলো, অর্থাৎ নদীর সঙ্গে বাঁধা কঠিন দড়ি টানতে টানতে এগিয়ে গেল। দার্জিলিং বা সিমলার পথে ছোট পাহাড়ী রেলগাড়ীকে যেমন একসঙ্গে সামনে ও পেছন থেকে ইঞ্জিনের জোরে এগোতে হয়। নদী থেকে তীরে চলমান গাছ লতা গুল্ম। আকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলমান একের পর এক গ্রাম। কয়েকটি গ্রামে নৌকা থামলো। মাঝিরা একটু বিশ্রাম করল। আহার সারল। পুরানো যাত্রীরা তীরে নেমে গাছের আড়ালে প্রস্রাব করল। কাছাকাছি দোকান থেকে চিঁড়ে গুড় কিনে এনে নৌকায় বসে দুপুরের আহার সারল। দু একজন নতুন যাত্রী উঠলো নৌকাতে। এরাও যাবে চাঁদপুর।

চাঁদপুর জিলা শহর। এখানে রেল লাইন আছে। 'জাহাজে'র বন্দর আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য চাঁদপুরকে প্রাধান্য দিয়েছে। গণেশপুর গ্রাম যে জিলার অন্তর্গত তার নাম ফরিদপুর। গণেশপুর থেকে অনেক দূর। গণেশপুরের সঙ্গে কাঁচারী আদালতের সম্পর্ক মাদারীপুর মহকুমা শহরের। স্বরেশ্বর গ্রাম থেকে ষ্টীমারে চেপে আর এক মহকুমা শহর গোয়ালন্দে পৌছে, সেখান থেকে দশ বারো ঘণ্টার ট্রেন যাত্রার পর শিয়ালদহ, অর্থাৎ কলকাতা। তার মানে গণেশপুরের সঙ্গে জিলা ফরিদপুরের যোগাযোগ ছিল না বললেই হয়। আমি কোনোদিন দেখিনি গ্রামের কোনো লোক ফরিদপুর যাচ্ছে অথবা ফরিদপুর থেকে এসেছে। এর ব্যতিক্রম ঘটল একবার। গণেশপুরের ছাত্র-যুবকদের 'বিচারে' মহকুমা শাসক যে রায় দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে আপীল করতে হল ফরিদপুর জিলা শহরে সেস্‌নস আদালতে। ফরিদপুর নামটা গণেশপুরের মানুষদের মনে দাগ কাটল।

গোয়ালন্দে পদ্মার নাম কীর্তিনাশা। রাজবাড়ী গ্রামের রাজাদের প্রাসাদই শুধু নয়, কয়েকটা পাশাপাশি গ্রামকে গিলে নিয়েছে কীর্তিনাশা। ষ্টীমার থেকে রাজবাড়ীর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আমরা ভয় ও বিস্ময়ের চোখে দেখতাম। বর্ষায় এখানে পদ্মার কূল চোখে পড়ল না। সুবিস্তীর্ণ সমুদ্র সমান নদী। উত্তাল উন্মত্ত তার তরঙ্গ। বর্ষাকালে নদীতে ঝড় উঠলে বড় বড় ষ্টীমার কখনও কখনও জলের অতলে তলিয়ে যায়।

চাঁদপুরে যে বন্দরে আমাদের নৌকা এসে নোঙর ফেলল তার নাম মেঘনা। মেঘনা নদীর নাম আমরা ভূগোলে পড়েছিলাম। চোখে দেখলাম এই প্রথম। পদ্মা যেমন উচ্ছল উদ্বেলিত, মেঘনা তেমনি শান্ত। পদ্মার জল হলদেটে সাদা। মেঘনার

ঘন কৃষ্ণবর্ণ। যেন সব সময় আকাশজোরা মেঘের ছায়া বুকে ধ'রে চলেছে মেঘনা ধীর গতিতে, স্থির মনে।

মাঝি আমাকে নির্দেশ দিয়ে দিল বন্দরে কোথায় দাঁড়াতে হবে। ষ্টীমার আসতে এখনও দু ঘণ্টা দেরী, কোথায় কোন গবাক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হবে, এবং ক্ষিধে পেলে কোন্ রেস্তোরায় মাছ-ভাত পাওয়া যাবে।

ষ্টীমারটা বেশ বড়-সড়। যে জাহাজটা করে মাদারীপুর গিয়েছিলাম তার তুলনায় সত্যিকারের জাহাজই মনে হল আমার। আরও অনেক যাত্রীর সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে কেবিন ঘরগুলির কাছাকাছি ডেকের ওপর আমি বিছানা পেতে নিলাম। কেবিনের যাত্রীরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর কেবিন দোতলায়, লোহার জাল দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা নিয়ে। কেবিন কতগুলি আমি জানতে পারিনি, তবে দেখলাম তাদের বাইরে বেশ বড় একটা লাউঞ্জ তৈরী করেছে, ফুলের, সবুজ গাছের টব দিয়ে সুসজ্জিত। কয়েকটি টেবিলের ওপর সিগারেটের কেস, এক একটিতে ফুলসহ ফুলদানি, পাটের কার্পেট দিয়ে মেঝে আবৃত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। লাউঞ্জে বেতের চেয়ার টেবিল, মেঝেয় সতরঞ্চি।

জাহাজের বাকী সবটাই ডেকযাত্রী ও কর্মচারীদের জন্যে।

দোতলা থেকে সরু লোহার সিঁড়ি বেয়ে তেতলা অর্থাৎ ছাতে উঠলে সারেঙ্গ সাহেবের ঘর। সারেঙ্গ মানে জাহাজের ক্যাপ্টেন। নৌ-সেনাদের মত ধবধবে ফর্সা না হলেও সাদা পোষাক তার। মাথায় কালো ফিতে দিয়ে ঘেরা সাদা টুপি। হাতে একটি ছোট্ট বেতের লাঠি—ক্যাপ্টেনের বেটন। সারেঙ্গের ঘরে বড় কম্পাস, দেওয়ালে যাত্রা পথের নক্সা, অনেক দেব-দেবতার ছবি, কয়েকটি স্ত্রীলোক ও পুরুষেরও। আমি অনুমান করে নিলাম সিনেমার অভিনেত্রী অভিনেতাদের। যদিও তখনও সিনেমা আমার দেখা হয়নি। কম্পাসের বুকে ঝোলানো রয়েছে মা কালীর ছোট ছবি। সারেঙ্গ এই ছবির মাধ্যমে দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে নদী পাড়ি দেয়, ঝড় উঠলে শরণ নেয় দেবীর চরণে।

জাহাজ নোঙর তোলার আগে সারেঙ্গ সবকিছু পর্যবেক্ষণ ক'রে গেল। একটি প্রথম শ্রেণীর কেবিনের গায়ে বিছানা পেতে মোটা লোহার বেড়ার ওপর শরীর রেখে আমি নদী দেখছিলাম। সারেঙ্গ একসময় এসে আমার পাশে দাঁড়াল, আমি সসম্ভ্রমে সেলাম দিলাম।

আমার বিছানার ওপর নজর রেখে সারেঙ্গ প্রশ্ন করল, "এটা আপনার ?"

প্রশ্ন করল ইংরেজীতে, আমি হকচকিয়ে গেলাম।

জবাব দিলাম, "ইয়েস স্যার।"

সারেঙ্গ আমার নাম জানতে চাইল। আমি বললাম।

এবার সারেঙ্গ বঙ্গভাষা ব্যবহার করতে লাগলো, "কোথায় যাবেন ?"

—"খুলনা।"

—"কলেজে পড়তে ?"

—"আপনি কি করে বুঝলেন আমি কলেজে পড়তে যাচ্ছি!" আমার কৌতূহলে সারেঙ্গ হেসে ফেলল।

—"প্রতিদিন শত শত যাত্রীদের মুখ দেখি, চেহারা দেখি, এখন আন্দাজ করতে পারি কে কোন শ্রেণীর মানুষ। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি স্কুল পাশ করেছেন, তাই কলেজে পড়তে যাওয়াটা স্বাভাবিক।"

—"আপনার দৃষ্টি খুব গভীর। সব সময় নদীর শেষ প্রাপ্ত পর্যন্ত দৃষ্টি রেখে জাহাজ চালাতে হয় আপনাকে।"

—"নদীর ওপর নজর রাখাই শুধু নয়, যাত্রীদের উপরও নজর রাখতে হয়। ওপরে আসবেন আমার ঘরে, কি করে জাহাজ চালাতে হয় দেখতে পাবেন।"

অতি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, "নিশ্চয়ই যাবো।"

—"কোথা থেকে আসছেন ?"

—"গণেশপুর থেকে।"

—"আপনাদের গ্রামের জমিদার বাড়ীর চারজন যাত্রী যাচ্ছেন ফার্স্ট ক্লাসে। ঐ যে বজরা দেখছেন, ওতে ক'রে এঁরা চাঁদপুর এসেছেন।"

—"জমিদার বাড়ীর কাউকে আমি চিনি না।"

—"চেনবার কথাও নয়, ওঁরা নিজেদের খুব মাতব্বর মনে করেন। বলেন, ওঁদের দেহে খাঁটি আরব রক্ত। বাংলা বলেন না, বলেন উর্দু।"

—"আমাদের স্কুলের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন জমিদার বাড়ীর একজন। চোখ টেরা, দাড়ি বেশি লম্বা নয়, ভীষণ মোটা। তাঁর নাম জানা নেই আমার। বক্তৃতা করেন ইংরিজীতে।"

—"এঁরা যাচ্ছেন খুলনা হয়ে কলকাতায়।"

—"আমিও তাই।"

—"তাহলে খুলনায় আপনি পড়ছেন না। আছে কেউ ওখানে? না-কি জাহাজ বন্দর থেকে সোজাসুজি রেলষ্টেশনে চলে যেতে হবে আপনাকে?"

—"আমার বাবা খুলনায় বাস করেন। তাঁর কাছে তিন-চার দিন থেকে কলকাতায় যাবো।"

—"এঁরা কেন যাচ্ছেন জানেন?" সারেঙ্গ প্রশ্ন করল প্রথম শ্রেণীর কেবিনের ওপর নজর রেখে।

—"কেন?"

—"আপনি দেখছি দেশের কোনো খবরই রাখেন না। এটা ১৯৩৭ সাল। নির্বাচন হয়ে গেছে প্রত্যেক প্রদেশে। বঙ্গদেশেও। এঁরা মুসলীম লীগের নেতা। কলকাতায় পার্টিদের মধ্যে আলোচনা হবে মুসলীম লীগের রাজনীতি। প্রধান দল তো কংগ্রেস।"

—"আপনি কি মুসলমান?"

—"না, আমি হিন্দু। মাখনলাল সরকার আমার নাম। চট্টগ্রামে আমার বাড়ী।"

সারেঙ্গদের অধিকাংশই মুসলমান। জাহাজে যারা কাজ করে, তারাও মুসলমান। চট্টগ্রাম নোওয়াখালির মানুষ। কিছু আসে ওড়িষা থেকে।"

—"আর একজন নেতাও এই জাহাজেই যাচ্ছেন। প্রথম শ্রেণীতে। কিন্তু গণেশপুরের জমিদারদের তিনি শত্রু।"

—"কি নাম তার?"

—"ফজলুল হক। শুনেছেন নামটা?"

—"শুনেছি, উনি তো মুসলিম লীগের নন!"

—"মোটেই নন। উনি কৃষক প্রজা পার্টির। জবরদস্ত নেতা। চাঁদপুর এসেছিলেন সভা করতে। নোঙর তোলার আগে এঁরা চারজন জাহাজে উঠবেন। এখন বন্দরে আমাদের আপিসের গেষ্টরুমে অপেক্ষা করছেন ফজলুল হক। গণেশপুরের জমিদাররা বজরাতেই থাকবেন। নোঙর তোলার আগে আমাদের লোক তাঁদের নিয়ে আসবেন জাহাজে।"

সারেঙ্গ তার পরিদর্শনের কাজে চলে গেল। একজন অনেকজানা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পেরে আমারও খুব ভাল লাগল। আমিও আমার নিজের জাহাজ পরিদর্শনে লেগে গেলাম। দোতলা থেকেই দেখতে পাওয়া যায় জাহাজের পাওয়ার

হাউস, একটা বিরাট গহ্বরে প্রচণ্ড জোরে চাকাগুলি ঘুরতে থাকে। নদীর জল কেটে ইঞ্জিন জাহাজকে এগিয়ে নেয় গন্তব্যের দিকে। দোতলা ডেকের ভাড়া একটু বেশি। বেশিরভাগ যাত্রীই হয় মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের লোক, নয়ত শিক্ষিত গ্রামীণ ব্যবসাদার। প্রত্যেক যাত্রী ও যাত্রীযূথ নিজেদের বিছানা পেতে নিয়েছে, কোণে সরিয়ে রেখেছে আহার্য। অনেকে নদী দেখছে, অনেকে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত, কেউ কেউ চুপ চাপ বসে রয়েছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা করছে ছুটোছুটি। বাতাস বইছে, নরম স্নেহময় বাতাস, পূর্ববঙ্গের গ্রীষ্মকে যে বাতাস সহনীয় ক'রে রাখে। পেট্রোল, কেরোসিন, মাছ, শাকসব্জি, এখানে ওখানে কোণে কোণে জমানো জঞ্জাল, পঁচা ইঁদুর, একরাশি ছাগল—সবকিছুর মেশান বিচিত্র গন্ধ বাতাস বহন করছে। জাহাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার নিয়ম যদি বা থাকে, গরজ নেই কারুরই। মেঝের উপর আরশোলা, ইঁদুর, শুঁয়োপোকা দিব্যি বিচরণ করছে। এরা সব সময়ের যাত্রী। নদীপথ চলাতেই এদের আনন্দ। এই চাঁদপুরের চরাচরে গ্রীষ্মের তীব্রতা মানুষ উপেক্ষা করে। শব্দহীন উদার স্তব্ধতার দিনও এখানে অনুপস্থিত। এখানে তৃণে, বৃক্ষে, কুটিরে, জনপদে, নদীর বুকে এবং নদীতটে জীবনের প্রথম কল্লোল কলরব আমি শুনতে পেলাম।

নিচের ডেকে নেমে এসে দেখলাম গ্রামের কতকিছু সম্পদ চলে যাচ্ছে শহরে—বস্তা বস্তা চাল, সবজী, মশলা, পাটের কাপড়ে জড়ানো ঝুরি ঝুরি মাছ। একপাল ছাগল, শতশত মুরগী, বস্তা বস্তা আম। তখনও নদীপথেই দেশের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হত গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে। রেল লাইনের প্রসারতা তখনও সংক্ষিপ্ত। মালগাড়ী চলত কচ্ছপগতিতে। কিন্তু গ্রামের মানুষ তার মাটির, জলের ও গৃহশিল্পের উৎপন্ন শহরে চালান না করলে উপবাসী থাকতে বাধ্য। গণেশপুরে তিনটি জেলেকেও দেখতে পেলাম একতলার ডেকে। এরা ইলিশ মাছ চাঁদপুরের পাইকিরী খদ্দেরদের কাছে না বেচে খুলনা পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে ভাল দামের আশায়। খুলনায় বাবার কাছে ক'দিন কাটিয়ে কলেজে পড়তে যাচ্ছি কলকাতায়। শুনে তারা গর্বিত, উচ্ছ্বসিত। গ্রামের মানুষের হৃদয় নদীর মতোই উচ্ছল।

তীরে একসময় কিছুটা উত্তেজনা দেখা গেল। জমিদারদের বজরা জাহাজের সঙ্গে লেগেছে। বিশেষ পাটাতন পড়েছে জাহাজ ও বজরার মধ্যে। তার উপর দিয়ে পর পর চারজন পুরুষ চলে এলেন ষ্টীমারে। জাহাজ কোম্পানীর মালিক ও সারেঙ তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে ওপরে প্রথম শ্রেণীর কেবিনে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন দেহরক্ষী,

তাদের হাতে বড় বড় দুটো ব্যাগ, নিশ্চয়ই খাদ্যে-আহার্যে ভরা। তিনটে কুলি ছ'টা কাঠের ট্রাঙ্ক মাথায় ব'য়ে নিয়ে এলো। প্রত্যেকের হাতে এক একটা বড় চামড়ার ব্যাগ।

গণেশপুর জমিদারদের দেহের বর্ণ, আমার চোখে, সাহেবদের মতো ফর্সা, প্রত্যেকের শরীর বিপুল। ক'টা চোখ, পরণে আচকান ও চুড়িদার পাজামা, মাথায় টুপি।

কয়েক মিনিট পরে আর একজন মুসলমান, কিছু মুসলমান ও কতিপয় হিন্দু দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে এলেন। আমি অনুমান করলাম ইনি ফজলুল হক। সাধারণ বাঙ্গালীর তুলনায় দীর্ঘ দেহ, মেদবাহুল্যহীন, মুখে দাড়িগোঁফ নেই, পরণে পায়জামা ও হাঁটুর নিচে নেমে আসা আচকান। সাধারণ মুসলমানের ব্যবহৃত ইসলামী টুপী। তফাৎ শুধু তাঁর ফর্সা রং। ফজলুল হকের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের সুযোগ পরে আমার একবার হয়েছিল। এখন দূর ও অনেকটা কাছাকাছি দেখে মনে হল গ্রামের কোনো বড় চাষী অথবা স্কুলের মুসলমান শিক্ষক।

ফজলুল হক বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী হবেন, অনেকে বলেছিল।

১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হয়েছিল। গণেশপুর গ্রামের সিনীয়র ছাত্র হিসেবে আমরাও অনুভব করেছিলাম। কংগ্রেস প্রথমে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীজির নেতৃত্বে তাকে পুরোপুরি বর্জন করেছিল। এই আইনের ছিল দুটো অংশ। প্রথম অংশে ভারতবর্ষকে একটা ফেডারেশন রাষ্ট্রে পুনঃগঠনের ব্যবস্থা। ফেডারেশনের প্রস্তাব কংগ্রেস ও লীগ দুই-ই প্রত্যাখ্যান করলে ইংরেজ সরকার প্রাদেশিক 'গণতন্ত্র' উদ্বোধনের উদ্যোগ নিলেন। কংগ্রেস প্রথমে অনেক নেতিবাচক হুংকার দেবার পর প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে রাজী হয়ে গেল।

বঙ্গদেশে কংগ্রেস বরাবরই দলীয় বিভাগে দুর্বল। নির্বাচনের সময় শরৎ বসু সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সুভাষ বসুর অস্ফুট সম্মতি নিয়ে প্রস্তাব করেছিলেন কংগ্রেস ও ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি একত্র হ'য়ে নির্বাচন লড়ুক। এই কোয়ালিশন যদি কংগ্রেস কর্তারা মঞ্জুর করতেন তাহলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পথ অন্যরকম হত। মুসলীম লীগ ছিল নবাবজাদা বড় জমিদারদের দল। তার নেতা মহম্মদ আলী জিন্না বোম্বাইয়ের ধনী ব্যারিষ্টার, যাঁর জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিলিতি। ফজলুল হক ছিলেন বঙ্গের চাষীসমাজের

প্রকৃত প্রতিনিধি। লীগে তিনি সামিল হ'তে চাননি। তাঁর নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি পূর্ববঙ্গে বলিয়ান হ'য়ে উঠেছিল। ফজলুল হক তৈরী ছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে নির্বাচন লড়তে এবং জয়লাভের পরে যৌথ সরকার গঠন করতে। ফজলুল হকের দলকে যদি কংগ্রেস মিত্রতার সুতোয় বাঁধতে পারতো তাহলে মুসলীম লীগের গণ সমর্থন প্রসারিত হ'তে পারত না।

শরৎ বসুর প্রস্তাব বঙ্গ কংগ্রেসের অন্যান্য উপদলীয় নেতারা একসঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন। গান্ধী-নেহেরু হাই কমাণ্ড কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা দলের নির্বাচনী ঐক্যে অনুমতি দেন নি। নির্বাচনে কংগ্রেস মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, (তখনকার সি-পি-ও বেরার)। বিহার ও ওড়িষ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল।

প্রাদেশিক নির্বাচনে ভোটারদের সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছিল। অনেক মহিলারাও ভোটের অধিকার পেয়েছিলেন।

বঙ্গপ্রদেশে ২৪০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৬০টি। মুসলীম লীগও সুবিধে করতে পারেনি।

গণেশপুরেও একটি ভোট কেন্দ্র খোলা হ'য়েছিল। আমাদের স্কুলেই দশম শ্রেণীর ঘরে।

সবচেয়ে সন্নিকট থানা ভেদেরগঞ্জ। গণেশপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে।

থানা থেকে বড় দারোগা সাহেব নিজে এসেছিলেন শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে। সঙ্গে এনেছিলেন তিনটে বন্দুকধারী পুলিশ।

মহকুমা মাদারীপুরের জুনিয়র ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হ'য়েছিলেন রিটারনিং অফিসার।

আমরা দশম শ্রেণীর ছাত্ররা তখনও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দি' নি। তখনও তিনমাস বাকী।

আমরা দলবেধে ভোট দেওয়া দেখতে গিয়েছিলাম।

খুব আবছা ছায়া আমার স্মৃতিপটে এখন ঐ বিশেষ ঘটনার। শুধু মনে আছে, ভোট দিতে আসেনি বেশি লোক। হয়ত ভোটের অধিকারই খুব কম লোকের ছিল। যারা এসেছিল তাদের বেশিরভাগ মুসলমান। তাদের আসতে হয়েছিল জমিদারদের পেয়াদাদের ভয়ে।

একজন স্ত্রীলোককেও ভোট দিতে দেখিনি আমরা।

গণেশপুর গ্রামের বর্ণহিন্দুরা ভোট দেয় নি। তারা এই নির্বাচনটাকে ইংরেজের

সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের আপোষনীতি বলে ধ'রে নিয়েছিল। গণেশপুরের যুবকদের সন্ত্রাসবাদের মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার, বিচার, সাজা এবং মুক্তির কাহিনী তখনও গ্রামবাসীদের স্মৃতিতে সুস্পষ্ট।

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লীতে, এ. আই. সি. সি.-র দুদিন ব্যাপী গরম অধিবেশনের সময় আমি মাদারীপুরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিচ্ছি।

মহকুমা শহর, তাছাড়া উপরাজনীতির সহর মাদারীপুর। দিল্লীর অধিবেশন নিয়ে বহু মানুষের বিরাট ঔৎসুক্য। দু দিন ধরে যে প্রশ্নটি নিয়ে উষ্ণ উষ্ণতর তর্ক বিতর্ক হল তা হচ্ছে: নির্বাচন জিতেও কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে সরকার গঠন করবে কিনা।

নেহেরু, সুভাষ ও বাদবাকীদের মত: কংগ্রেস সরকার গঠন করবেন না। করার মানে হবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করা। বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নরমপন্থী নেতাদের পাল্টা প্রস্তাব: কংগ্রেস সরকার তৈরী করবে! ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করবে সরকারের মধ্য ও বাইরে থেকে।

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন 'নিরপেক্ষ'। তাঁর আপোষ প্রস্তাব সবশেষে এ. আই. সি. সি-তে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছিল।

একটা শর্ত কংগ্রেস সরকার আরোপ করেছিল: মন্ত্রী মণ্ডলের কাজ কর্মে গভর্ণর হস্তক্ষেপ করবেন না। বৃটিশ সরকার ও ভাইসরয় লিনলিথগো শর্তটা মানতে রাজী হন নি। কংগ্রেসও মন্ত্রী সভা গঠনে রাজী হয়নি। অবশেষে লর্ড লিনলিথগো একটা অপরিচ্ছন্ন, কূটনৈতিক, বিবৃতিতে কংগ্রেসকে ভরসা দিয়েছিলেন যে গভর্ণরগণ "সাধারণত" মন্ত্রীমণ্ডলীর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ক্ষমতার দরজা সামান্য একটু উন্মুক্ত হলো, আর সেই আংশিক উন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়ে কংগ্রেসীরা সুব সুর ক'রে সহযোগিতার পথে ঢুকে পড়লেন।

এসব ঘটনা নিয়ে মাদারীপুর, এমন কি গণেশপুরেও, তপ্ত আলোচনা হত। সবটা আমি বুঝতে পারতাম না। স্কুল লাইব্রেরীতে 'ষ্টেটসম্যান' আসত, তার পুরোনো সংখ্যা পড়ে নিতাম।

ফজলুল হক এরমধ্যে আমার মতো গ্রাম্য তরুণের কাছেও বড় হ'য়ে উঠেছিলেন কি করে?

বড় হয়েছিলেন এ জন্তে যে তিনি সহজে মুসলীম লীগে যোগ দিতে চাননি। শরৎ বসু কংগ্রেসের হাই কমাণ্ডের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন ফজলুল হকের কৃষক প্রজা

পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে কোয়ালিশন মন্ত্রীত্ব তৈরী করতে। তা হতে পারলে ফজলুল হক লীগকে জন-সমর্থন জুগিয়ে দিতেন না। অন্তত বঙ্গদেশে লীগের প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকতো।

হাই কমাণ্ড অনুমতি দেননি।

এইখানে বলে রাখি, উত্তরপ্রদেশে যদি কংগ্রেস মুসলীম লীগকে সরকারের শরিক ক'রে নিত, বঙ্গপ্রদেশে যদি কংগ্রেস-কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রীত্ব হত, তাহলে দশবছর পর ভারত হত না বিভক্ত।

ইতিহাসের "যদি"-গুলি সর্বদা রহস্যময়।

যে ফজলুল হকের কথা অনেক শুনেছি, কিছুটা সংবাদপত্রেও পড়েছি, তাঁকে চোখের সামনে সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের দোতলায় উঠে যেতে দেখতে পেয়ে বেশ গর্ব বোধ ক'রেছিলাম। তিনি তখনও লীগে যোগদান করেন নি। তিন-চার বছর আরও সময় দিয়েছিলেন কংগ্রেসকে। কংগ্রেস অবশ্যই সে সময়ের সুযোগ নেয় নি।

জাহাজ ছাড়তে সূর্য অস্তগামী হ'য়ে গেল। আকাশে বেশি মেঘ জমে নি। নদী শান্ত। অস্তরাগ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশ জুড়ে। মেঘের ওপর মেঘে সাত-রং এর অপূর্ব খেলা। সারা আকাশ হালকা আবীরে ছেয়ে গেছে। আমার মনে গুঞ্জিত হল রবীন্দ্রনাথের 'দিনান্ত' কবিতার কয়েকটি লাইন। যে পংক্তিগুলি এই তিন-কুড়ি-দশ বয়সেও আমার মনে ধ্বনিত হয়। জীবনকে যে কোনও মানুষ গভীর প্রেমে আলিঙ্গন করেছে, জীবনকে দিয়েছে দেহ মন উজার করে, জীবন থেকে পেয়েছে আনন্দ-বেদনা-মিলন-বিরহ-সৃষ্টি-বিনাশের ঐক্যতান সঙ্গীত, তার মনে দিনান্তে এ প্রশ্ন আসবে, আসবেই :

যাবার আগে সবই যেন আমায় ডেকেছিলে কেন
আকাশ পানে নয়ন মেলে শ্যামল বসুমতী—
কেন নিশার নীরবতা শুনিয়েছিল তারার কথা—
পরানে ঢেউ তুলেছিল কেন দিনের জ্যোতি।
তোমার কাছে আমার এই মিনতি।

॥ তের ॥

চাঁদপুর থেকে খুলনা বন্দর হয়ে গঙ্গা পর্যন্ত প্রবাহিত যে নদী তার নাম একটি নয়, দুটি। নদী কোথায় কি কারণে নাম বদলায় ভৌগলিকরা তা বিশেষ ভাবে জানেন। আমার কাছে চিরবিস্ময়, গঙ্গা কেন পদ্মা হল? মেঘনা হল ভৈরব? মেঘনার মেঘছায়া জল পেরিয়ে জাহাজ যখন ভৈরবের স্বচ্ছ স্থির জলে পৌছল, আমি তখন নিদ্রিত। আমার ডেকের মেঝের ওপর বিছানো সতরঞ্চির ওপর, বিছানার বাকী অংশকে বালিশ তৈরী ক'রে নিয়ে। গণেশপুর ছাড়বার সময় জ্যেঠামশাই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, নিজের মালপত্রের ওপর সর্বদা নজর রাখবি। ষ্টীমারে সর্বদা চুরি হয়। মালপত্র ছেড়ে কোথাও যাবি নে।

আমি অবশ্য সে উপদেশ মানি নি। আমার পার্শ্ববর্তী মধ্যবয়সী স্বামী-স্ত্রী তাঁদের বিছানা ক'রে নিয়েছিলেন। আমিই এগিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। আশ্বস্ত হয়েছিলাম জানতে পেরে যে এঁদের গন্তব্যস্থানও খুলনা। আমি সদ্য স্কুল পাশ করে কলকাতা যাচ্ছি কলেজে পড়তে। পথে পিতৃদেবের সঙ্গে খুলনায় কয়েকটা দিন থাকব জেনে এঁরা খুশি হয়েছিলেন। আমার বাবাকে এঁরা চিনতেন না, কিন্তু খুলনা বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ভদ্রলোক খুলনা মিউনিসিপ্যালেটিতে কাজ করেন। এঁদের গ্রামীণ দেশ পালং।

ভদ্রলোকের নাম বিপিন সরকার। স্ত্রীকে সম্বোধন করেন, "ওগো, শুনছো?" ইত্যাদি বলে। অতএব আমার কাছে মহিলার নাম "ওগো, শুনছো!"

বিপিন সরকার মহাশয়ের মাথাজোড়া টাক, কানের ওপর, ঘাড়ের ওপর সামান্য কয়েক হাজার কাঁচাপাকা চুল। সরু কপাল, ক্ষুদ্র চোখ গভীর গর্ত থেকে জ্বলজ্বল করে তাকায়। যেন দুটি অনির্বাণ জোনাকি। গাল চুপসে গেছে। গালের হাড় চোয়ালের হাড়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। পাঁচফুট ছ'ইঞ্চির বেশি লম্বা নন। শরীর জানিয়ে দিচ্ছে মহাশয়ের পেটের গোলমাল। সরু সরু হাড়াল হাতের আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলিতে গুচ্ছ গুচ্ছ ধূসর চুল।

"ওগো শুনছো" কিন্তু বেশ ভারী মহিলা। স্বামীর চেয়ে দৈর্ঘে কিঞ্চিৎ বেশি। দেহ বিপুল, তাই বেঁটে দেখায়। গোলগাল মুখখানার বড় অলংকার সোনার নাকছাবি

নয়। সরল বহমান হাস্য। কথা বলতে গেলে হাসেন মহিলা। সে হাসি পরকে কাছে টেনে নেয়। দুহাতে মোটা সোনার বালা, দু'গুচ্ছ সোনার চুড়ি, গলায় সোনার হার ও কানে বড় বড় সোনার মাকড়ি। দেখে মনে পড়ল গণেশপুরে ফেলে আসা আমার মার হাতে শুধু একজোড়া শাঁখা ও একটা লোহা, তাঁর যেটুকু বিয়েতে পাওয়া গয়না ছিল, চোরের হাতে তার সবটুকু গেছে।

মনে পড়ল, মাকে আমি বলেছিলাম, মা, আমি বড় হ'য়ে তোমাকে নতুন গয়না ক'রে দেব।

এখন মনে পড়ছে আমি তা করিনি। মাকে কোনো গয়না তৈরী ক'রে দিই নি আমি।

সরকার দম্পতির সঙ্গে আমার খুব সহজে আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। মহিলা আমাকে মা-ছাড়া কাতর একটি তরুণ যুবক হিসেবে দেখে ফেললেন। আমার সঙ্গে তখনও রাত্রের আহার লুচি-তরকারী ছিল। একরকম জোর করেই সদ্য তৈরী 'মাসিমা' আমাকে তরকারী, বেগুনভাজা ও রসগোল্লা খাওয়ালেন। বললেন, তিনি বরিশালের গ্রামের মেয়ে। এখনও দু তিন বছরে একবার বাপের বাড়ী যান স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। 'মাসীমা'র বাবা প্রয়াত হয়েছেন, কিন্তু বৃদ্ধা মা এখনও জীবিত, দুই ভাই ও তাদের সংসার রয়েছে। পাঁচ ভাইপো ভাইঝি স্কুল কলেজে পড়ে। বাপের বাড়ীতে এখন তাঁর প্রচুর আদর। 'মাসিমা' এও বলে ফেললেন তাঁর নতুন তৈরী বোন-পো'কে, বিয়ের সময় তাঁর আশা ছিল স্বামী একদিন বড় অফিসার হবেন, অনেক টাকা মাইনে পাবেন। খুব স্বচ্ছল অবস্থায় জীবন কাটবে তাঁর ঘরভরা কোলভরা ছেলে-মেয়ে নিয়ে। ভাগ্যে না থাকলে আম গাছও নিষ্ফল হয়ে যায়। তাঁর স্বামীর যোগ্যতার অভাব ছিল না মোটেই, বি. এ. পর্যন্ত পাশ করেছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালেটির চেয়ারম্যানের কুনজরে পড়ে কেরানীই রয়ে গেলেন। রিটায়ার করার সময় বড়জোর হেডক্লার্ক হবেন। ভগবানের আশীর্বাদ না থাকলে জীবনে কিছুই পাওয়া যায় না। ভগবানের ইচ্ছে, তাই তাঁকে নিঃসন্তান থাকতে হয়েছে। সারাদিন একা একা ঘরকন্না করতে করতে মাঝে মাঝে জীবনে ঘেন্না ধরে যায়।

সব দুঃখের কথা বলবার সময়ও 'মাসিমা'র মুখের হাসি নিভে যায় নি। সন্তান-হীনতার কথা বলবার সময় চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল, কিন্তু মুখের হাসিটি মিলিয়ে গেল না।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে আমি বললাম, "আমি ওপরে গিয়ে সারেঙ সাহেবের

সঙ্গে দেখা ক'রে আসছি। উনি বলেছেন, কি করে নদীর বুকের ওপর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হয় বুঝিয়ে দেবেন। আপনি আমার বিছানার ওপর একটু নজর রাখবেন, মাসিমা? আমি বেশি দেরী করব না।"

মাসিমা বললেন, "ওপরে যাবে? ভয় করবে না? চারিদিকে তো শুধু জল আর গভীর অন্ধকার। সারেঙ্গ ছাড়া দ্বিতীয় মানুষ নেই।"

আমি হেসে বললাম, "না, মাসিমা, ভয় করবে না। সারেঙ্গের নিমন্ত্রণেই যাচ্ছি।"

সরকার মশাই দেখলাম খুব কম কথা বলেন। এতক্ষণ কথাবার্তা হচ্ছিল 'মাসিমা' আর আমার মধ্যে। সরকার মশাই শুনছিলেন কি না তাও বুঝতে পারছিলাম না। যখন 'মাসিমা' তাঁর স্বামীর পদোন্নতির অভাব ও সন্তানহীনতা নিয়ে দুঃখ করছিলেন, তখনও তাঁকে উদাসীন মনে হচ্ছিল।

এবার তিনি মুখ খুললেন।

—তুমি ভবিষ্যতে কি হবে? ম্যাট্রিকে কেমন রেজাল্ট করেছ?"

আমি বললাম, "মন্দ নয়, ভালোই বলতে হবে। প্রথম বিভাগে পাশ করেছি।"

—"লেটার টেটার কিছু পাওনি?"

—"পেয়েছি। তিনটে বিষয়ে।"

—"জিলা স্কলারশিপ পেয়েছ? 'স্টার' পেয়েছ?"

—"না, দুটোর একটাও পাইনি।"

—"ভবিষ্যতে কি করবে? মাষ্টারী, না ওকালতি?"

আমি বললাম, "জানি না। সে তো অনেক দূরের ব্যাপার। কোনও আইডিয়া নেই আমার।"

—"তোমার বাবা তো স্কুলের মাষ্টার?"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

—"কত আর মাইনে পাবেন। চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা হবে।"

আমি চুপ করে রইলাম।

—"একটা পরামর্শ তোমাকে দিয়ে রাখি, ভারত সরকারের সেক্রেটারিয়েটে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পদের জন্য পরীক্ষা হয় প্রতি বছর। পঞ্চাশ থেকে একশ চাকুরী খালি থাকে। খুব ভাল চাকরী। আমি ঐ পরীক্ষা না দিয়ে যে বোকামী করেছি তার ফল সারা জীবন ভোগ করছি। তুমি নিশ্চয় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পরীক্ষা দিও। ফেডারেল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা নেয়। লেখাপড়ায় ভাল, তোমার হয়েও যেতে পারে।"

আমি বললাম,, "মনে থাকবে আপনার উপদেশ, মেশোমশাই।"

সরকার মশাই বললেন, "তোমার মাসিমা দশ মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় ডুবে যাবেন। আমি জেগে থাকবো। আমার নিদ্রা আসে না সহজে। আমি নজর রাখবো তোমার বিছানার ওপর। তুমি সারেঙ্গের কাছ থেকে ঘুরে এসো। সাবধানে কথাবার্তা বোলো। সারেঙ্গরা সাধারণত চট্টগ্রাম, নোয়াখালির লোক। ওদের দেহে পর্তুগীজরক্ত। যাকে আমাদের দেশে বর্গী বলা হয়। এ সারেঙ্গটা ভাগ্যক্রমে হিন্দু। বেশির ভাগই ওরা মুসলমান। খুব চড়া মেজাজ। খুন খারাবিতে পরোয়া নেই। বেশিক্ষণ থেকো না। চলে এসো তাড়াতাড়ি।"

আমি "যে আজ্ঞে" বলে সরু লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেলাম। সত্যিই জাহাজের প্রকাণ্ড ছাদের চারিদিকে কেবল জল আর গভীর অন্ধকার। হঠাৎ মনে হলো, জল ও অন্ধকারের সঙ্গে আমি মিশে গেছি, হারিয়ে গেছি, আকাশ স্বচ্ছ, অসংখ্য তারা তাকিয়ে দেখছে বসুন্ধরাকে। কেউ মিটিমিটে চোখে, কেউ বা জলন্ত দৃষ্টিতে। মেঘনা পেরিয়ে কখন জাহাজ ভৈরবে পড়েছে জানতে পারিনি। ভৈরব নদী পদ্মার তুলনায় অনেক সরু, দু'পাশের গাছগুলি অন্ধকারে গা ঢেকে জাহাজের চোখের ওপর পিছে স'রে যাচ্ছে। নদীর জল ও গাছপালার মিশ্রিত গন্ধ উঠে আসছে বাতাসের সঙ্গে। তরঙ্গহীন ভৈরব। শুধু জাহাজের জল কাটার শব্দ নিঃশব্দ স্তব্ধ অন্ধকারের সঙ্গে সখ্যতার আলাপ করছে। ভৈরবে পদ্মার মতো নদী ও জাহাজে লড়াই নেই। বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে 'এক বাণী মধুর অর্থ ভরা।'

জাহাজের ছাদে সারেঙ্গের ঘর। আমি দরজার সামনে দাঁড়াতেই সারেঙ্গ সাহেব ভেতর থেকে আহ্বান করলেন, "আসুন, আসুন, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড।"

ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম প্রথমে সারেঙ্গের কম্পাস ঘর। বড় কম্পাস, একটা লোহার থামের ওপর বসানো, অনেকটা মোটরগাড়ীর ষ্টিয়ারিং হুইলের মত দেখতে। তখন পর্যন্ত আমি মোটর গাড়ী দেখিনি, ষ্টিয়ারিং হুইল তো দূরের কথা। কাপ্তান চক্রটাকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে জাহাজের ভারসাম্য রাখছে, গতিপথে ধরে রেখেছে জাহাজকে। ঘরটা ছোটই, কম্পাসের পেছনে কাপ্তানের জন্য একটা চেয়ার, আর বাড়তি বেতের চেয়ার একটা। দুটি লোহার চেয়ার, গায়ে জং পড়ে গেছে। বেতের চেয়ারে বসবার আসনে বেত গেছে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে। দেওয়ালে মহাদেব ও গণেশের ছবি, কাপ্তানের চোখের বরাবর দেওয়ালে মা-কালীর পট।

কম্পাস ঘরের সংলগ্ন আর একটি ছোট ঘর। সারেঙ্গ সাহেবের বেডরুম। লোহার

ফ্রেমের বেড, তোষক, চাদর, বালিশ সবই আধময়লা। ছুটো কবার মেয়োরও রয়েছে শয়নঘরে। দেওয়ালের সঙ্গে ছোট্ট একটি টেবিল, তার ওপর যে আয়না তাতে মুখচ্ছবি ঘোলাটে জলের মত আবছা। পিতলের কলসে পানীয় জল, ঢাকনার ওপরে পেতলের গেলাস। ঘরখানার একমাত্র জানলার ওপর রংচটা কালো পর্দা। জানলার এক কপাট ও দেওয়ালে ঢোকান একটা পেরেক : এই দুয়ের মধ্যে সেতু বেঁধেছে এক পাটের দড়ি। তার ওপর কাপ্তানের গেঞ্জি লুঙ্গি, গামছা, একটা শার্ট ও একখানা চাদর।

সারেঙ্গ, আগেই বলেছি, চাটগার হিন্দু। আমাদের গ্রামে চাটগা, নোয়াখালি ও কুমিল্লার বৈষ্ণদের 'নিচু' বৈষ্ণ বলা হত। অগত্যা না হলে তাদের সঙ্গে বিক্রমপুর, বরিশাল ঢাকার বৈষ্ণদের বিয়ে সাদি হত না। 'বিক্রমপুর' ছিল পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতির প্রধান অঞ্চল। ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছুটা অংশ নিয়ে বিক্রমপুর। বিক্রমপুরে আবার উত্তরাংশের সমাজ দক্ষিণাংশের থেকে উঁচু। আগেই বলেছি মাদারীপুর মহকুমার বেশিরভাগের ওপর বরিশালের প্রভাব। গণেশপুর ছিল দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে। 'আসল' বিক্রমপুরের মধ্যে বিখ্যাত গ্রাম সমষ্টির নাম ছিল সোনারগঞ্জ। আবার খুলনা জিলার যশোহর ও ইতনার ছিল আরও সামাজিক উচ্চতা। আমার কাকিমা ছিলেন সোনারপুরের মেয়ে। তাঁর সামাজিক কৌলিন্য আমার মার নোয়াখালির অনভিজাত্যকে বেশ একটু মালিন্য লাগিয়ে রাখত।

আমার কিন্তু চাটগার সারেঙ্গকে তৎক্ষণাৎ ভাল লেগে গেল। টুপি খুললে মাথার ঠিক মাঝখানে গোল টাক, মেদহীন দীর্ঘ শরীরের মাংসপেশী মজবুত। হাতের অঙ্গুলিগুলি বেঁটে। কারিগরী কাঠিন্যে সবল। কপালে অনেকগুলি কুঞ্চিত রেখা। সামান্য চ্যাপটা ছোট নাকের দু'পাশে তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ। তারা কথাবার্তার মধ্যেও সব সময় কম্পাস সম্বন্ধে সজাগ।

সারেঙ্গ দেওয়ালে আটকানো ম্যাপের নদীপথের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। তিনটে স্টেশনে থেমে সকাল আটটা নাগাদ জাহাজ 'খুলনা' বন্দরে পৌঁছবে। খুলনা তখনও পূর্ববঙ্গের নদীপথের অন্যতম প্রধান জংশন! এখন বাংলাদেশের দ্বিতীয় বন্দর, চট্টগ্রামের পরেই খুলনা। সারেঙ্গ আমাকে বলল, খুলনা সমুদ্রের তীরবর্তী নয়, তার প্রাধান্য নদ-নদীবাহী বাণিজ্যে। খুলনায় সারাদিন জাহাজ বিশ্রাম নেবে। নাবিকদের কিছু রদবদল হবে। খুলনা থেকে হুগলি যাবার সময় মাঝে মাঝে সারেঙ্গও বদল হয়। এ জাহাজে হবে না, কারণ কোম্পানীর কয়েকজন সারেঙ্গ অন্য একটা নতুন স্টীমার কোম্পানীতে যোগ দিয়েছে সারেঙ্গের অভাবে।

কম্পাস ঘুরিয়ে কি করে জাহাজের গতিপথ বদলাতে হয় তাও দেখবার সুযোগ পেলাম যখন নদীপথ কিছুটা বেঁকে পশ্চিম থেকে উত্তরমুখী হল।

এক ঘণ্টারও বেশি গল্প হল সারেঙ্গের সঙ্গে। তার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে একান্নতে পরেছে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল লোকটি। "তার আগে চোদ্দ বছর বয়সে বাড়ী থেকে পালিয়ে আমি একটা বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজে ঢুকে পড়ি। প্রথম কাজ ছিল জাহাজের মেঝে ধোওয়া-মোছা, জল তোলা, ডেকের রেলিং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, এককথায় 'সাফাই বয়'। একটু একটু করে, নানা রকমের কাজ শিখতে পেরেছিলাম, এঞ্জিনঘরের কাজ পর্যন্ত। নোঙর ফেলা ও তোলায় হাত লাগানো, কেবিনের যাত্রীদের আরাম-বিরামের কাজে অংশ নেওয়া। আমি নিজেকে নাবিক বলেই মনে করতাম সেই ছোট্ট কাল থেকে। তাই যুদ্ধ যখন বাধল, আমি বৃটিশ নেভীতে ঢুকে যেতে আমার বিশেষ পরিশ্রম করতে হল না।"

আমি জানতে চাইলাম, "আপনার ঘর-সংসার নেই ?"

সারেঙ্গ বলল, "হতে পারতো, কিন্তু হল না। চাঁদপুরের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু বছরের মধ্যে এগারো মাস নদীতে বাস করলে বৌ ঘরে রাখা যায় না। আমার বৌ-ও চলে গিয়েছিল। তারপরে আর ওদিকে পা বাড়াই নি।"

একটু পরে সারেঙ্গ আরও বলল, "আপনারা যারা মাটির ওপর বাস করেন তারা বুঝতেই পারেন না জলের কি প্রকাণ্ড টান, কি বিপুল রহস্য। রবিঠাকুর বলেছেন না, "অতল জলের আহ্বান" সে আহ্বানে যে কি মধুর, কি গভীর তা বোধহয় তিনিও জানতেন না। যুদ্ধের চার বছর আমি ভূমধ্য সাগর, ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগরে কাটিয়েছি। সমুদ্র যে কী ভীষণ আকর্ষণীয় তা মাটির মানুষ জানবে কি করে ? মাটির মানুষ সমুদ্রতীরে রৌদ্রস্নান করে, তটের কাছাকাছি জলে সাঁতার কাটে। সমুদ্রের অপার রহস্য তার বুকের মধ্যে। সে রহস্য একবার আপনাকে দখল করে নিলে আর রেহাই নেই আপনার। শুনেছি ফাইটার পাইলটার আকাশে মহাশূন্যে উড়ে তারাদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে রাত্রির অন্ধকারে এক সম্পূর্ণ অনুভূতির সন্ধান পায়। আমি তা পুরোপুরি বিশ্বাস করি। সমুদ্র দিনে রাত্রে বার বার রং বদলায়। ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে হয় তারও পরিবর্তন। ঠিক যেন প্রকৃতি। সমুদ্র মানুষকে যে ভাবে ভালোবাসবে, নদী ও মাটির তা সাধ্যের বাইরে। যুদ্ধ শেষ হবার পরও আমি বৃটিশ নেভীতে ছিলাম। বন্দর আমার একেবারে ভাল লাগতো না।

নাবিকরা বন্দরে নামে বেশ্যা-পাড়ায় ফুর্তি করতে, মদ খেতে, কেনাকাটি করতে। আপনি এখন ছেলেমানুষ, আমার কথার মানে বুঝবেন না। বড় হলে বুঝতে পারবেন। মেয়ে মানুষের খপ্পরে পড়া মানে পুরুষের জীবন থেকে অ্যাডভেঞ্চার চলে গেল। ঘর সংসার বাড়ী জমি ছেলে মেয়ের বেড়ায় চিরজীবনের জন্য আপনি বন্দী হয়ে গেলেন। সমুদ্রের সঙ্গে হয়ে গেল আপনার ছাড়াছাড়ি, ডাইভোর্স। নাবিকরা এত খারাপ অসুখে ভোগে কেন? বন্দরে বন্দরে বেশ্যা বাড়ী যাবার জন্য। কি আছে বেশ্যাদের? এই যাঃ, আপনি তো বালক? কি সব বলে যাচ্ছি আপনার কাছে!"

সারেঙ্গ আমাকে ড্রিঙ্ক করতে আহ্বান করেছিল। পরে নিজেই বলেছিল "না, না, আপনার জন্য এ সব নয়। আমি অবশ্য আপনার বয়সেই র‍্যাম খেতে শুরু করেছি। এক কাপ চা খাবেন? আমার তৈরী করতে কোনোও কষ্ট হবে না।"

আমি বলেছিলাম, "আমি এখনও চা খাইনি কোনোওদিন। একদিন গ্রামের এক বন্ধুর বাড়ীতে আধ পেয়ালা চা খাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বমি এসে গেল।"

সারেঙ্গ গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিল। তার হাসি নদীর বাতাস ও জলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছিল আমাদের ছোট্ট আসরে।

সারেঙ্গ বলেছিল, "আমি একটু পান করলে আপত্তি নেই তো?"

আমি কাউকে মদ্যপান করতে দেখিনি। আমার জানা ছিল মদ খেলে লোকে মাতাল হয়, মাতালের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সরকার মশাই'র সতর্কবাণী মনে পড়ল আমার। বুঝতে পারছি ভয় পাচ্ছি। বুকের মধ্যে দুরু দুরু আনন্দ হচ্ছে। হাতের তালুতে ঘাম অনুভব করছি।

তবু বললাম, "না, আপত্তি হবে কেন?"

আমার গলা সম্ভবত ভয়কে ফাঁস ক'রে দিয়েছিল।

সারেঙ্গ বলল, "ভয় পাবেন না। খুব ধীরে আস্তে পান করবো আপনার কাছে। আমাদের মাতাল হওয়া একেবারেই বারণ। জাহাজ চালাবার সময় মাথা পুরোপুরি ঠাণ্ডা রাখতে হয়।"

সারেঙ্গ তার নিজের কথায় ফিরে এলো।

"সমুদ্রের পর নদী—দুধের বদলে ঘোল। নদীর সে গুরুগম্ভীর ভীষণ সুন্দর ঐশ্বর্য কোথায়? নদী ঘরের বৌ, সমুদ্র দুরন্ত প্রেমিকা।"

গ্লাসে চুমুক দিয়ে, "তবু জল তো! নদীও তো জল! বহমান, তরঙ্গিত, উচ্ছল জল। পদ্মা বর্ষাকালে সমুদ্রের ছোট বোন। এই যে ভৈরব, দেখতে তো বড় গাঙের মতো, এতেই শ্রাবণ-ভাদ্রে ঝড় উঠলে জল তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দেয়। মেঘনাকে আমি উর্বশী হতে দেখি প্রত্যেক ঘোর বর্ষায়। নদীর যে মাতন আছে, মাটির তা নেই। নদী জীবনের মতো চলে, আর নাচে, আর বলে।"

আমি গভীর বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছিলাম। এ লোকটা এত সুন্দর করে সমুদ্র-নদীর কথা বলতে পারছে কি করে? চৌদ্দ বছর বয়সে বাড়ী থেকে পালিয়ে বিদেশী জাহাজে চাকরের কাজ শুরু করেছিল। স্কুলেও পড়েনি নিশ্চয়ই। কলেজ তো দূরের কথা! এত সব বুঝলো জানলো কি করে?

সারেঙ্গ আবার বুঝতে পারলো আমি কি ভাবছি।

বলল, "আমার কথা শুনে আপনি অবাক হচ্ছেন, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড। আমি স্কুল কলেজে পড়িনি। কিন্তু ভাববেন না আমি অশিক্ষিত। নিজের চেষ্টায় অনেক কিছু শেখা যায়। জাহাজের সারেঙ্গরা আমার উৎসাহ দেখে ইংরেজী শিখতে সাহায্য করেছে আমাকে। বন্দরে বন্দরে জাহাজ দীর্ঘকাল নোঙর রাখলে আমি খুঁজে লাইব্রেরী বার করেছি। বই-এর দোকান থেকে বই কিনে পড়েছি। অনেক বই আছে আমার। দেখবেন? আসুন আমার সঙ্গে।

শয্যাঘরের সংলগ্ন ছোট্ট একটা ঘর। দরজা এমনভাবে বন্ধ যে দেওয়াল থেকে তাকে প্রভেদ করতে পারিনি আমি। দরজা খুলে সারেঙ্গ আমাকে সেই ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেল। চার-দেওয়ালে কাঠের তাক, প্রত্যেকটা বইয়ে ঠাসা। বই ছড়িয়ে রয়েছে মেঝেয়। বেশির ভাগই সমুদ্র ভ্রমণের কাহিনী। যুদ্ধের ইতিহাস ও বর্ণনা। বড় বড় যোদ্ধার জীবনী। কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা, ড্রেক, সিসিল রোডস, রবিনসন ক্রুশো, এগুলো এখনও আমার মনে আছে। নেপোলিয়ন, নেলসন, ক্রমওয়েল, জর্জ ওয়াশিংটন থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বড় বড় প্রধান সেনাপতি, স্থল, জল, আকাশবাহিনী সৈন্যদের সেনাপতির জীবনী সাজান রয়েছে সারেঙ্গের পড়ার ঘরে। হিণ্ডেনবার্গ, ফার্দিনান্দ এঁরা সব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বড় বড় যোদ্ধা। এখনও মনে পড়ছে দেখতে পাচ্ছিলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েকটি ইতিহাস।

এবং অনেক বাংলা বইও। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জলধর সেন, আরও অনেক বঙ্গ সাহিত্যের রথী মহারথী সারেঙ্গ সাহেবের সঙ্গে দিনের পর দিন পূর্ববঙ্গের নদীপথে যাতায়াত করছেন। প্রবাসী, ভারতবর্ষ,

মর্ডান রিভিউর সংখ্যাগুলো, সংখ্যা-ও সন ক্রমে বাঁধাই। রেকসিন চামড়ার স্পাইনের (Spine) ওপর, সোনার জলে তাদের নাম ও বর্ষ খোদাই।

আমি সারেঙ্গকে বিস্মিত করে প্রশ্ন করেছিলাম, "এই সব বই আপনি পড়েছেন ?"

সারেঙ্গ একটু বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, "নো মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, অনেক বই পড়তে পারিনি। নিজের হাতে নিজেকে শিখিয়েছি বাংলা ও ইংরেজী। সে শিক্ষায় যেটুকু বিদ্যালাভ হয়েছে তা নিয়ে এ সব বই পড়ে হজম করা সহজ নয়। আমি তো শিক্ষিত ভদ্রলোক নই। আমি জাহাজের সারেঙ্গ।"

আমরা দুজনে আবার কম্পাস ঘরে ফিরে এসেছি। সারেঙ্গ বলল, "ভৈরব নদী এখান থেকে সংকীর্ণ হতে শুরু করেছে। এখন আর বড় নদী নয়, ঢেউয়ের আছালি-পাছালি শুনতে পাবেন না। দেখুন. জাহাজ একটু একটু কাঁপছে, চলতে চলতে। আমরা উজান বেয়ে চলছি। নদীর স্রোতের বিপরীত। চেয়ে দেখুন আকাশ কি ভয়ানক গভীর অন্ধকার। মেঘ জমেছে আকাশে। তারা দেখতে পাচ্ছেন না একটাও। না, এ মেঘ ঝড় তুফান তুলবে না, শুধু নদীর তরঙ্গগুলিকে কিছুটা উন্মত্ত করে দেবে। ঢেউ নেচে নেচে একটা অন্যটার গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। গভীর প্রেমে গলাগলি হ'য়ে চুমোচুমি হয়ে নেচে চলেছে। এই অন্ধকার রাত্রে ভৈরব যেন ভৈরবী হয়ে ওঠে। আমি দেখতে পাই তার মূর্ত্তি হঠাৎ চঞ্চল অন্তরে। বৃষ্টি হবে বেশি রাত্রে। ঝড় উঠবে না। শুধু বৃষ্টি। গোধূলি বেলায় আকাশে কালোয় সোনায় মেঘের কোণায় কোণায় উছলে পড়া আলোর খেলা দেখেছিলেন তো! এখন দেখুন, নদীর বুকে থমথমে জমজমাট অন্ধকারের পূর্ণ প্রকাশ অনুভব করুন। মনে হচ্ছে না কি যে আপনি সৃষ্টির পূর্বেকার মুহূর্তগুলোকে একত্র করে এক মহাপ্রশান্ত পরিপূর্ণ নীরবতার মধ্যে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের মত বসে আছেন।"

"আপনি তো এখনও তরুণ এ উপলব্ধি আপনার এখন হবার কথা নয়। আমি প্রতি রাত্রিতে নদীর বুকে সৃষ্টির নতুন চেহারা দেখতে পাই। নদী অনেক কথা বলে, কোনও কথা না বলেও বলে যায় কথার পর কথা। তার ভাষা কখনও বুঝি, কখনও রয়ে যায় অবোধ্য। জীবনের মত। আমার কিছুটা জীবনের মর্মকথা আমি জানি, কিছুটার কিছুই জানি না, বুঝিনা। আমি চাটগাঁয়ের জনৈক সারেঙ্গ বৈ তো কেউ নই! তবু জানেন, আমার দুর্বল ভাষায় নদী ও অন্ধকারের উচ্চারিত অনুচ্চারিত অনেক কথা আমি লিখে রাখি। পড়বে শুধু একজন, যতদিন তার পড়বার ক্ষমতা আছে। সে চাটগাঁয়ের জনৈক সারেঙ্গ। আপনি পড়তে চান ? আমার হস্তাক্ষর এমন কুৎসিত যে

এক বর্ণও পড়তে পারবেন না। আমাকে পড়তে হবে, শুনতে পাবেন আপনি। এ যাত্রায় নয়, এখন রাত দুপুর হ'য়ে এসেছে। নিচে নেমে গিয়ে বিছানায় শুলে ঘুম এসে যাবে আপনার। হয়ত নদী ও অন্ধকার. স্বপ্নে আপনাকে কিছু বলবে। হয়ত কিছুই বলবে না। প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ খুলনা বন্দরে পৌঁছবে। আপনার সঙ্গে আবার যদি এই জাহাজে দেখা হয়, এক পথের যাত্রী হতে পারি। পড়ে শোনাব আপনাকে আমার ভাষায় নদীর কলবর, তরঙ্গের কোলাহল, বাতাসের হাহাকার, মেঘের ও বৃষ্টির সঙ্গীত, ঝড় তুফানের হুংকার। যদি আবার কোনোদিন দেখা হয়……"

আমি নিচে নেমে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ছি, শুনতে পেলাম সরকার মশাইয়ের কণ্ঠ, "এতক্ষণ কি করছিলে সারেঙ্গের সঙ্গে? আমার তো বেশ দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল।'

আমি বললাম, "কিছু করছিলাম না. নদী ও অন্ধকার দেখছিলাম।"

—"কি করছিলে?"

আমি আর কিছু না বলে শুয়ে পড়লাম। মা একটা রংচটা বেডকভার সঙ্গে দিয়েছিলেন। "জাহাজে ঠাণ্ডা লাগবে দেখিস।"

সত্যি তাই। আমি বেড কভারটা গায়ে জড়িয়ে চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আমাকে গভীর স্নেহে জড়িয়ে ধরল।

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে শুনতে পেলাম জোর বৃষ্টি পড়ছে নদীতে। জাহাজের ছাদে। গগন থেকে মাদল বাজছে "গুরু গুরু গুরু…।"

॥ চোদ্দ ॥

উষার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম কেটে গেল। অর্থাৎ আমার যখন ঘুম ভাঙলো, মনে হল সবে মাত্র উষা এসেছে রাত্রির শেষে।

আমার হাতে তো ঘড়ি নেই, সময় বোঝা সম্ভব নয়। পাশে সরকার মেশো চিৎ হয়ে গভীর নিদ্রিত। মুখে তেমন একটা লোভী লোভী হাসি নিয়ে ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখছেন। মাসিমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তবুও শুয়ে রয়েছেন বিছানায়। একমনে, কিছুই না দেখে, নিবিষ্ট দুচোখ খুলে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম বেশিরভাগ যাত্রীই চাদরে গা ঢেকে ঘুমুচ্ছে। কয়েকজন উঠে বসেছে, একটি মেয়ে, স্কুলের উঁচু শ্রেণীর মেয়ে মনে হচ্ছে। রেলিং চেপে ধরে নদীর ঢেউ দেখছে।

ভৈরব, দেখতে পেলাম, একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেছে। সাপের মত এঁকে বেঁকে চলছে। চলতে চলতে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে।

সারেঙ কি এখনও জেগে জেগে কম্পাস ঘুরুচ্ছে? ম্যাপের ওপর নজর রেখে কম্পাসের চাকা ঘুরিয়ে দিচ্ছে?

উঠে, নিচে নেমে এসে, দেখলাম আর এক চেহারা জাহাজের। সকলে মালপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে, খালাসীরা ব্যস্ত সমস্ত, কেউ এক কোণ থেকে অন্য কোণে দৌড়চ্ছে। বালতি বালতি জল তুলে ধোওয়া হচ্ছে জাহাজের মেঝে।

একটি লোক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, সারা মুখ দাড়িতে ঢাকা, কপালে সিঁদুরের টিপ, হাতে অনেকগুলো আংটি, বাহু থেকে শক্ত মণিবন্ধ, তাকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে সোনার চেনে বড় একটা ঘড়ি।

আমি এগিয়ে গিয়ে লোকটার মুখোমুখি হ'য়ে স্তব্ধ বাক্যহীন হ'য়ে পড়লাম। মানুষটা অন্ধ। দুটো চোখই তুলে ফেলা হয়েছে। রয়েছে শুকনো চামড়ায় ঢাকা দুটো গর্ত। দাঁড়িয়ে কয়েকটা চাকরকে চওড়া গলায় হুকুম করছে পাটের চটে বাঁধা বরফ দেওয়া বড় বড় মাছের ঝাকা গুছিয়ে রাখতে, জাহাজের খোলা দরজার পাশে, যেখানে কাঠের তক্তা দিয়ে রাস্তা বসানো হবে তীরের মাটি পর্যন্ত, যাত্রীদের অবতরণের জন্য।

আমার স্তব্ধ ভীত ভাব কেটে গেলে আর একটু কাছাকাছি পৌঁছেছি, মানুষটার অনেক কাছাকাছি।

হঠাৎ আমাকে দারুণ চমকে দিয়ে সে বলে উঠল, "কে ওখানে? কি চান? মাছ কিনবেন?"

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "না।"

—"তবে? তবে কি চান আপনি?" প্রশ্ন তো নয়, হুংকার।

—"কিছু না। ক'টা বেজেছে তাই খুঁজছি। আপনার হাতে ঘড়ি দেখে—।"

লোকটা ঘড়ির ওপর হাত বোলালো। বলল, "সাতটা বেজে তেইশ।"

শুনেই বুক কেঁপে উঠল। প্রশ্ন করলাম, "খুলনায় তো আটটায় পৌঁছাবার কথা। তাই না!"

লোকটি বলল, "পৌঁছে যাবে। আধ ঘণ্টার বেশী দেরী হবে না।"

শুনেই আমি এক দৌড়ে ওপরে চলে গেলাম আমার বিছানার কাছে। মাসিমা তখনও ঐ একইভাবে শূন্য দৃষ্টিতে কিছুই না দেখে তাকিয়ে আছেন ড্যাবড্যাবে দু' চোখে।—এখন তাঁর বিপুল দেহ বসে রয়েছে বিছানার ওপর। সরকার মশাই তখনও স্বপ্ন দেখে হেসে চলেছেন।

আমি খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বললাম, "মাসিমা, সাড়ে সাতটা বেজেছে। এখুনি খুলনা এসে যাবে। ওঁনাকে তুলুন। বিছানা বেঁধে নামবার জন্য তৈরী হোন।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার তোষক, চাদর, বালিশ সব একত্র ক'রে সতরঞ্চির ওপর রেখে বিছানা রোল ক'রে পাটের দড়িতে বেধে ফেললাম। আমার টিনের বাক্সটা নিলাম। বন্ধ তালা ঠিকই রয়েছে। মা একজোরা নতুন রবারের পাম্প শু' কিনে দিয়েছিলেন। সে দুটো পায়ে পরে নিয়ে কাছাকাছি মুখ ধুতে গেলাম। দাঁত মাজার জন্য নিমের দাঁতন পকেটেই ছিল। তাড়াতাড়ি চিবিয়ে চিবিয়ে নরম করে মিনিট খানেক দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নিলাম। সঙ্গে গামছা ছিল না, বিছানায় বাঁধা হয়ে রয়েছে। মুখ মুছতে হল না, নদী তার বাতাস দিয়ে মুছে দিল আমার ভেজা মুখ। শুকিয়ে দিল ভেজা চুল।

বাঁধা বিছানা ও টিনের বাক্সটাকে নিচে নিয়ে যাবার জন্য শোবার জায়গায় ফিরে এসে দেখি সরকার মেশোমশাই উঠে গেছেন। স্ত্রীর সাহায্যে বাঁধছেন বিছানা। ওঁদের সঙ্গে দুটো বাক্স, একটা চামড়ার সুটকেস, তিনটে বড় বড় টুকরী। এসব নিচে নিয়ে আসবেন কি করে জানতে চাইলে সরকার মশাই বললেন, কেন? কুলি এসে যাবে। দেখো জাহাজ বন্দরে দাঁড়ালেই ঝাঁকে ঝাঁকে কুলি এসে যাবে।

কুলিকে কত পয়সা দিতে হয় আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি টিনের বাক্সে

পাঁচটা টাকা আর আমার শার্টের পকেটে এক টাকা তেইশ পয়সা রয়েছে। আমি নিজেই গণেশপুরে আধমন চালের বস্তা মাথায় ক'রে কুড়ি মিনিট হেঁটে বাজার থেকে বাড়ী এসেছি দু'পয়সা বাঁচাবার জন্য। একবার বর্ষায় ভরা পদ্মার উজান স্রোতে অসংখ্য ইলিশ মাছ ধরা পড়লে মাঝিরা চার পয়সায় প্রকাণ্ড বড় বড় ইলিশ বিক্রী করছিল। আমি একটা কিনে, তীর থেকে মাঝিকে চারপয়সা দিতে গেলে একটা পয়সা হাত পিছলে পড়ে গেছল নদীর জলে। বাকী ছিল মাত্র তিন পয়সা। জেলে মাঝি আমার ক্ষতি দেখে দয়া ক'রে তিন পয়সাতেই সেই এখনকার প্রায় দেড়কিলো ইলিশ মাছটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। মাছের মাথার ভেতর দড়ি ঢুকিয়ে দড়িটা আমার আঙুলে শক্ত ক'রে ধরে দিয়েছিল যাতে মাছটা না জলে পড়ে যায়। বর্ষার অস্থির পদ্মা হেসে অস্থির হয়ে দেখেছিল সে দৃশ্য। বাড়ী এসে মার কাছে একটা পয়সা নদীর জলে ফেলে দেবার জন্য কেঁদে ফেলেছিলাম। আমি গণেশপুরের ভদ্র গরীব ঘরের নওজোয়ান সন্তান। এক পয়সাও আমার কাছে অনেক দামী।

অতএব টিনের বাক্সটাকে মাথায় তুলে নিয়ে বিছানার দড়ি ধরে টেনে নিয়ে আমি চললাম নিচের ডেকে। জাহাজ খুলনা বন্দরে নোঙর ফেলবার অপেক্ষায়। যাবার আগে সরকার মেশোমশাই ও মাসিমাকে দুহাত জোর ক'রে নমস্কার জানালাম। আমাকে দুটো বোঝা তুলে নিতে দেখে সরকার মেশোমশাই অবাক হলেন, বাধা দিলেন না, কিছু বললেনও না। মাসিমার মুখখানা থেকে সেই ঝলমলে হাসির আলো চলে গিয়েছিল। তিনি শুধু ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে কষ্ট হল না। নিচের ডেকে তখন যাত্রীরা ভিড় করে রয়েছে খোলা দরজাটার সামনে। এদের পেছনে দাঁড়ালে পিতা ঠাকুরকে আমি দেখতে পাব না। তিনিও দেখতে পাবেন না তার আত্মজ অগ্রজ পুত্রকে। আমি তাই এক পাশে সরে রেলিংয়ের পাশে দাঁড়ালাম। টিনের বাক্স ও বিছানাকে রাখলাম পায়ের কাছে, পা দিয়ে স্পর্শ ক'রে।

মন্থর গতিতে জাহাজ এবার হেলে দুলে এগোচ্ছে। নদীর দুধারের বৃক্ষরাজি, লতাগুল্ম, কুটির, দালান নজরে আসছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বক পাখি উড়ছে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে। মাছের গন্ধে লোভী পাখিরা নদীর কাছাকাছি উড়ছে, পাখার ঝাপটে, ছেটাচ্ছে নদীর জল। নদীর জল ঘোলাটে, ঢেউগুলি নিস্তেজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তাই অত দেরীতে ঘুম ভাঙলেও মনে হয়েছিল নদীর সঙ্গে উষার সাক্ষাতের সময় ঘুম ভেঙে গেছে আমার। জাহাজ ভোঁ ভোঁ আওয়াজে তার আগমন ঘোষণা করছে।

আমি হঠাৎ যেন এক অজানা অদ্ভুত উত্তেজনা ধমনীতে বুকের স্পন্দনে. অনুভব করছি। এটা কি জল থেকে তীরে নামবার উত্তেজনা ? মাটির আসন্ন স্পর্শের উদ্বেলতা ? না- কি যে পিতাকে আমি খুব কম চিনি, জানি আরও কম. অথচ যাঁর সঙ্গে আমার আত্মার ও রক্তের গভীর চিরস্থায়ী বন্ধন, তাঁর সঙ্গে এই প্রথম মুখোমুখি হবার আশা ও আশঙ্কার যৌথ চাপে কাঁপছে আমার বুক। হাতের তালু মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা, পা অবশ।

খুলনা বন্দর এবার চোখের সামনে। অনেক লোক ভিড় করেছে তীরে। আত্মীয়-স্বজনদের আদর করে পারে নিয়ে যেতে। অথবা মাছ পণ্য তরীতরকারি কিনে দিতে। জাহাজ নোঙর ফেলেছে। পড়েছে কাঠের রাস্তা। আমি তীরস্থ মানুষ-গুলির সামনের পংক্তিতে বাবাকে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর উৎসুক. আকুল. ভীত দৃষ্টি জাহাজের দরজার ওপর ও কাছাকাছি দাঁড়ানো যাত্রীদের, ত্বড়িৎবেগে তন্ন তন্ন তল্লাস ক'রে, হঠাৎ পতিত হয়েছে আমার ওপর। এক মুহূর্তে কেটে গেছে উদ্বেগ. আকুলতা, ভয়। গভীর নিশ্চিত নিশ্বাসের সঙ্গে আমার বাবার মুখখানা এমন শান্ত. স্নেহার্ত। তিনি ভিড় ঠেলে আমার দিকে এগোচ্ছেন। সঙ্গে নিয়ে আসছেন একটা ছোকরা 'কুলি'' আমারও রুদ্ধ শ্বাস এবার মুক্তি পেয়ে গেছে। ভয়ার্ত মুহূর্তগুলি এক নিমেষে পলাতক। ভয় নেই আমার দেহ মনের কোথাও। বাবা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন। আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছি। বাবা ঐ ছেলেটাকে বলছেন, "বাক্সটা মাথায় তুলে নে।" তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমার বিছানাটা ঐ বাক্সের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছেন। বলছেন, "চল্, এগিয়ে চল্, রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে।" ছেলেটাকে সামনে রেখে বাবা এগিয়ে যাচ্ছেন জাহাজ ছেড়ে খুলনার মাটিতে। তাঁর ঠিক পেছনে আমি। বার বার বাবা তাকিয়ে দেখছেন 'আমি ঠিক পেছনে আছি কিনা।

আমাদের পিতা-পুত্রে একটা কথাও বিনিময় হয়নি। শুধু এক স্নেহার্দ নীরবতা দুজনকে দৃঢ় বন্ধনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, "গুডবাই, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড।"

তাকিয়ে দেখলাম সেই সারেঙ্গ সাহেব। পরনে জাহাজের কাপ্তানের পোষাক, মাথায় কাপ্তানী টুপি।

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সারেঙ্গ সাহেব, আমিও বাড়িয়ে দিয়েছি। আমি গুডবাই বা থ্যাংকিউ বলতে পারিনি। মুখে ও শব্দ আসেনি। আসলেও বাবার এত কাছে, মুখ দিয়ে বেরুতো না ও কথাগুলি।

॥ পনের ॥

বাবা একটা সাইকেল রিক্সা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন। বাক্স বিছানা পায়ের নিচে রেখে প্রথম আমি, পরে বাবা তাতে চেপে বসলাম। বাবা গন্তব্যস্থান আগেই বলে রেখেছিলেন। শীর্ণদেহ মাঝবয়সী রিক্সাওয়ালার সব ভারটা তুলতে কষ্ট হল কিন্তু একবার তোলা হয়ে গেলে সে রিক্সা চালিয়ে চলল, আমার মনে হল না, তার আর কষ্ট হচ্ছে। এবার বাবা প্রথম কথা বললেন, "স্টীমারে কোন কষ্ট হয়নি তো?"

আমি বললাম, "না, একটুও না।"

—"বাড়ী থেকে দুবেলার খাবার দিয়ে দিয়েছিল?"

—"হ্যাঁ। লুচি, তরকারী।"

—"বাড়ীর সব খবর ভালো?"

—"ভাল। ভানুর পেটটা খারাপ যাচ্ছিল, সত্য কবিরাজের ওষুধ খেয়ে ভালো আছে।"

কথা শেষ। আমার পিতৃদেব ও আমি এর আগে কখনও পরস্পরের মধ্যে এতগুলি বাক্য বিনিময় করিনি। আমি রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছি। নিজেকে বিব্রত মনে হচ্ছে। আমার মনে তখনও রাত্রির ভৈরব ঢেউ তুলছে। মাকে কাছে পেলে মন উজার করে কথা বলতাম। বাবাকে ও সব বলা যায় না।

তবু নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে বসলাম, "জাহাজের সারেঙ্গ লোকটা খুব ভালো। অনেক পড়াশোনা করেছে। আমাকে বুঝিয়ে দিল কি করে জাহাজ চালাতে হয়।"

বাবা বললেন, "ওরা চট্টগ্রামের মুসলমান। ভয়ঙ্কর লোক ওরা।"

—"এ সারেঙ্গ হিন্দু?"

—"কি নাম?"

নামটা তো আমাকে বলেছিল। একটুও মনে নেই আমার। শুধু মনে আছে, —"আমার আবার নাম কি! আমি জাহাজের সারেঙ্গ। নাবিক। আমার আর কোনোও পরিচয় নেই।"

বাবাকে বললাম, "বলেছিল, মনে করতে পারছি না।"

আবার দুজনে চুপ। পথ দেখছি অনেক দীর্ঘ। একটা চড়াই-এ এসে রিক্সাওয়ালা সীট থেকে নেমে দুবাহু-দিয়ে জোরে রিক্সা টানতে লাগলো। লোকটার সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি। মাথার চুল নেই বললেই হয়। সব ঝড়ে পরে গেছে। আমার মনে হল, আমাদের দুজনের নেমে যাওয়া উচিত। তাহলে রিক্সার ভার কম হবে।

বাবা কি আমার মনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন? নিজেই লোকটাকে বললেন, "দাঁড়া, আমরা নেমে যাচ্ছি। তুই রিক্সাটা টেনে নিয়ে উৎরাইয়ে নিয়ে আয়। তখন আমরা আবার বসব।"

আমরা দুজনে নেমে পড়লাম।

পায়ে হেঁটে চলতে চলতে বাবার হঠাৎ মনে পড়ল, আমার হয়ত ক্ষিধে পেয়েছে। প্রশ্ন করলেন, "সকালে কিছু খেয়েছিস? ক্ষিধে পেয়েছে?"

চড়াই উঠবার সময় বাবার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারলাম। বাবা সাংঘাতিক হাঁপানীতে ভোগেন। বুক থেকে সোঁ সোঁ শব্দ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে।

আমি তখন দরকার মতো মিথ্যে বলতে শিখে গেছি। নিজেকে রক্ষা করতে অনেক সময় মিথ্যে বলতে হয়। শত্রুর হাত থেকে শুধু নয়, নিকটতম প্রিয়জনের হাত থেকেও। বাবার কাশি আরম্ভ হল। এ কাশি আমার পরিচিত। দেখলাম একটু পরেই কাশি বন্ধ হয়ে গেল।

নিজেই বললেন, "গরমকালটা ভালোই থাকি, কষ্ট হয় শীতের মাসগুলি।"

আমি বললাম, "আপনি বিপিন সরকার নামে কাউকে চেনেন?"

স্মৃতির জঙ্গলে একটু খোঁজার চেষ্টা করে বাবা বললেন, "না।"

—"এখানের মিউনিসিপ্যালেটির কেরানী। আমার পাশেই উনি বিছানা পেতে নিয়েছিলেন। মাসিমা আমাকে সকালে খাইয়ে দিয়েছেন।"

বাবা নীরব হলেন। উৎরাইতে রিক্সার চেন পড়ে গেল।

আমি বললাম, "মিউনিসিপ্যালেটির খুব নিন্দে করলেন মাসিমা। কি যেন 'নাগ।' বললেন, তার নজরে পড়ে ভদ্রলোকের উন্নতি হচ্ছে না।"

—"কে বলল?"

—"ওঁর স্ত্রী। মাসিমা।"

বাবা এবার একটু কঠিন স্বরে বললেন, "রায় বাহাদুর বলদাস নাগ। তাঁর

বাড়ীতেই আমি থাকি। ছেলেমেয়েদের পড়াই। খেতে থাকতে পাই। তোকেও ওখানেই নিয়ে যাচ্ছি।"

বুঝতে পারলাম অজান্তে নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ করেছি। চুপ করে গেলাম। নীরব পিতা-পুত্রকে নিয়ে কিছুক্ষণ পর সাইকেল রিক্সাওয়ালা একটা বিরাট দালান বাড়ীর গেটের সামনে দাঁড়াল। গেট বন্ধ। গেটের সামনে লাঠিধারী প্রহরী। বাবা ও আমি দুজনেই রিক্সা থেকে নামলাম। বাবা সাইকেল রিক্সাওয়ালাকে তার পাওনা দিয়ে দিলেন। ময়লা গামছা দিয়ে সে তার দেহ, মাথা, মুছতে লাগল। বাবা প্রহরীকে বললেন আমার বাক্স বিছানা ভেতরে নিয়ে যেতে।—"আমার ঘরে রেখে দিও।" রিক্সাওয়ালা জল চাইল। বাবা তাকে দাঁড়াতে বললেন। গেটের পরেই বেশ বড় লন, ঘাসগুলি কিন্তু সবুজ নয়। অনেক রকম ফুলের গাছ লনের চার কিনারে। জমির ওপরেও তৈরী করা হয়েছে, এখন যাকে বলি ফ্লাওয়ার-বেড। লনের মাঝখানে ইটের পথ। বাবা একটু পরে রিক্সাওয়ালাকে ডেকে লনের ওপর বিছান দীর্ঘ পাইপের মুখটা তুলে ধরলেন। দুহাত পেতে পেট ভরে লোকটা জল খেল। তারপর সেলাম করে গেটের বাইরে গিয়ে সাইকেল রিক্সায় প্যাডেল করতে করতে একটু সময়ের মধ্যে চোখের বাইরে চলে গেল।

গণেশপুরে, তোমার মনে পড়বে, দুখানা সাইকেল ছিল। দুটোই জমিদার বাড়ীর। লোকেদের পায়ে হেঁটে দূরত্ব ভাঙতে হত। অথবা জলপথে নৌকোয়। মানুষ ঘাড়ে, পিঠে, মাথায় বোঝা বইত। গরুর গাড়ীও ছিল না। আমি অবশ্য ঢাকা শহরে সাইকেল রিক্সা দেখেছি, চড়েছি। এই মুহূর্তে আমার মন শহর সম্বন্ধে বিরূপ হয়ে উঠল। মনে হল, গণেশপুর গ্রাম ঢাকা, খুলনা থেকে অনেক ভালো। মানুষ গ্রামে খাটে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটে। কিন্তু শহরে তারা যেন পশু হ'য়ে যায়। গণেশপুরে আমাদের বাড়ীতে কয়লার বস্তা মাথায় চাপিয়ে মুটে আসত। তারা জল চাইলে আমি বা আমার বোন মধু বলতাম, ছায়ায় একটু বোস। ঘরে গিয়ে মাটির কলস থেকে এক ঘটি জল ও কয়েকখানা বাতাসা এনে দিতাম মুটেকে। বাগান বা লনের পাইপ থেকে পানি পান করতে হত না তাকে। বাবা পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে ছুটিতে বাড়ী আসতেন স্টীমার বন্দর থেকে। তিন ক্রোশ পথ। সঙ্গে বিছানা বয়ে আনত এক মুটে। পায়ে হাঁটার মধ্যে একটা মর্য্যাদা আছে, আত্মসম্মান আছে, এখন মনে হল আমার। মানুষে টানা রিক্সা বা সাইকেল রিক্সা চেপে পথ অতিক্রম করার মধ্যে রয়েছে নিষ্ঠুরতা। পশুর কাজ ক'রে পয়সা

কামাতে হয় শহরে গরীবদের। স্টিমার বন্দরে অনেক ভিখিরি দেখেছিলাম। গণেশপুরে ভিক্ষা করত না কেউ। বাউলরা একতারা বাজিয়ে গান করতে আসত। আমরা বাড়ীর প্রায় সবাই, বুড়োরা পর্যন্ত, দাঁড়িয়ে যেতাম গান শুনতে। কেউ কেউ পয়সা দিত। ফকির আসত আল্লাহ্, আল্লাহ্, উচ্চারণ করতে করতে। পরনে আলখাল্লা, গলায় নানারকম পাথর। হার, ছোট্ট শাঁখের একরাশি মালা। লম্বা জট পাকানো চুল কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠ পর্যন্ত নেমে এসেছে। দেখলে ভয় পেতাম আমরা ভাই বোনেরা। মা হয় নিজে, না হয় অন্য কাউকে দিয়ে দু'চার মুঠো চাল দিয়ে দিতেন ফকিরদের। আমরা তাদের ভিখিরি মনে করতাম না। মাঝে মধ্যে এক একটা লোক আসত পেটে খিদে নিয়ে। পুরো আহার দেবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। কিন্তু খালি হাতে, পেটে খিদে নিয়ে তাদের আমরা দুর দুর ক'রে তাড়িয়ে দিতাম না। হয় একটু চিঁড়ে, না হয় দু'চারটে মোওয়া, অথবা খানিকটা মুড়ি, গুড়ের সঙ্গে দেওয়া হত ক্ষুধার্ত মানুষকে। এবং এক ঘটি জল। একটা পাগল ছিল গণেশপুরে। মুখে তার কথা ছিল না। বোবা নয়, নির্বাক। মাসে একদিন সে এসে রান্নাঘরের অনতিদূরে লিচুগাছের নিচে চুপচাপ বসে থাকতো। আমি অথবা মধু তাকে কলাপাতায় ডাল ও ভাত দিয়ে আসতাম। কখনও তাকে আমরা তাড়িয়ে দিই নি। ভাত-ডাল খেয়ে, জল পান ক'রে, কলাপাতা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে চলে যেত পাগল মানুষটা। বিড় বিড় ক'রে কখনও কখনও কি সব বলত। আমরা তার এক বর্ণও বুঝতাম না। তাকে নিয়ে আমাদের কোনো কৌতূহল ছিল না। পাগল লোকটা গণেশপুরের অঙ্গ, সমাজচিত্রের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই সংযুক্ত ছিল। শহরের মানুষ, ভিখিরিদের মানুষ মনে করে না। গণেশপুর গ্রামের ভিখারিরা মানুষ ছিল। হতভাগা, ক্ষুধার্ত, গৃহহীন, গরীবের চেয়েও গরীব। তথাপি মানুষ।

এত সব কথা ও স্মৃতি আমার মনকে ভরে রেখেছিল। বাবা যখন একটা ছোট্ট দালান বাড়ীর সামনে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে নিজে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন, তখন দেখতে পেলাম একজন লোক ঐ ছোট বাড়ীটার ডান দিকে পরিষ্কার দৃশ্যমান একটা বিরাট বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। বাবা ছোট বাড়ীটার ভেতরে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি বাবার কাশির শব্দ।

কিছুক্ষণ পরে যে লোকটি বাড়ীর ভিতর চলে গিয়েছিল, সে ফিরে এলো। তার ফেরার শব্দের জন্যেই বোধহয় বাবা অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বেরিয়ে

এলেন। তাঁর হাত পা ধুলো মাখা, ধুতি হাঁটুর ওপরে, পা খালি। তাঁকে পরিশ্রান্ত মনে হল।

লোকটা তাকে বলল, "বড়মা একে ভেতরে ডাকছেন।"

বাবা আমাকে বললেন, "রায়বাহাদুরের পত্নী এ বাড়ীর বড়মা, তোকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এর সঙ্গে যা। উনি যা বলেন সেই মতো কাজ করিস।"

আমি ভেতরে ভেতরে রেগে উঠছিলাম, এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকায়।

বাবাকে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি করছেন ঘরটার মধ্যে আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে?"

বাবা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ওসব পরে হবে, এখন তুই ওঁর সঙ্গে যা বড়বাড়ীতে।"

বাড়ীটা বড়ই বটে। প্রবেশ রাস্তাকে ইঁট ও লাল সুড়কিতে মনোহর করে রাখা হয়েছে। প্রবেশ রাস্তার দু'ধারে রং-বেরং টবে নানারকম ফুল ও গাছ। ধবধবে সাদা মার্বেলের আটটা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয় বারান্দায়। বারান্দাটা বিরাট লম্বা ও চওড়া, সবটাই শ্বেত পাথরের। ভেতরে ঢুকে প্রকাণ্ড বসার ঘর। এমন সব আসবাব যা আমি বইয়ে পড়েছি, চোখের সামনে দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে গেছি। লোকটা আমাকে বলল, "আপনি বসুন এখানে। আমি বড়মাকে খবর দিচ্ছি।"

বিরাট বসবার ঘরের জমি লাল সিমেন্টের। দুপাশে দুটো সোফাসেট কার্পেটের ওপর। অনেকগুলি বাড়তি চেয়ার। দুটো সোফাসেটের মাঝখানে দুই মার্বেলের টেবিল। ঘরে কয়েকখানা পাথর ও পিতলের মূর্তি। দেওয়ালে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো, বঙ্গের গভর্ণর (নাম ভুলে গেছি) সম্রাট জর্জ দ সিক্স্থ ও আরও কিছু ইংরেজের। ঘরখানাকে দেখা আমার তখনও অনেকটা অসমাপ্ত, অন্দরের দরজার পর্দা তুলে প্রবেশ করলেন এক মহিলা, আমি তাঁর পানে বিস্ময় নীরব চোখে তাকিয়ে রইলাম।

—"তুমি অনেকক্ষণ বসে আছ, বাবা?" মহিলা এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। আমি স্বতঃপ্রবণ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম।

—"মাষ্টার মশাইকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি। তিনি আমার নাতি নাতনিদের পড়ান। তাঁর কাছে শুনেছি তুমি খুব ভালো করে পাশ করেছ ম্যাট্রিকুলেশনে। এখন কলকাতায় গিয়ে পড়বে। তোমার পথে কষ্ট হয়নি তো?"

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি।

বললাম, "কোনোও কষ্ট হয়নি।"

'বড়মা' বললেন, "সকাল থেকে নিশ্চয়ই কিছু খাওনি। ভেতরে এসো, তোমার খাবার তৈরী।"

তাঁর পিছনে পিছনে আমি কয়েকটা ঘর পার হয়ে যে ঘরে পৌঁছালাম, সেটা নিশ্চয়ই খাবার ঘর।

প্রকাণ্ড ঘরটা। পর পর আলমারীতে অনেক চিনেমাটির বাসন। ডাইনিং সেট বলে কিছু যে আছে তা আমার জানাই ছিল না। আমি চিনেমাটির কাপ-ডিস, খাবার প্লেট দেখেছি। দেওয়াল জুড়ে একটা আলমারীতে সারি সারি ঝকঝকে স্টেইনলেস স্টীলের বাসন। চকচকে লাল মেঝের ওপর পিঁড়ি পাতা, তার সামনে থালা ভর্ত্তি লুচি, ডাল, তরকারী, বেগুন ভাজা। থালার পাশে এক গ্লাস জল।

'বড়মা' বললেন, "নাও, খেতে বোসো। ক্ষিধেয় তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে।"

আমার পরনে সেই পোষাক যা আমি গণেশপুর ছাড়বার সময় পরেছিলাম। সেই নীল পপলিনের শার্ট, পায়ে রবারের পাম্প-শু। স্নান হয়নি, সারা শরীর নোংরা লাগছে। আমি দেখতে পেলাম, এ খাবার ঘরে দেওয়ালের সঙ্গে হাত মুখ ধোবার ব্যবস্থা আছে। সাবান আছে। তোয়ালে এবং মুখ দেখার মত দেওয়ালে আয়না। আমি সাবান দিয়ে হাত ধুলাম, বেশ কিছু সময় নিয়ে মুখ ধুলাম, তোয়ালে দিয়ে মুখ হাত মুছলাম। আয়নায় নিজের মুখ দেখে হাসি পেল। আয়নার মুখটাও হাসল।

পিঁড়ির ওপর আমি সোজা টান হয়ে বসলাম। লুচি তরকারী মুখে পুরে বুঝতে পারলাম পেট ক্ষিধেয় কাতর। ধীরে আস্তে নিজেকে খাওয়ালাম।

পাশে একখানা আসনে বসে 'বড়মা' প্রশ্ন করতে লাগলেন।

—"গ্রামের বাড়ীর সবাই ভালো আছেন তো?"

আমি খাওয়া বন্ধ ক'রে বললাম, "ভালো।"

—"ক' ভাই, ক' বোন তোমরা?"

—"তিন ভাই, এক বোন।"

"—তুমি সকলের বড়ো?"

—"হ্যাঁ, আমার পরে বোন মাধুরী, পর পর দু'ভাই।"

—"তোমার মা নিশ্চয়ই খুব দক্ষ মহিলা। তোমাদের তো একাই থাকতে হয়?"

এ প্রশ্নের তো কোনো জবাব ছিল না। আমি শুধু 'বড়মা'র মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছি।

—"তুমি তো কিছুই খাচ্ছো না! শুধু আমাকে দেখছো! খেয়ে নাও। লুচি ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।"

আমি খাওয়াতে মন দিয়েছি, মাথা নিচু ক'রে নয়। সটান সোজা হয়ে বসে।

'বড়মা' হঠাৎ বলে উঠলেন, "কি দেখছ আমার মধ্যে? অমন ক রে তাকিয়ে রয়েছ কেন?"

কে যেন চাবুক মারল আমাকে। আমি বুঝতে পারিনি তাঁর মুখ থেকে আমার দৃষ্টি সরতে চায় নি। আমার মনে হয়নি আমি কোনো দোষ করেছি। অনায়াসে প্রশ্নের উত্তরে বললাম, "আপনি কি সুন্দর! ঠিক দুর্গা প্রতিমার মত মুখ আপনার। তাই দেখতে ভীষণ ভাল লাগছে আমার!"

'বড়মা'র গৌরবর্ণ মুখ লাল হ'য়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর আঁচল উঠে এসে ঢেকে দিল চিবুক, দাঁত, নাকও। হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন। আঁচল সরিয়ে নিলেন মুখখানা থেকে।

—"সত্যি সুন্দর লাগছে আমাকে তোমার?"

—"আমি এত সুন্দর মুখ, এমন সুন্দর মা কোথাও দেখিনি।"

মহিলার চোখে জল এসে গেছে।

—"তুমি গ্রামের সহজ সরল ছেলে। তাই এত সহজে কথাগুলি বলতে পারলে।"

আমি বললাম, "প্রতিবছর আমাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। দুর্গামায়ের মূর্ত্তি তৈরীর থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কুমোরদের সঙ্গে লেগে থাকি। আপনাকে তো ভগবান নিজের হাতে তৈরী করেছেন।"

আর এক ঝলক হাসি উছলে পড়লো 'বড়মা'র মুখ থেকে।

প্রসঙ্গ বদলে তিনি জানতে চাইলেন কলকাতায় আমি কার সঙ্গে থাকব, কোন কলেজে পড়ব।

—"থাকব আমার কাকার কাছে। বাবার ছোট ভাই। আমার একই কাকা। কাকামণি বলি তাঁকে। তিনি গণিতের অধ্যাপনা করতেন পাটনায়, নেপালে, পাঞ্জাবে। এখন তাঁর চাকরী নেই। কোন্ কলেজে পড়ব জানি না। কলকাতায় গেলে ঠিক হবে। যে কলেজ আমাকে বৃত্তি দেবে, মাইনে নেবে না, সেখানেই পড়ব আমি।"

'বড়মা'র মুখখানা ঈষৎ মলিন হল।

—"তাই কোরো।" বললেন উনি, "মাষ্টারমশাইয়ের পক্ষে গ্রামের সংসারের খরচ মিটিয়ে কলেজে টাকা পাঠানো কঠিন হবে।"

একটু পরে, "তোমার বাবার মত সজ্জন মানুষ বেশি নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেটে যান তোমাদের জন্ত। হাঁপানীতে কষ্ট পান, তবু টি্যউশনি ছাড়েন না। তুমি বড় হ'য়ে সবার অভাব দূর করবে। তুমি তো শুনেছি তিন দিন থাকবে এখানে। মাষ্টার মশাইকে বলে দিয়েছি এ ক'দিন আমার নাতি নাতনীদের পড়াতে হবে না। সন্ধ্যে থেকে রাত অবধি তোমার সঙ্গে কাটাতে পারবেন।—"আর দু'খানা লুচি দেব তোমাকে ?"

"—না, না" বলে উঠলাম আমি। "ভীষণ পেট ভরে গেছে।" তখন দুটি সন্দেশ ও জল খেয়ে আমি খাওয়া শেষ করেছি।

'বড়মা' উঠলেন। আমিও। এগিয়ে গিয়ে আমি মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। রবারের জুতো খাবার ঘরের বাইরের দিকে রেখেছিলাম। সে দিকে পা বাড়াতে গিয়ে শুনতে পেলাম :

—"বাইরের মুন্সীজীর ঘরে তোমার বাবা বাস করেন। তুমি রাত্রে এই বাড়ীর ভেতরে শোবে। তোমার জন্ত বিছানা তৈরী রাখবে বলে দিয়েছি আমি রঘুকে। রঘু এখন তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাবে।"

আমি জুতো পরে নিয়েছি। বিদায় নেবার আগে বললাম, "ভীষণ পেট ভরে খেয়েছি। বাবার যদি খুব অসুবিধা না হয় আমি তাঁর কাছেই শোব। মেঝেতে শোবার অভ্যেস আছে আমার। যদি বড় বাড়ীতে শুতে না আসি অপরাধ নেবেন না।"

'বড়মা'র মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

—"তুমি এমন সুন্দর ক'রে কথা বলতে শিখেছ কার কাছে ?"

আমি তাঁর মুখখানার ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললাম, "আমার মা।" আর একটা বাক্য মুখে এসেও অনুচ্চারিত রয়ে গেল, "গণেশপুরে ফেলে আসা কান্নাভরা আমার মা।"

॥ বোল ॥

রায় বাহাদুর বলদাস নাগ খুলনার বৃহত্তম জমিদারদের একজন। তাঁর রাজ-নৈতিক প্রভাবও অনেক। মিউনিসিপ্যালেটির চেয়ারম্যান। জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের ঘনিষ্ট বন্ধু ও পরামর্শক। জাসটিস অব পীস। জিলা এডুকেশন বোর্ডের সভাপতি। খুলনা যাশোহর জমিদার সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট। বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য। কলকাতায় গভর্ণর সাহেবের বাড়ীতে বছরে দু'তিন বার তিনি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। গভর্ণর যখন জিলা পর্যবেক্ষণে বেরোন, খুলনায় পদার্পণ করলে রায়বাহাদুর বলদাস নাগ, আরও কতিপয় চাউস ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাঁকে রেল স্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। তিনি জিলা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসলে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে প্রথম পংক্তিতে দেখা যায় রায়বাহাদুর বলদাস নাগকে।

এত প্রভাবশালী অর্থবান মানুষ সাধারণত যেমন হয়ে থাকে, রায়বাহাদুর বলদাস নাগও তাই। এর বেশি বাবা আমাকে প্রথম কিছু বললেন না। তিনি দয়া, সহানুভূতি বর্জিত নন, আমার নিষ্ঠুরতা, কঠোর শাসন, প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকেন! তাঁর কথাই আইন ও নিয়ম। কত সব প্রতিষ্ঠান-মঞ্চের তিনিই শিরমণি। কঠোর হাতে তিনি অবাধ্যদের বাধ্য করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের পাখা কেটে দেন। আঠারজন লাঠিয়াল নিয়ে তৈরি তাঁর নিজস্ব রক্ষী বাহিনী। এরা প্রজাদের বশে রাখে। খাজনা আদায় করে। ষড়যন্ত্রকারীদের করে শায়েস্তা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের দেয় না পা বাড়াতে। এদের কার্য কর্মের বিধি-নিয়ম নেই। ভয় দেখানো, ভয় শেখানো, এদের প্রধান কাজ। রায়বাহাদুর বলদাস নাগ জানেন, ক্ষমতায় থাকতে হলে ভয়ের পাত্র হওয়া বিশেষ দরকার।

রঘু আমাকে মুনসীজীর ঘরে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। আমি ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলাম আমাকে বাবা অতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে কি কাজ করছিলেন। ঘরটা মাঝারী সাইজের। মুনসী মানে রায়বাহাদুরের হিসাব রক্ষক। তার দখলে ঘরের অর্ধেকটা। সেখানে একটা অনেক পুরানো টেবিল, সঙ্গে চেয়ার। আর দুজন কেরানীর জন্য, মনে হল। ঘরটা রোজ একবার ঝাড়ু দিলেও ভীষণ

ময়লা। দেওয়ালে পানের পিক। আরও অনেক কিছুর দাগ। মাকড়সার জাল জুড়ে রয়েছে দেওয়ালগুলি। 'অনেক মাকড়সা ঘুড়ে বেরাচ্ছে বা জালবদ্ধ হয়ে ঝুলছে। ছাতের কোণে কোণে জমে রয়েছে বহু বছরের জটপাকানো ঝুল।

ঘরের বাকী অংশ আমার পিতৃদেবের। একটা কাঠের তক্তপোষ। তার ওপর তোষক। চাদর দিয়ে বিছানা পাতা। মশারী টানানোর দড়ি দেওয়ালে পেরেক পুঁতে। মশারীটা এখন উপরে গোটানো। বাবা সারা ঘরটাকে যথাসাধ্য সাফ করে নিয়েছেন। অন্তত মেঝের নোংড়া এখন পরিষ্কার। একটা ট্রাঙ্ক খাটের নিচে। তার পাশে আমার টিনের বাক্সও। আমার বিছানাটা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে একটা চেয়ারের ওপরে। দেখলাম একটা নতুন মাটির কুজো। জলে ভরা। চকচকে পরিষ্কার কাচের গেলাস।

রোদ গরম ছড়াচ্ছে। বেলা কতটা হয়েছে জানবার উপায় নেই। বাবার ঘড়ি নেই। আমার তো নেই-ই। ঘরের দেওয়ালে একটা পুরোনো ঘড়ি বহুকাল বন্ধ হয়ে রয়েছে। আমার শরীর স্নান করে, জামা কাপড় বদলে, গা ছেড়ে ঘুমোবার জন্তে অস্থির।

বাব বললেন, "ভাল ক'রে খেতে দিয়েছিল তো?"

আমি বললাম, "খুব ভালো করে।"

—"একা একাই খেতে হল তোকে?"

"—না। 'বড়মা' সামনে বসে খাওয়ালেন।"

শুনে বাবা খুব খুশি হলেন মনে হল। মন থেকে একটা ভার নেমে গেল।

—"কথাবার্তা হল?"

—"অনেক। বাড়ীর কথা খুঁটিয়ে জেনে নিলেন। কোন্ কলেজে পড়ব জানতে চাইলেন। কলকাতায় কার কাছে থাকবো, তাও।"

বাবা একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, 'এই নাগেরা আসল সদগোপ। খুলনা যশোহরে সদগোপেরা বর্ধিষ্ণু, সুন্দর। এককালে এরা বঙ্গের বার ভুঁইয়াদের লাঠিয়াল ছিলেন। কেউ কেউ তাদের সর্দার।

আমি বললাম, "বড়মা দেখতে খুব সুন্দর। আমার চোখে দুর্গা প্রতিমার মতো মনে হচ্ছিল।"

বাবা বললেন, "জাতে আমরা ওঁদের থেকে অনেক উঁচু। তুই কি ওঁকে প্রণাম করলি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, ওঁকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করতে ইচ্ছে হল।"

—"রাত্রে বলদাস নাগ মশাই ওঁদের সঙ্গে আমাদের আহারের নিমন্ত্রণ করেছেন। নাগ মশাইকেও প্রণাম করবি?"

—"আপনি কি বলেন?"

—"আমি ভাবছিলাম, প্রণাম করাই উচিত হবে। ষাঠ বছর পেরিয়ে গেছে নাগ মশাই'র। ক্ষমতাবান লোক। তা ছাড়া—"

আমি আর বাবাকে এগোতে দিলাম না। বললাম, "বেশ তো, প্রণাম করবো।" একটু পরে নিচু গলায় বললাম, "জাত-পাত আমি মানি না।"

কথাটা হয়ত পিতৃদেবের পছন্দ হল না। তিনি চুপ ক'রে গেলেন। আমি বলদাস নাগকে প্রণাম করতে রাজী হ'য়ে তাঁর মনের একটা ভার লাঘব ক'রে দিলাম।

বাবা এবার তাঁর সঙ্গে তিন দিন থাকবার সিদ্ধান্ত জানালেন। আমি আগেই খবরটা বড়মার মুখে শুনেছিলাম। এখন জানলাম বাবা কাকামণিকে লিখে দিয়েছেন। খুলনায় এসে পৌছানোর তৃতীয় দিবসে ট্রেনে চেপে আমি কলকাতায় যাচ্ছি। শিয়ালদা স্টেশনে আমাকে যেন কেউ 'মীট' করে। শুনলাম তাঁর বাসগৃহের একটু দূরে যে পায়খানা আছে, আমাকে তাই ব্যবহার করতে হবে। কাঁচা পায়খানা, ফ্ল্যাস নেই, রোজ মেথর এসে সাফ ক'রে দেয়। বাবা নদীতে স্নান করেন, আমাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। এখন আমরা স্নানের জন্তে তৈরী হব। আমি পায়খানা যেতে পারি। তুজনে একসঙ্গে নদীতে স্নান করবো। বাবা আরও বললেন, আজকের দিনটা তিনি ছুটি নিয়েছেন। অপরাহ্নে আমাকে স্কুলে নিয়ে গিয়ে হেড-মিস্ট্রেসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। তিনি দেখতে চেয়েছেন আমাকে। ওখান থেকে আমাকে নিয়ে তিনি বাজার যাবেন। আমার কিছু জামা কাপড়, চামড়ার জুতো কিনতে। পরে আমাকে নিয়ে আর এক রায়বাহাতুরের বাড়ী। ইনিও 'নাগ'। এ বাড়ীতে বাবা টিউশনি করেন সকাল বেলা।

এই দ্বিতীয় রায়বাহাতুরের নামটা আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে এঁর সঙ্গে বলদাস নাগ রায়বাহাতুরের আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক।

তারপর সামান্ত ইতস্তত করে বাবা বললেন, "আর একজন তোকে দেখতে চাইছে। আমার অনেক পুরানো ছাত্রী। বাংলা পড়ায় যশোহর কলেজে। হিন্দু মেয়ে। বাপ মায়ের আপত্তি অগ্রাহ্য করে এক মুসলমানকে বিবাহ করেছে। আমার

সঙ্গে বহুদিন যোগাযোগ নেই। হঠাৎ সেদিন স্কুলে এসে হাজির। কোথা থেকে শুনেছে তুই খুলনা হয়ে কলকাতা যাচ্ছিস। বাংলায় লেটার পেয়েছিস এ খবরও জানে। বলল, তোর সঙ্গে দেখা হলে খুব খুশি হবে।"

আমি বললাম, "বেশ তো, আমি কিছু শিখতে পারবো।"

বাবা আমার এ জবাব আশা করেন নি। চুপ ক'রে গেলেন। পরে বললেন, "কাছেই থাকে। সোজা রাস্তা এখান থেকে। গান্ধী পার্কের বাঁ দিকে। তোকে একাই যেতে হবে। আমার সন্ধ্যেবেলা ট্যিউশনি আছে।"

আমি বুঝতে পারলাম, যে হিন্দু মেয়ে মুসলমান বিয়ে করেছে বাবা তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নারাজ।

বললাম, "সময় যদি থাকে আমি একাই যেতে পারবো।"

বাপ-বেটায় আমরা নদীতে স্নান করতে গেলাম। বাবা অঙ্গার ও পোড়া তামাক পাতার গুড়ো একত্র ক'রে দাঁত মাজার পাউডার তৈরী ক'রে রেখেছেন। তারই একটু নিয়ে দাঁত মাজলেন। ধুতি ও সার্ট আমি সঙ্গে নিয়ে নিলাম। এবং আণ্ডারওয়ার। কাপড় কাচার সাবানও।` বাবা নিলেন ধুতি, একটা ধোওয়া ফতুয়া, সাবান। মাইল খানেক হেঁটে ভৈরব তীরে স্নানের ঘাট। পথে আমাদের মধ্যে অনুচ্চারিত অনেক কথা হল। আমি বাবাকে নিঃশব্দে প্রশ্ন করলাম, এই বিশ্রী নোংরা ছোট্ট ঘরে আপনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বাস করেন কি করে? এখন গ্রীষ্মেও তো হাঁপানী আপনাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছে না! সকাল সন্ধ্যায় ট্যিউশনি করেন, ছ'ঘন্টা স্কুলে ছাত্রী পড়ান। তার ওপর রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে স্কুলে পরীক্ষার খাতা বাঁধা থেকে হেড-মিস্ট্রেসের চিঠিপত্র লিখে দেওয়া: এমন একটানা পরিশ্রম ক'রে আপনি আমাদের মানুষ করছেন। মুখে শুনেছি, এখন চোখে দেখছি। কিন্তু না পারছি বিশ্বাস করতে, না পরিস্থিতি পুরোপুরি বুঝতে। আপনার জীবনে কী কোনো আনন্দ নেই? এখন তো 'টকি' সিনেমা এসেছে, দেখেছেন কি একটাও? নাটক দেখতে যান টাউন হলে? আপনি তো জেল খেটেছেন বিপজ্জনক যুবকদের মতো, ইংরেজদের কৃপায়? এখন কোনো রাজনীতি আছে আপনার? মার চিঠিগুলো কি আপনি যত্ন ক'রে রেখে দেন? স্কুলে তো অনেক মহিলা শিক্ষক, কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে আপনার? পুরুষ বন্ধু আছে ক'জন? তাঁদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সুযোগ পান? নাগেদের বাড়ীতে আপনাকে ভালো ক'রে খেতে দেয়?

বাবা আমাকে নীরবে কি সব প্রশ্ন করেছিলেন আমি আন্দাজ করবারও চেষ্টা

করিনি। প্রথম সন্তান, কলেজ যাবার মুখে পুত্রকে দেখে তিনি সন্তুষ্ট, না আশাহত? মনে পড়ল, আমি ভালো পাশ করেছি এ জন্য অভিনন্দন দেওয়া তো দূরের কথা, ঘটনার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি বাবা। অথচ খুলনা শহরে সম্ভবত এমন একজনও নেই যার কাছে খবরটা অজানা। নিশ্চয়ই এঁরা গেজেট খুলে খবর সংগ্রহ করে নি। গেজেটে রোল নাম্বারের সঙ্গে নাম উল্লেখ থাকে কিনা তাও আমার জানা নেই। তবে হ্যাঁ, আনন্দবাজারে আমার নাম বেরিয়ে ছিল বটে।

ভৈরবে স্নান করে খুব ভাল লাগলো। বাবা সাঁতরে কিছুটা দূরে চলে গেলেন তট থেকে। আমার গণেশপুরের পুকুরে স্নানের অভ্যেস, পদ্মায় স্নানের কথাই ওঠে নি কোনোদিন। আমি তটের কাছাকাছি ডুব দিলাম, সাঁতার কাটলাম। স্নানের শেষে বাবা বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র উচ্চারণ ও আমার অজ্ঞাত কোনো দেব বা দেবীকে প্রণাম করলেন। নিশ্চয় মা কালীকে, আমরা সবাই জানতাম তিনি কালীভক্ত।

রায়বাহাদুর নাগ মশাইয়ের বাড়ী ফিরবার পথেও বাক্য বিনিময় হল না।

বাপ ছেলের গল্প করা তখনকার শাস্ত্রে ছিল নিষিদ্ধ। ফিরে এসে কাপড় পরে দুজনে বসে আছি। বেশ গরম, আমাদের দেহ ঘামে ভিজে গেছে। গণেশপুরে বাড়ীর দক্ষিণে হাওয়া বইত সর্বদা, এখানে তা নেই। মুনসীজীর ঘরের দেওয়ালে জানলা মাত্র দুটি, তাও আকারে ছোট।

সেই রঘু এসে জানতে চাইল আমরা ভেতরে গিয়ে খাব কিনা।

আমি বাবাকে বললাম, আমার পেট ভরা। দুপুরে খাওয়ার মতো জায়গা নেই। বাবা রঘুকে বললেন, তিনি একাই খাবেন। নিজের ঘরেই খাবেন।

আমার এতক্ষণে খেয়াল হল মুনসীজী বলে তো কাউকে দেখতে পেলাম না। ঘরের অন্য অংশটা একেবারে খালি!

জিজ্ঞেস করতে বাবা বললেন, রায়বাহাদুর পত্নীর আদেশে তিন দিন মুনসী ও তার দুই সহায়ক অন্যত্র কাজ করছে। আমি আসছি তাই পুরো ঘরটাই আমাকে ও বাবাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বাবার জন্য আহার এলো। থালায় ভাত, তরকারী, মাছ, ডাল। মেঝেতে কুশাসন পেতে বসলেন বাবা। গণ্ডূষ করলেন, পরে আহার। ঘুমে আমার চোখটা ভারী হ'য়ে এল। নিজের অজান্তেই বাবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসতে এক মিনিটও লাগল না।

॥ সতের ॥

আমাদের সংবিধানে একুশ বছর না হলে কোনো নাগরিক প্রাপ্ত বয়স্ক হতে পারত না, পরে এই বয়সের সীমারেখাকে নামিয়ে আঠার বছর করা হয়। করা হয় মার্কিন দেশের ষাট দশকের প্রান্তিক বছরগুলিতে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুব-আন্দোলনের প্রভাবে। তখন মার্কিন দেশের যুবকদের আঠার বছর হলেই সরকারী দাপটে ভিয়েৎনামে অন্তত দু'একবছর লড়াই করতে হত। ছেলেরা দাবী করল, আঠার বছর বয়সে যদি আমরা দেশের জন্য মরবার অধিকার না চেয়েও পেতে পারি, তাহলে সে বয়সে ভোটের অধিকার পাব না কেন? লিনডন জনসন তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, আঠার বছরে প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন ছেলে-মেয়েরা ভোটের অধিকার পেয়ে গেল ১৯৬৮ সালে, তাদের ভোটে রিচার্ড নিকসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। নির্বাচন সংগ্রামে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা ছিল, "ভিয়েৎনাম যুদ্ধ শেষ করে আমি ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরিয়ে আনব।" অনুরূপ প্রতিজ্ঞা ১৯৫২ সালে আইসেনহাওয়ারকে প্রেসিডেন্ট হয়ে ওয়াশিংটন ডি. সি. তে পেনসিলভেনিয়া এ্যাভিনিউর হোয়াইট হাউসে প্রবেশের অধিকার দিয়েছিল।

পনের বছরে যে গ্রাম্য ছেলেটি প্রথম কলকাতায় পদার্পণ করল, তখনও তাকে তরুণই বলতে হয়। খুলনা শহর ছাড়বার আগে তার পিতৃদেব তার কাপড়ের এক কোণার মধ্যে দশ টাকার একটা নোট বেঁধে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তার সঙ্গে একটা টাকা ও কিছু খুচরো পয়সা ছিল। কলকাতার বীডন স্ট্রীটে ২৯ নম্বর বাড়ী তার গন্তব্যস্থল। পিতৃদেব তাঁর ভাই সূর্যকান্তকে চিঠি লিখেছিলেন, শিয়ালদা স্টেশনে কেউ এসে যেন এই তরুণকে অজানা-অচেনা শহরে বাড়ী নিয়ে যায়।

ট্রেনের থার্ড ক্লাসে গায়ে-গায়ে ভিড় তখন অনেক বেশি ছিল। নিম্নতম শ্রেণীতে তখনও সীট রিজার্ভেশন চালু হয়নি। যাত্রীদের অনেকে মালপত্র ছাড়াও তরী তরকারী, জাল দিয়ে বাঁধা ধামা ভরতি মোরগ-মুর্গী সঙ্গে নিয়ে আসত মাত্র পাঁচ ঘণ্টার পথ পেরিয়ে কলকাতায় বিক্রি করতে। জানলার ধারে সীট পেয়ে আমি বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে ধাবমান বনানী, গ্রাম, শহরের পিছু-হটা গতি দেখে, বাবার কথা ভেবে, মনে একরাশি ভয় নিয়ে কখন যেন হঠাৎ শিয়ালদা পৌঁছে গেলাম।

হুড়োহুড়ি করে লোকেরা নামতে লাগলো। কুলিদের আক্রমণে কামরাটা একরকম রণস্থলে পরিণত হল। আমি অপেক্ষা করাই বিবেচনার কাজ মনে করলাম। কয়েক মিনিটে পুরো কামরাটা খালি হয়ে গেল। একটা কুলি আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেলাম।

—"বাবু, কুলি লাগবে না?"

আমি আমার সন্ত জানা হিন্দীতে জবাব দিলাম, "অবশ্য লাগেজা।"

কুলি সশ্রদ্ধায় আমার টিনের বাক্স, সতরঞ্চিতে বাঁধা বিছানা অনায়াসে মাথায় তুলে নিল।

বলল, "চলে এসো বাবু।"

আমি নিচে নামলে, কুলি জানতে চাইলে আমার গন্তব্যস্থান কোথায়? বাহন কি ট্যাক্সি না রিক্সা?

আমি বললাম, "বীডন স্ট্রীট, রিক্সা।"

হনহন করে এগিয়ে চলল লোকটা। আমি তার মুখ দেখিনি ভাল করে। শুধু দেখেছি মোটা লম্বা, খাটো শরীর, মাথা কামানো। তার গতির সঙ্গে স্টেশনের ভিড় ও কোলাহলে কাটিয়ে পা রেখে চলা বুঝতে পারলাম সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য একজন কারুর আসার কথা। কে আসবে আমার জানা নেই। কুলিটা আমাকে যে দরজা দিয়ে স্টেশনের বাইরে নিয়ে গেল সেখানে পরিচিত কোনো লোক নজরে পড়ল না। আমিও নজরে পড়লাম না কারুর। লোকটা হনহন করে আমাকে একদল লড়াকু বাজপাখি অর্থাৎ রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে নিয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন বেশ পেটমোটা রিক্সাওয়ালা আমার টিনের বাক্স ও সতরঞ্চি মোড়া বিছানা প্রায় কেড়ে নিজের গাড়ীতে রেখে হুকুম করল, "গাড়ীতে বোস।"

কুলি এক টাকা মজুরী চাইতে তার ওপর ক্ষেপে উঠল রিক্সাওয়ালা, "ইয়ার্কি পেয়েছ! দেহাত থেকে আসা বাচ্চা একটা ছেলের ওপর দিনে দুপুরে ডাকাতি!" এবার আমাকে, "দিয়ে দাও ভায়া ওকে আট আনা।" আমি পকেট থেকে আটআনা বার করে কুলির হাতে দিতেই সে ধাবমান হল। রিক্সাওয়ালা তখনও রেগে রয়েছে। "ছ'আনার বেশি পাওনা ছিল না বেটার। যতসব ডাকু বদমাস এসে ভিড় করেছে ইষ্টিশানে।"

এখন আমি লোকটাকে জেনে গিয়েছি। বেঁটে মোটাসোটা দৃঢ় শরীর। খুব ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখে বসন্তের দাগ। কপালের ডান দিকে একটা বড় কাটা

দাগ। গভীর ক্ষত শুকিয়ে গেলে যেমন হয়। পুরু কালো ওষ্ঠাধর, কিন্তু দাঁতগুলি খুবই সাদা। মোটা মাংসল গাল, ছোট ছোট চোখ, ভ্রূ নেই। থুতনিও নেই।

—"কোথা যাবে ভাইয়া?" দুহাতে রিক্সার দুটো হাতল তুলে নিয়ে প্রশ্ন করল লোকটা।

—"২৯ নম্বর বীডন স্ট্রীট।"

—"ওটা কোন পাড়ায় আছে?"

আমি তখন বেশ ভড়কে গেছি। কলকাতায় যে অনেকগুলি পাড়া রয়েছে তা জানা নেই আমার।

রিক্সাওয়ালা জানতে চাইলো, "শ্যামবাজার? মানিকতলা? রাধাবাজার? বৌবাজার?"

আমি এবার জোর দিয়ে বললাম, "না। ২৯ নম্বর বীডন স্ট্রীট।"

লোকটা আমার মুখটা বেশ ভালো করে দেখে নিল। তারপর ছুট লাগালো। খুলনা শহরে সাইকেল রিক্সা, ঢাকায়ও আমি সাইকেল রিক্সায় চড়েছি। মানুষ-টানা গাড়ীতে চড়ার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। বহু রকমের যানবাহন—ট্রাম, মোটর গাড়ী, লরী, ঠেলা গাড়ী, বাস সবকিছুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল মানুষ-টানা দুই চাকার গাড়ী। চলল একটা প্রশস্ত কুতসিৎ শহরে ছিন্নভিন্ন রাস্তার বুক চিরে, যার সংখ্যাহীন মানুষের মধ্যে একটাও আমার পরিচিত নয়। মানুষগুলি যেন হন্তে হয়ে যে যার কাজে ছুটছে। কাজ না থাকলেও ছুটছে।

রিক্সাওয়ালা অনেক পথ অতিক্রম করে হাজির হল যে পাড়ায় সেখানে অধিকাংশ মানুষই নেপালী। আমার মুখের চেহারা দেখে সে নিশ্চয়ই আমাকে নেপালী সাব্যস্ত করে নিয়েছিল। আমি হাঁউমাঁউ প্রতিবাদ করে তাকে জানালাম, নেপালী আমি নই, নিছক গ্রামের বাঙালী, সদ্যমাত্র হাজির হয়েছি কলকাতা শহরে, তার উপর একান্ত নির্ভরশীল আমার গন্তব্যস্থান। ২৯ নম্বর বীডন স্ট্রীটে। সে লোকটা কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বীডন স্ট্রীটের দিশারা নিয়ে নিল, এবং আরও কিছুক্ষণ দৌড়ে, হেঁটে, আবার দৌড়ে, আবার হেঁটে, শেষ পর্যন্ত একতলা যে বাড়ীটার সামনে আমাকে পৌছে দিল, তার গায়ে দেখলাম ২৯, রাস্তাটা যে বীডন স্ট্রীট তা আমি আগেই পড়ে নিয়েছিলাম।

দরজায় কড়া নাড়তে বেশ একদল লোক বেড়িয়ে এলেন। তাদের মধ্যে দেখতে পেলাম আমার কাকামণি, কাকিমা, দিদি, খুড়তুতো ভাই বাদল। বহুদিনের পুরানো

অনেকটা অচেনা মুখের পিসিমা, তার পুত্র দাদামণি। সবাই আমাকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলেন। জানা গেল দাদামণি আমাকে তুলে আনবার জন্য শিয়ালদা স্টেশনে মেন গেটে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু রিক্সাওয়ালা একপাশের গেট দিয়ে বার করে আমাকে হাজির করেছিল নেপালী পাড়ায়। বেশ কিছু কথা কাটাকাটি হবার পরে কাকামণির হাত থেকে পারিশ্রমিক নিয়ে রিক্সাওয়ালা বিদায় হল। গণেশপুরের পনের বছরের একটি ছেলে মাত্র দিন কয়েক খুলনা শহরে পিতার সঙ্গে বাস করে প্রথম পদার্পণ করল রাজধানী কলকাতার এক জলজ্যান্ত পাড়ার বসত বাড়ীতে।

এই বাড়ীটার কথা আমি বলে নিই। একতলা লম্বা বাড়ী, পর পর চারখানা ঘর। এই চারখানা ঘরে বাস করেন আমার চার আত্মীয় পরিবার। প্রথম একখানা ঘরে গণেশপুর গ্রামের বাড়ীর শরিক জ্যেঠামশাই-এর তিন ছেলে, তিনি নিজে এবং তাঁর এক কন্যা, যাকে আমি বলতাম ছোটদি। দ্বিতীয় ঘরে আমার কাকার সারা পরিবার অর্থাৎ নিজে, কাকিমা ও পাঁচ ভাইবোন। তৃতীয় ঘরে একা বাস করেন আমার খুড়তুতো পিসিমা। যাঁর স্বামী অমলেন্দু দাশগুপ্ত অনুশীলন দলের কট্টর বিপ্লবী ছিলেন। মুক্তি পাবার পরে 'রাজবন্দী' নামে সমাদৃত একটি পুস্তকে দেউলীতে রাজবন্দী শিবিরে বিপ্লবীদের উপর ইংরেজ সরকার যে সব সদয় ব্যবহার করতেন তার মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছিলেন। পঞ্চম ঘরটিতে বাস করেন আমার পিসিমা, পিসতুতো ভাই 'দাদামণি', আমার দুই যমজ পিসতুতো দিদি, অনু ও রেণু। অনুদি ও রেণুদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সুমধুর। দুজনেই বেথুনে পড়ত, সঙ্গীতে ও নৃত্যে পারদর্শী ছিল। এদের দুজনের জীবনও নাটকীয় ও ঘটনাবহুল। কিন্তু সে সব নাটক এই পিতৃ-পরিচয়ে স্থান পাবে না।

কাকিমার কথায় আমি স্নান করে নিলাম। খোলা উঠানে বিরাট এক চৌবাচ্চা। নল একটাই, কিন্তু জলের সরবরাহ অবিরত, অতএব চৌবাচ্চা সব সময়েই প্রায় ভরপুর। চৌবাচ্চার পাশে ছোট্ট একটা বারান্দাতে কাকিমার রান্নাঘর, ওখানে পিঁড়ি বা আসন পেতে সবার খাবার ব্যবস্থা। খেতে বসে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে খুলনা ছাড়বার আগে বাবা একটা পুরো দশ টাকার নোট আমার ধুতির কাছার কোণে বেঁধে দিয়েছিলেন। আমি হুস্ করে লাফিয়ে উঠে চৌবাচ্চার কাছে ছুটে যেতে যেতে বললাম, "হায়, হায়, আমার দশটা টাকা বোধহয় ভিজে গলে গেছে।" কাকামণি নিজে এগিয়ে এসে কাছার কোণার শক্ত গেরো সাবধানে খুলে অর্ধেকেরও বেশি ভেজা নোট খানা বার করলেন। তাকে সযত্নে শুকোতে দেওয়া হল। এ-নিয়ে সারা বাড়ীতে হাসাহাসি,

ব্যস্ত তো হোলই, সঙ্গে সঙ্গে অনেকে সদয় মন্তব্য করলেন, "পড়াশুনায় ভাল ছেলেদের বৈষয়িক ব্যাপারে খেয়াল থাকে না।"

আমাদের ঘরখানা বেশ বড়সড় ছিল। তার এক কোণে দেওয়াল ঘেষে তৈরী হল আমার বাসস্থান। দেওয়ালের গায়ে বইপত্র সাজিয়ে রাখা হল। দেওয়ালে ছুটো পেরেক পুঁতে দড়ি টানিয়ে তৈরী হল জামা কাপড় রাখবার 'আলনা'। রাত্রিতে পর পর সবাই আমরা এক বিরাট ঢালা বিছানায় শুয়ে পড়তাম। আমার পাশে শুতো বাদল, গলাগলি খুড়তুতো ভাই, আমার চেয়ে এগারো মাসের ছোট। মুসকিল হত পড়া নিয়ে। ঘরে ও সারা বাড়ীতে পড়ার জায়গা ছিল না। সকাল পাঁচটায় উঠে আমি বইপত্র নিয়ে ছাতে চলে যেতাম। অন্তত দু ঘণ্টা নির্বিঘ্ন মনোযোগে পড়াশোনার সুযোগ হত। পরে আমার খুড়তুতো পিসিমা, যিনি কর্পোরেশন স্কুলে পড়াতেন এবং যাঁর স্বামী তখনও জেলে, কাজে যাবার সময়, তাঁর ঘরের চাবি দিয়ে যেতেন। এতে আমার পড়াশোনার সুবিধে আরও অনেক বেড়ে গেল।

॥ আঠার ॥

প্রথমেই যে প্রশ্ন উঠলো তা হল কোন কলেজে কত সুবিধেতে ভর্তি হওয়া যায়। তিনটে লেটার পাওয়া ছাত্রের সংখ্যা কলকাতায় এসে দেখলাম অগুন্তি। যদিও গণেশপুরে ছিল একটি। খুড়তুতো পিসিমা, যাকে ডাকতাম মুরলা পিসি, বললেন, বিদ্যাসাগর কলেজে গভর্ণিং বডির এক সভ্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। সেখানে বিনামূল্যে পঠন এবং ক্ষুদ্র একটি বৃত্তি পাওয়া সম্ভব।

কলেজ নিয়ে কোনো অভিভাবকদের মধ্যে কোনো মতভেদ দেখা গেল না। অতএব মুরলা পিসির সঙ্গে আমি একদিন শঙ্কর ঘোষ স্ট্রীটে এক মহাশয়ের গৃহে পৌঁছে গেলাম করুণাপ্রার্থী হিসেবে। তাঁর নাম মনে নেই, মনে আছে তাঁর বাড়ীটা খুব বড়, বৈঠকখানা সোফাসেট চেয়ার টুল ইত্যাদি ছাড়াও একটা বড় বড় ফরাসে সজ্জিত, অর্থাৎ এক বা একাধিক সতরঞ্চির উপর একটা বিশাল সাদা ধবধবে চাদর বিছানো। কয়েকটা ছোটছোট কোলবালিশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

মহাশয় ছিলেন এ্যাডভোকেট, ঘরে বেশ কয়েকজন লোকের উপস্থিতি। খুব আড়ষ্ট হয়ে মুরলা পিসির সঙ্গে ঘরে ঢুকে চাদরের একপাশে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে এ্যাডভোকেট মহাশয় মুরলা পিসিকে প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি প্রয়োজন?"

মুরলা পিসি আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "এটি আমার ভাইপো"—বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এগিয়ে গিয়ে মহাশয়ের চরণ স্পর্শ করে নিলাম।

—"তিনটে লেটার পেয়ে পাশ করেছে, আমার দাদা দরিদ্র স্কুল শিক্ষক, একে বিনা বেতনে পড়ার এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

এ্যাডভোকেট মহাশয় আমার নাম, ধাম, স্কুল ইত্যাদি নিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। বললেন, "দরখাস্ত এনেছ? সঙ্গে মার্কশিট আছে?"

দরখাস্ত ও মার্কশিটের ওপর চোখ বুলিয়ে প্রভাবশীল কণ্ঠে বললেন, "ফ্রী-শিপ তো হয়ে যাবে। বৃত্তি প্রথম বছর পাওয়া অসম্ভব। স্টার পাওয়া ছেলে অন্তত পনেরটি।"

তারপর আমাকে হতাশ দেখে প্রশ্ন করলেন, "থাকা খাওয়ার জায়গা আছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমার কাকা এখানে আছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে মুরলা পিসিমাও বললেন, "তাঁর পাঁচটি সন্তান ও তিনি বর্তমানে বেকার।"

আমার কাকা যিনি অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম এম. এ. তে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কখনও দীর্ঘকালীন কোথাও কাজ করতে পারেননি। বঙ্গদেশে তাঁর ভাত ছিল না। সবচেয়ে দীর্ঘকাল কাজ করেছিলেন বর্তমান পাকিস্থানে বাহাওয়ালপুর রাজ্য কলেজে, কিছুদিন নেপালে কোনো না কোনো রাণার পুত্র বা পুত্রদের ছিলেন প্রাইভেট টিউটর, কিছুদিন কাজ করেছিলেন ভাগলপুর কলেজে, অনেক পরিণত বয়সে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব চাকরীর ব্যবধানে তাঁকে বছরের পর বছর বেকার থাকতে হত. দুর্দান্ত অহমিকার জন্য কারও কাছে কিছু চাইতে পারতেন না। কাকিমা যে কি করে সংসার চালাতেন তা নিয়ে আমার কোনো কৌতূহল ছিল না। দেখতে পেতাম আমরা সবাই তিনবেলা খেতে পাচ্ছি। আমাদের কারুর কোনো অভাব নেই। কাকামণি অ্যাকচুয়ারি পরীক্ষা দেবার জন্য অনবরত অঙ্ক কষতেন। মাঝে মাঝে তাঁকে খুব গম্ভীর চিন্তান্বিত দেখাত। প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে ভজন পূজন করতেন। অনেকগুলো ভজন আমার তরুণ মন ও ক্ষুধার্ত হৃদয়কে বেশ কিছুটা শান্তি ও পূর্তি এনে দিত।

বীডন স্ট্রীট থেকে শঙ্কর ঘোষ স্ট্রীটের কলেজ বড়জোর দেড়মাইল হবে। ট্রামে চড়তে ভয় ও অর্থের অভাব, আমি হেঁটে কলেজে যেতাম ও বাড়ি ফিরতাম। বাবার একটা শার্ট গায়ে ঢিলাঢালা দেখাতো, পায়ে চটি। খুলনা বাজারে আমি চামড়ার জুতো কিনতে রাজী হইনি, কিনেছিলাম একজোড়া স্যাণ্ডেল। মনে হতো গণেশপুর স্কুলে যাচ্ছি। একমাসের মধ্যে জানানো হল বেতন আমার মার্জনা করা হয়েছে; কিন্তু বৃত্তি পেতে প্রথম বছর খুব ভালো ফল দেখাতে হবে।

ক্লাসে দেখতে পেলাম অন্তত দশটি ছেলে ম্যাট্রিকে স্টার পেয়েছে, বিশেষ করে সংস্কৃত ক্লাসে তাদের উচ্চারণ ও ব্যুৎপত্তি আমাকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করত। এক সংস্কৃত অধ্যাপকের কথা মনে আছে, নাম অক্ষয়বাবু। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ক্লাসে বক্তৃতা করতেন। আর এক জন অধ্যাপক, যাঁর নাম মনে নেই, তিনি কালিদাসের রঘুবংশ পড়ানোর আগেই ছাত্রদের বলে দিয়েছিলেন যে তাঁর নিজের টীকাকৃত সংস্করণ 'বাজারে সর্বোত্তম'। কোনো অধ্যাপক আমার মনে গভীর রেখাপাত করতে পারেন নি, গ্রামের সেই উমেশবাবু ছাড়া। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে পারে না।

আমার ঝোঁক ছিল ইংরেজী, ইতিহাস ও সিভিক্সের উপর, সিভিক্সের সঙ্গে আমাদের একটু ইকনমিক্সও পড়তে হত। এখনকার ছেলেমেয়েরা দ্বাদশ শ্রেণীতে পঠনপাঠনের যে বিরাট ভার বহন করে, কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য তাদের যে পরিমাণ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করতে হয়, আমাদের সময় ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে তার একাংশ ভারও বইতে হতো না।

তবু আমার মনে আছে একজন ইংরেজী অধ্যাপক এক নিঃশ্বাসে দু' তিন মিনিট একটানা স্রোতের মতো ইংরেজী বলে, হঠাৎ থেমে, সমস্ত চমৎকৃত ছাত্রদের চোখমুখে বিকশিত প্রশংসা ও বিস্ময় সানন্দে উপভোগ করে নিতেন।

মনে আছে এক সংস্কৃত অধ্যাপক পকেটে ছটি ফাউণ্টেন পেন রাখতেন ও রোলকল করার আগে প্রত্যেকটি এক একবার পরখ করে শেষ পর্যন্ত একটিকে বেছে নিতেন। সারা কলেজের ছাত্ররা ভিড় করত এক অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনবার জন্য, বিখ্যাত জে. এল. ব্যানার্জি। তাঁর ক্লাসে দাঁড়াবার স্থান পাওয়া যেত না।

বিদ্যাসাগর কলেজে প্রচুর ছাত্র, কিন্তু কো-এডুকেশন নেই। শঙ্কর ঘোষ স্ট্রীট দিয়ে মেয়েদের কলেজের বাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রেরা হৈ চৈ করত, সিটি মারত এবং দু-চারটে অশ্লীল কথাও বলে ফেলত। মেয়েদের মধ্যে দু-চারজনকে আমি হেসে ফেলতে দেখতাম। বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্র-কালে আমার কোনো ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয় নি। এ নিয়ে খুব একটা আক্ষেপও ছিল না। কেননা ২৯ নম্বর বীডন স্ট্রীটের ছাদে সকাল ও মাঝে মাঝে গোধূলি পর্যন্ত পড়ার সময় ৩০ নম্বর বাড়ীর একটি মেয়ের দর্শন প্রায়ই পেতাম। অত সুন্দরী যুবতী মুখ তার আগে আমার চোখে পড়েনি।

মেয়েটির নাম ছিল গীতা মিত্র। তার ভাই একদা বিখ্যাত সাঁতারু দিলীপ মিত্র, দীর্ঘাঙ্গ, সুপুরুষ মজবুত দেহ। গীতা মিত্রের সঙ্গে আমি সম্ভবত দশ-বারোটি বাক্য বিনিময় করেছিলাম, উপলক্ষ্য ছিল তার বাবা বা মায়ের অসুস্থতা। মনে আছে গীতা মিত্র সপ্রতিভ ও মধুরকণ্ঠী। কলকাতার এক রাজবন্দী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ওদের বাড়ীর একতলায় ডিস্পেনসারি খুলে বসলেন। সেখানেও মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। কিন্তু বাক্য বিনিময় হত না। দিলীপ মিত্রের সঙ্গে আমার একটিও বাক্য বিনিময় হয়নি, কিন্তু তিনি যখনই আমার নজরে পড়তেন, তার দীর্ঘ সবল দেহ আমি প্রশংসার চোখে দেখে নিতাম।

॥ উনিশ ॥

বিদ্যাসাগর কলেজের জীবন ঘটনাবহুল হতে পারে নি। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা এখানকার ছাত্র, অধ্যাপকেরাও শুনতাম কম মাইনে পান। প্রিন্সিপ্যাল, যাঁর নাম স্মরণে নেই, আমাদের ইতিহাস পড়াতেন. তাঁর পড়ানোর যতটা নাটকীয়তা ছিল ততটা সারবত্তা ছিল না। তিনি সোজা বলে দিতেন, "এল এম. মুখার্জীর বই মুখস্ত ক'রে নাও" এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের প্রণীত একটি প্রশ্ন ও উত্তর-ভিত্তিক ইতিহাসের বই নাটকীয় কণ্ঠে সুপারিশ করতেন।

ক্লাসে দশটি স্টার পাওয়া ছেলে, তারা প্রায় সবাই পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র। তাদের তিনজনের সঙ্গে ছিল আমার বন্ধুত্ব। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তথাকথিত খারাপ ছেলেদের সঙ্গে আমার ভাব হতো বেশি ও থাকতো দীর্ঘকাল। কোথায় কোন্ সুদূরে একটি খেলার মাঠ ছিল, ছাত্রেরা সেখানে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলত। ক্রীড়া বিমুখ আমি সে মাঠের মুখদর্শন করিনি। বাংলা সিনেমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এখনও সুখকর। 'চিত্রা' প্রেক্ষাগৃহে আমার প্রথম দেখা ছবি প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি'। সে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি।

বিদ্যাসাগর কলেজে বন্ধুর অভাব ছিল প্রখর। আমি প্রথম বুঝতে পারলাম গ্রাম ও শহরের বন্ধুত্বতার প্রভেদ। গণেশপুর স্কুলের ও গ্রামের বন্ধুদের আমি সরাসরি ঘরের মধ্যে নিয়ে আসতাম। আমার বিছানার খাটে অথবা হাতভাঙ্গা চেয়ার ও নড়বড়ে বেঞ্চিতে বসে আমাদের আড্ডা হোত। মা অনেক সময় সরষের তেল মাখা মুড়ি দিয়ে যেতেন। কদাপি কখন তার সঙ্গে মেশানো থাকতো নারকেলের টুকরো। কলকাতায় দেখলাম বন্ধুতার দৌড় কলেজ প্রাঙ্গণে, রাস্তায়, রেস্টুরেন্টে এবং বড়জোর বন্ধুর বাড়ীর দরজা পর্যন্ত। কলকাতায় যাকে 'রক' বলে তার উপর বসে আড্ডার সমাপ্তি। এমন একজনও বন্ধু হয়নি বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় যার বাড়ীর দরজা খুলে অন্তত বসবার ঘরে প্রবেশের আন্তরিকতা পেয়েছি। পরে মনে হোত অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালীর বাড়ীতে বসবার ঘর বলে কিছু হয়ত ছিল না। কোনো মধ্যবিত্ত বাড়ীর দরজার পর্দা দেখতে পাইনি।

একটি বন্ধুর বাড়ীতে শুধু প্রবেশ নয়, অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সুযোগ এসেছিল এক

বিপর্যয়ের আনুকূল্যে। ভক্তি দাশগুপ্ত (আসল নাম নয়) স্টার পাওয়া অতিশয় কৃশ দুর্বল ও নিঃশব্দ ছাত্র। ইণ্টারমিডিয়েটের দ্বিতীয় বছরে কলেজের অধ্যাপকরা পনেরটি ছাত্রকে আলাদা করে প্রতিদিন দু'ঘণ্টা বেশি টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা করেছিলেন। এদের মধ্যে আমারও স্থান হয়ে গিয়েছিল এবং ভক্তি দাশগুপ্তেরও।

হঠাৎ দেখা গেল ভক্তি চারদিন কলেজে অনুপস্থিত। কলেজের অদূরে সিমলা স্ট্রীটে তার বাড়ীর দরজা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার গল্প করতে করতে আমরা দুজনে গেছি তারপর আমাকে বিদায় নিতে হয়েছে। আমি যেহেতু থাকতাম আমার কাকার সঙ্গে শুধু একখানা ঘরে এবং ২৯ নম্বর বীডন স্ট্রীটে রক পর্যন্ত ছিল না, কোনো বন্ধু কোনোদিন আমাকে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী পৌছে দেয় নি। ভক্তির চারদিনের অনুপস্থিতি আমাকে দুশ্চিন্তিত করল। আমি তার বাড়ীর দরজায় হাজির হলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে তাকে ডাকতে ডাকতে কিছুক্ষণ পরে একখানা শীর্ণহাত দোতালার জানলা দিয়ে বেরিয়ে এলো। তার পেছনে একটি শীর্ণ কণ্ঠ—"ভক্তি অসুস্থ, তুমি কে?" আমার নাম শুনতে পেয়ে বললেন, "সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসো। দোতালায় উঠে ডান দিকে চার নম্বর ঘর আমাদের।"

সিমলা স্ট্রীটের ঐ বাড়ীটার কথা আমি এখনও ভুলিনি। বেশ বড় দোতালা বাড়ী। মেরামতের অভাবে দেওয়াল বুড়ো মানুষের দাঁতের মতো নড়বড়ে। যে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হল তাতে ঝাড়ু পড়ার চিহ্ন নেই। যদি বা এককালে কাঠের একটি রেলিং ছিল, এখন শুধু তার জীর্ণ ভগ্নাবশেষ। সমস্ত বাড়ীটায় একখানা, বড়জোড় দুখানা, ঘর নিয়ে এক একটি পরিবারের বাস। এক তলায় কলকাতার সেই অতি পরিচিত শেওলা পিছল উঠোন, বড় একটা চৌবাচ্চা, দুপাশে দুটো নলের সঙ্গে লোহার পাইপ যোগ করে চৌবাচ্চায় জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা। ঐ উঠোনে নলে চৌবাচ্চায় সারা বাড়ীর সম্ভবত শতাধিক মানুষের স্নান, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কাপড় ধোওয়া। এ নিয়ে ঝগড়া কলহের বিরাম নেই। মহিলাদের কুপিত উচ্চ কণ্ঠ বাড়ীটার একমাত্র সঙ্গীত।

আমি দোতালায় উঠেই ডান পাশ মোড় নিতে দেখতে পেলাম একখানা ঘরে চারপাঁচটা শিশু ও বালক বালিকা দুষ্টুমি করার জন্য মায়ের হাতে প্রহৃত হচ্ছে এবং তাদের সমবেত কণ্ঠের কান্না মিলিত হচ্ছে উঠোনে তিন জন মহিলার জল নিয়ে কলহের সঙ্গে। দুটো ঘর এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম একখানা ঘরের দেওয়ালের উপরে একটা অনেক পুরানো কাঠের ফলকে প্রায় উঠে যাওয়া অক্ষরে লিখিত সন্তোষ

দাশগুপ্ত। বন্ধ দরজায় আস্তে কড়া নাড়তে এক মহিলা কপাট খুলে সামনে দাঁড়ালেন। ছোটখাটো বিশীর্ণ ধূসর চেহারা। অথচ পরিষ্কার বোঝা যায় এককালে সুন্দরী ছিলেন। আমার বুঝতে এক মুহূর্ত লাগল ইনি ভক্তির মা। পা-ছুঁয়ে প্রণাম করতে তিনি বললেন, "ঘরে এসো।" ঘরে ঢুকে দেখলাম দুটি রোগ-শয্যা। একটির উপরে কাতরাচ্ছেন এক বৃদ্ধ, মাথায় সাদা বাবরি চুল, দাড়ি গোঁফে জঙ্গলীকৃত মুখ, বেদনায় বিকৃত দুটো চোখ টকটকে লাল।

ঘরের অন্য পাশে বিছানায় শুয়ে আছে ভক্তি। আমি তার পাশে মুখোমুখি দাঁড়াতে সে কাহিল হাসল। তার মা বললেন, "আজ চারদিন ধরে জ্বর। কোমর থেকে পা পর্যন্ত অবশ।" আমি জানতে চাইলাম কি চিকিৎসা হচ্ছে। বললেন, "এ বাড়ীতেই কবরেজ আছে, তার গুলি খাচ্ছে।"

আমার নজরে পড়ল ঘরের এক চতুর্থ মানুষের ওপর। আমাদের চেয়ে বয়সে কিছু বড় একটি মেয়ে, বড় বড় মাঠের মতো ফাঁকা দুটি চোখে কি যেন খুঁজে বেরাচ্ছে নিজের মধ্যে অথবা নিষ্ঠুর জীবনে। ভক্তির মা বললেন, "এ আমার মেয়ে, অতসী।"

অতসী দিদিরই কথা আমি ভক্তির মুখে শুনেছি। আমি ভক্তির পাশে বসে বললাম, "আমি এক রাজবন্দী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের এক দালানের সহবাসী। শুনেছি তিনি ভাল চিকিৎসা করেন। ওকে নিয়ে আসব তোমাকে দেখবার জন্য?"

ভক্তি ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "ফি দিতে পারব না।"

রাজবন্দী ডাক্তারের নাম মনে নেই, শুধু মনে আছে সামনে হাজির হতে দেখতে পেলাম তাঁর টেবিলের সামনে বসে আছে গীতা মিত্র। আমার বুক কাঁপল। নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ডাক্তারবাবুর প্রথম প্রশ্ন কানে ঢুকলো না। গীতা মিত্র বোধহয় আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন, নিজের চেয়ার একটু সরিয়ে নিয়ে পাশের চেয়ারের দিকে ইংগিত করে বললেন, "বসুন না।"

এবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার কথা হল। তাকে ভক্তির রোগের বৃত্তান্ত বলার পরে তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে জনডিস, দেখতে হবে।"

আমি বললাম, "আপনাকে রিক্সা করে নিয়ে যেতে আমি এখনই তৈরী।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আমার ফি দু-টাকা এবং রিক্সার ফেরৎ ভাড়াও দিতে হবে।"

তখন কলেজের দ্বিতীয় বছরে আমি মাসে সাত টাকা বৃত্তি পাই। নিজেকে বেশ ধনী ধনী মনে হয়। বললাম, "এক্ষুনি যাবেন?"

তিনি বললেন, গীতাকে ওষুধটা দিয়ে নি।"

আমি এবার অনেক সাহস সঞ্চয় করে প্রতিবেশিনী গীতা মিত্রকে প্রশ্ন করলাম, "কার অসুখ?"

গীতা বলল, "মা'র, বোধহয় ম্যালেরিয়া।"

ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় ভক্তি দশ দিনে সুস্থ হয়ে উঠলো।

আমাদের টিউটোরিয়ালে আসবার মতো শক্তি সঞ্চয় করবার পর একদিন বলল, "আমার বাবা খুব অসুস্থ। কিন্তু কিছুতেই ওষুধ খাবেন না।"

জানতে চাইলাম অসুখটা কী। ভক্তি বলল, "আমরা কিছুই জানি না। কাউকে কিছুই বলেন না। শুধু কাৎরান আর মেজাজ করেন। এর মধ্যে পড়াশুনা কি সম্ভব?"

ভক্তির অসুখের সময় আমি রোজই ওকে দেখতে যেতাম। ওর মা ও দিদির সঙ্গে আমার কিছুটা ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। ভক্তির কাছে ওর বাবার রোগের গুরুত্ব জানতে পেরে আমি একদিন বুকে খুব সাহস বেঁধে, তাঁর পাশে বসে বললাম, "যে ডাক্তার ভক্তিকে ভালো করে দিয়েছেন, তাঁকে নিয়ে আসব আপনাকে দেখতে?

দু-চার মিনিট তাঁর মুখে কথা নেই। বড় বড় কটকটে চোখ দিয়ে আমাকে দেখছেন। ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপছে। তবুও আমি সাহস করে বললাম, "চিকিৎসা না করলে ভাল হবেন কি করে?"

ভাঙা কর্কশ স্বরে জবাব এলো, "ভাল হবার দরকার নেই।"

আমি সহজে ছাড়লাম না, বললাম, "আপনি এত কষ্ট পেলে ভক্তি পড়বে কি করে? পরীক্ষার তো মাত্র ছ'মাস দেরী।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, সেই কর্কশ ভাঙা স্বরে, "নিয়ে আসতে পার। আমাকে শুধু দেখতে হবে। কোনো প্রশ্নের জবাব আমি দেবো না।"

ডাক্তারবাবুর কাছে হাজির হলাম। ভক্তির বাবা একসময়ে ময়মনসিং অথবা কোথায় যেন স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। একটা বাংলা-ইংরেজী অভিধান রচনা প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। কোনো প্রকাশক উৎসাহ দেখায়নি। আর একখানা ইংরেজী বাংলা অভিধানও এগিয়েছিল। এই দুখানা পাণ্ডুলিপি তাঁর রোগশয্যার সঙ্গী, বালিশের ডান দিকে রাখা। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে কলকাতার বাইরে কোনো এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে কি একটা কারিগরী বিদ্যা শিখছে। ভক্তির মা তাঁর দ্বিতীয় পত্নী। প্রথম পত্নী কি ভাবে কত বছর আগে

মারা যান ভক্তি আমাকে বলেনি। কিন্তু তার কথাবার্তায় মনে হতো সে মৃত্যুর সঙ্গে কোনো একটা আভিঘাতিক জড়িত আছে। ভদ্রলোকের বয়স আমার জানা নেই। চেহারা দেখে বয়স অনুমান করার শক্তিও তখন আমার হয়নি। রাজবন্দী ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে ভক্তির পিতা সম্বন্ধে এর বেশি বলা আমার সম্ভব হলো না।

ডাক্তারবাবু বললেন, "একবার দেখতে নিয়ে চল। প্রশ্ন করতে হবে না। আমি দেখেই বুঝতে পারবো কী অসুখ।"

ঠিক হল তার দুদিন পরেই আমি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাবো ভক্তির সিমলা স্ট্রীটের বাড়ীতে।

যেতে হল না। পরের দিন সকালে একটি লোক একখানা চিরকুট নিয়ে আমার কাছে হাজির। ভক্তির হাতে লেখা, "বাবা আজ সকালে মারা গেছেন, তুমি পারলে এসো।"

গিয়ে দেখলাম শবদেহ নিয়ে লোকেরা চলে গেছে শ্মশানে। গেছে ভক্তিও। কেননা বড় ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকেই মুখাগ্নি করতে হবে। বাড়ীতে রয়েছেন একমাত্র অতসীদি। নির্বাক, চোখে জল নেই, বিশেষ শোকে আক্রান্ত মনে হচ্ছে না।

তিন-চার জন প্রতিবেশী আমাকে বলল, "মড়া নিয়ে ঘাটে গেছে, দুটো-তিনটে নাগাদ ফিরবে। তার আগে সমস্ত বাসি খাবার ফেলে দিয়ে বাসন-পত্র মেজে ঘর-খানা ধুয়ে মুছে সাফ করতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে গেছে মড়া, সিঁড়িও ধুয়ে দিতে হবে।"

আমি অতসীদির মুখের দিকে তাকালাম। তিনি তেমন নির্বাক নিশ্চল। এ সব কাজের কোনোটাই করবার মতো আগ্রহের সম্পূর্ণ অভাব।

তখন আমাকেই কাজে লেগে পড়তে হল। ঘরেরই এক কোণে হত রান্না। ভাত-তরকারি ইত্যাদি যা অবশিষ্ট ছিল সেগুলোকে নিয়ে পড়শীদের নির্দেশে রাস্তায় জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে ফেলতে হল। বাসন-কোসন বিশেষ ছিল না, যা ছিল কলতলায় এনে নারকেলের ছোবড়া ও ছাই দিয়ে ধুয়ে রাখতে হল। তারপর বালতি বালতি জল দিয়ে পুরো ঘর, ঘর থেকে সিঁড়ি এবং সিঁড়ি থেকে রাস্তা পর্যন্ত ধুতে হল। ঘর মুছবার জন্য ময়লা কাপড় সংগ্রহ করতে অতসীদিকে প্রশ্ন করতে হল না। সব ধুয়ে মুছে সাফ করে আমি শুধু তাকে বললাম, "এবার আমি যাচ্ছি। ভক্তিকে বলবেন কাল কলেজে দেখা হবে। যদি না হয়, পরশু আসব।"

এতক্ষণে অতসীদি প্রথম কথা বললেন, "দাদা আজ বিকেলেই আসছে।"

॥ কুড়ি ॥

সময়-ঘোড়া তার নিজের বেগে ছুটে চলে, সমাজ বদলায়, মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে, আমাদের বয়স বাড়ে, মধ্যবয়সীরা বৃদ্ধ হন, তরুণরা হয় মধ্যবয়সী। বালক-বালিকারাও অর্জন করে কৈশোর। ভক্তির সঙ্গে আমার বন্ধুতা এখনও জীবিত, তার বয়স তিন কুড়ি ষাট হবে। ভক্তি কখনও সুস্থ সবল হতে পারেনি, কেন্দ্রীয় সরকারের এ্যাসিস্টেণ্ট পদে চাকরী শুরু করে কোনো এক সময়ে ফরেন সার্ভিসে উত্তীর্ণ হয়েছে, বিবাহ করেছে সুন্দরী কন্যাকে, যে তার মামার বাড়ীতে বড় হয়েছে। একটি ছেলের সঙ্গে তার যে গভীর প্রেম ছিল মুখ ফুটে কাউকে জানাতে পারেনি। অনেক বছর পরে যখন আমি নিউ দিল্লীর 'যোজনা ভবনে' প্ল্যানিং কমিশনের 'যোজনা' পত্রিকার সম্পাদক এবং ভক্তি অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসে বিদেশ মন্ত্রকে মধ্যশ্রেণীর অফিসার, একদিন যে হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে বলল, "তোমার সঙ্গে গুরুতর কথা আছে।"

আমি মনোযোগের সঙ্গে তার পানে তাকাতে সে বলল, কণিকা আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে।"

কণিকা ভক্তির স্ত্রী। ওদের দুটি সুন্দর সন্তান। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। আমরা প্রায়ই পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত করে থাকি। কণিকা আমার স্ত্রীকে জানিয়েছে আর একটি ছেলেকে সে ভালবাসত। সে ভালবাসা তখনও তাদের দেহ-মনে সজীব।

আমি বললাম, "নতুন কি ঘটল?"

ভক্তি বলল, "সে ভদ্রলোক দিল্লী এসেছেন। তিনি ধনী এবং সুস্থ সবল। কণিকা বলেছে, সে তার সঙ্গে চলে যাবে।

আমি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললাম, "তুমি কি বলেছ?"

—"আমি বলেছি যাওয়া চলবে না, ছেলেমেয়ে দুটোর কি হবে?"

—"তাতে কণিকা কি বলেছে?"

—"বলেছে তোমার ইচ্ছে হলে ওরা আমার সঙ্গে থাকতে পারে। তুমি যদি ওদের কোথাও রেখে দিতে চাও আমার কিছু বলার নেই। আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করতে চাই না।"

—"তুমি আমাকে কি করতে বল ?" প্রশ্নটা আমার নিজের কানে বোকা বোকা শোনাল।

ভক্তি বলল, "তুমি কণিকার সঙ্গে একটু কথা বল. তাতে কাজ হতে পারে।"

আমি বললাম, "আমার খুব সন্দেহ আছে কাজ হবে কিনা, তবু তুমি যখন বলছ আজকে সন্ধ্যের পরে আসব।"

আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ঠিক হল একা যাওয়াই ঠিক হবে। ভক্তির বাড়ীতে গিয়ে জানতে পারলাম এই জটিল নাটকের তৃতীয় অভিনেতাও সেখানে উপস্থিত।

কণিকার সঙ্গে কথা হল, তার বয়ান স্পষ্ট, মন নির্ভিক ও নিঃসন্দেহ. সংকল্প দৃঢ়। সে কে কি বলবে তার বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না।

—"আমি চোদ্দ বছর আপনার বন্ধুর ঘর করেছি। সংসার পেয়েছি. সুখ পাইনি। এবার আমি সুখী হতে চাই। এজন্য কোনো মূল্যই আমার কাছে বড় নয়। যে দিকে যাচ্ছি সে পথে যদি ভরাডুবি থাকে তার জন্যও আমি প্রস্তুত।"

ছেলে মেয়ে সংসার স্বামী এ সব নিয়ে অনেক কথা আমি বলে গেলাম। কণিকা সব স্থির হয়ে শুনলো। অবশেষে সে বলল, "শুধু একটি মাত্র শর্তে আমি আপনার বন্ধুর সঙ্গে থাকতে রাজী আছি। আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকবে না।"

আমি ভক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি রাজী আছ ?"

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব এলো, "না।"

দু' মাস পরে কণিকা ভক্তির জীবন থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় চলে গেলো। ভক্তিরই উদ্যোগে আদালতে ওদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হল। ভক্তি কণিকাকে নিয়ে গেল স্টেশনে, রেল টিকিট ও রিজার্ভেশন আগে থেকেই করা ছিল, গাড়ী ছাড়া অবধি বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ী চলবার প্রথম পদক্ষেপে, কণিকা বলল, "যদি পারো আমাকে ক্ষমা কোর, দরকার হলে ছেলেমেয়েদের আমি দেখবো। মেয়ের পুরো দায়িত্ব থাকবে আমারই। তুমি নিজেকে দেখো।"

ভক্তি চুপ করে রইল। ট্রেন সরে গেল নিউ দিল্লী স্টেশন থেকে। ভক্তি তো মানুষ, এবং পুরুষ। চণ্ডালিকার বুদ্ধ সন্ন্যাসীর মতো সে বলতে পারলো না তার শেষ কথা, "কল্যাণ হোক তব, কল্যাণী।"

তবু বলে রাখি ভক্তি যে ভাবে তার প্রেমসিক্ত স্ত্রীকে ভদ্রতা, সম্মান ও আভিজাত্যের সঙ্গে বিদায় দিতে পেরেছিল, তার নজীর দেশে আমি দ্বিতীয় দেখিনি, বিদেশেও কম। পরবর্তী সুদীর্ঘ বছরগুলিতে ছেলেমেয়ে দীর্ঘকাল তাদের মায়ের

কাছেই থেকেছে, কণিকাই মেয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ও তারপর বিবাহের ব্যবস্থা করেছে। ঘটেনি শুধু একটি ঘটনা, ভক্তি ও কণিকা আর মুখোমুখি হয়নি। ছেলের বিবাহে আসতে পারেনি কণিকা, মেয়ের বিবাহে উপস্থিত থাকেনি ভক্তি।

বিচ্ছেদের মধ্যেও আভিজাত্য এবং পারস্পরিক অনুচ্চারিত ক্রোধ মিশ্রিত স্নেহ বর্তমান থাকতে পারে। জীবন যেমন মিলনে সুন্দর, তেমনি বিচ্ছেদেও চিত্তস্পর্শী।

॥ একুশ ॥

বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার দ্বিতীয় বছরে রাজনৈতিক হাওয়া বিশেষ গরম হয়ে উঠলো। বিঘোষিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কলেজে বিরাট উত্তেজনা। অধ্যাপকদের মধ্যে উত্তেজিত আলোচনা। আমার এটুকু বোঝার ক্ষমতা ছিল যে ভারতবর্ষ যুদ্ধে যোগ দেয়নি, ইংরেজের কলোনী হিসেবে তাকে যুদ্ধে টেনে নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসী, মন্ত্রীদলের পদত্যাগ, কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের প্রতিবাদ ও ইংরেজ শাসনের ক্রমান্বয় ক্রুদ্ধ চেহারা : এ সব নিয়েও ছাত্রদের মধ্যেও কিছু কিছু আলোচনা এবং সংবাদপত্রে তারস্বরে বিশ্লেষণ আমার দৈহিক মানসিক খাদ্যের অনিবার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাবা একখানা কার্ড লিখেছিলেন, ভাল ইংরেজী শিখতে হলে 'স্টেটসম্যান' পড়তে হবে, বিশেষ করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলো। সাত টাকা বৃত্তিতে আমি তখন বিত্তমান, মাসে তিন টাকা মাকে পাঠাবার পরেও আমার হাতে প্রতি মাসে বই কেনা ও 'স্টেটসম্যান' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' রোজ খরিদ করার মতো পয়সার অভাব হোত না। দুটি পত্রিকার মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই ছোটবেলায় দুই বিপরীত মনোভাব সমান মনোযোগ দিয়ে পড়বার অভ্যাস পরিণত জীবনে আমার মনকে বিশ্লেষক ও বাস্তবভিত্তিক হতে সাহায্য করেছিল। 'স্টেটসম্যানে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে অজানা অচেনা শব্দগুলোকে খাতায় লিখে নিয়ে এ. টি. দেবের ইংরেজী-বাংলা অভিধান থেকে তাদের অর্থ সংগ্রহ করে প্রায় প্রতিদিন লিখে নিতাম। চমকে দেওয়া বাক্য বা পরিচ্ছেদ টুকে রাখতাম। কিন্তু মন প্রাণ গরম করে দেওয়া সংবাদ ও মন্তব্য আসত 'আনন্দবাজারের' পৃষ্ঠাগুলি থেকে।

'আনন্দবাজার' পত্রিকা হাই কমাণ্ডের সমর্থক! শরৎ বসু-ফজলুল হকের জোট বাঁধার কট্টর বিরোধী। এর আগে, তখন আমি স্কুল পাশ করিনি, একদিকে সুভাষ চন্দ্র বসু ও অন্য দিকে মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর মধ্যে যে কূট সংগ্রামে সারা দেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল তার প্রকৃত অর্থ ও প্রভাব বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না। বোঝবার উপাদানও অনুপস্থিত। এখন যুদ্ধের প্রারম্ভে সুভাষ চন্দ্র বসু গৃহবন্দী। 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' তাঁর প্রতি প্রাণখোলা সমর্থন দেখা যেত না। অনেক পরে যখন ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা

আমার কিছুটা অর্জিত হল তখন আমি বুঝতে পারলাম যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার পর থেকে পুরো চল্লিশ দশকের প্রচণ্ড অর্থবাহক ঐতিহাসিক ঘটনায় বঙ্গের ভূমিকা ছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের। এসব ঘটনার মধ্যে ছিল কংগ্রেস-লীগ-ইংরেজের মধ্যে আপোষে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজের অপসারণ, ভারত বিভাগ, পাকিস্তানের জন্ম, বঙ্গ ও পাঞ্জাব ভাগ। ষাট লক্ষ মানুষ বাস্তহারা। দু'তিন লাখ মানুষের মৃত্যু। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি দৃঢ় কণ্ঠে বঙ্গবাসীর পরিপূর্ণ সমর্থন নিয়ে, বঙ্গের স্বার্থ সুরক্ষার বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারেন। এটুকু আমার পরিষ্কার মনে আছে, বিশ্বযুদ্ধ বাধার পর থেকেই বাঙালী মানসিকতায় একটা দৌর্বল্য ও পরাজয়-আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল।

এই পরিস্থিতির মধ্যে আমার জীবনে প্রথম এক বিরাট শুভ ঘটনা ঘটে গেল। দশ-বারোজন ছাত্র নিয়ে আমাদের যে টিউটোরিয়াল গ্রুপ তৈরী হয়েছিল, বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরকার অনেক খবর রাখত। দুই অধ্যাপক আমার উপর অতিশয় সদয় ছিলেন। তাদের একজন পড়াতেন সিভিক্স, অন্যজন লজিক। এবং দুজনেই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সবকিছু বইপত্র পড়ে 'আইডিয়াল আনসার' লিখে নিতে একটি খাতায়। বলেছিলেন, এমনি করে লিখো যাতে ষোলো নম্বরের মধ্যে পনের নম্বর পাওয়ার যোগ্য হয়। আমি এই ধরণের 'আইডিয়াল আনসারে' দু'খানা বড় বড় এক্সারসাইজ বুক পুরো করে ফেলেছিলাম। দুই অধ্যাপক উত্তরগুলো পড়ে, রচনার দুর্বলতা ও ভুল চিহ্নিত করেছিলেন। এ দুজনের একজনের নাম খুব মনে আছে, কেননা পরবর্তী জীবনেও তাঁর সঙ্গে আমার সংযোগ ছিল। তিনি পুরাতন সুধাংশু কুমার বসু, যিনি কলেজ থেকে ইস্তফা দিয়ে 'আনন্দবাজারের' প্রথম ইংরেজী সতীর্থ 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের' সম্পাদক হয়েছিলেন। এক ধাপে নয়, কয়েক বছরে।

আমাদের টিউটোরিয়াল গ্রুপের মধ্যে রটনা হয়েছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আমার স্থান খুব উঁচুতে হবে। খবরটা খুশি মনে ভীত আশায় বাবাকে জানিয়েছিলাম। উত্তরে একখানা কার্ড পেয়েছিলাম। তিনি লিখেছিলেন, "প্রথম বিভাগে পাশ করতে পারিলেই আমাদের সৌভাগ্য।" কার্ডখানা পড়ে একটু দমে গিয়েছিলাম বৈকি, কিন্তু এ নিয়ে কথাবার্তা বলার মতো কেউ ছিল না। একদিন হঠাৎ ২৯ নম্বর বীডন স্ট্রীটে অতি প্রত্যূষে দারুণ হৈ চৈ। আনন্দবাজার পরিবেশিত হতো বাড়ীতে। তার প্রথম পৃষ্ঠায় আই. এ. পরীক্ষার প্রথম দশটি স্থান

অধিকৃত ছাত্রদের নাম। আমি তার মধ্যে তৃতীয়। আমার কাকামণি এর কিছুদিন আগে বাহাওয়ালপুর কলেজ থেকে পুনরায় নিয়োগ পত্র পেয়ে একাই পাঞ্জাবে চলে গেছেন, কাকিমা ও ভাইবোনেরা দু মাসের মধ্যে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছেন। ঠিক মনে নেই, খুব সম্ভবত আমার দিদি, যার সঙ্গে আমার অনুরাগপূর্ণ ভালোবাসার মনোভাবের কথা অজানা নেই, ছুটে এসে আমাকে বলেছিল, "জানো জানো, তুমি পরীক্ষায় থার্ড হয়েছ।" কাকিমা, পিসিমা, খুড়তুতো, পিসতুতো ভাই-বোনদের খুশি আনন্দ উপছে না পড়লেও সোচ্চার প্রকাশ পেয়েছিল। মুরলা পিসিমা স্বামীর বিরহে সর্বদাই এত কাতর থাকতেন যে তাঁর মুখে হাসি ছিল বিরল, কিন্তু অন্য জ্ঞাতি আত্মীয়দের মুখ, 'দত্তা' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ভাষায়, আনন্দে কালি হয়ে গিয়েছিল। দু-চারদিন পরে শুনেছিলাম আমার জ্ঞাতি জ্যেঠামশাই প্রচণ্ড বিস্ময়ে ও প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ নিয়ে ছেলেদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এ ছেলেটা লেখাপড়ায় কবে থেকে এত ভাল হল।

মা ভাই-বোনদের গণেশপুরের বাস তুলে দিয়ে খুলনাতে বাবার কাছে চলে যাওয়ার আয়োজন তখনও চলছে। আমি চারখানা পোষ্টকার্ড লিখেছিলাম, গণেশপুরে মাকে, পাঞ্জাবে কাকামণিকে, খুলনায় বাবাকে, এবং দু-চার দিন পরেই গণেশপুরে জ্যেঠামশাইকে। জবাবগুলো এখনও আমার পরিষ্কার মনে আছে। বাবা লিখেছেন, "তোমার পরীক্ষার খবরে সুখী হইলাম। বি. এ. পরীক্ষার জন্য স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্ত্তি হইবে। ইংরাজ অধ্যাপকের কাছে শিক্ষা পাওয়া অতিশয় সৌভাগ্য।"

কাকামণি লিখেছিলেন, "জীবনে এত বড় খবর এর আগে পাইনি। আমার দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইতেছে।" মা লিখেছিলেন, "তুমি যে এমন করিবে তাহা আমি আগেই জানিতাম। এবার তো তুমি স্কলারশিপ পাইবে। কত টাকা স্কলারশিপ ? আমরা খুলনা গেলে একটু বেশি টাকা পাঠাইতে পারিবে কি ?"

গ্রাম থেকে জ্যেঠামশাইয়ের চিঠি : "তুমি বঙ্গ উড়িষ্যা আসামের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আমাদের সকলকে গর্বিত করিয়াছ। গ্রামের সকলেই ইহাতে বিশেষ আনন্দিত।"

একটা বড় কিছু করে ফেলেছি এটা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু কেন কিভাবে বড় কাজটা ঘটে গেল তার রহস্য আমাকে অধিকার করে রেখেছিল। একমাত্র দু'বছর কঠোর পরিশ্রম ছাড়া আর যে কিছু করেছিলাম বা পেয়েছিলাম তার অনুভূতি

খুঁজে পায়নি। খুঁজে পেতে এক সপ্তাহ সময় লাগলো। ছাদে বসে সকালে আমি পড়ছি, হঠাৎ দেখলাম গীতা মিত্র স্নান সেরে শাড়ি শুকোতে দিতে ছাদে উঠে এসেছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সোজা ছাদের পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি তখন অনেকটা ভদ্র হয়েছি। চোখে চোখ পড়তে দু-হাত তুলে নমস্কার করলাম। গীতা মিত্র বললেন, "আপনি ইউনিভার্সিটিতে থার্ড হয়েছেন? দাঁড়ান, আপনাকে এক মিনিট দেখি। ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট সেকেণ্ড হওয়া ছাত্র আমাদের বাড়ীতে কেউ কখনও দেখেনি।"

আমি আনন্দে লজ্জায় মরে গিয়েছিলাম। শুধু বলতে পেরেছিলাম, "কী করে যেন ঘটনাটা ঘটে গেল।"

গীতা মিত্র হেসে বললেন, "দাদা এ-নিয়ে তিন-চার দিন ধরে বকে যাচ্ছেন। মা আপনাকে দেখতে চাইছেন। একদিন আসুন না আমাদের বাড়ীতে।"

আমি বললাম, "আসব।"

গীতা মিত্র বললেন, "আমারও একটা সুখবর আছে।"

আমি বললাম, "দিদির কাছে শুনেছি আগামী মাসে আপনার বিয়ে হচ্ছে।"

কথাটি ফুরোল। মেয়েটি হেসে হেসে ছাদ থেকে নেমে গেল। ছেলেটা অনেক আনন্দ এবং একান্ত ঔদাস্যে কলকাতায় ধোঁয়া ভরা সকালের আকাশের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। আশেপাশের বাড়ীগুলো থেকে কয়লার উনুনের ধোঁয়া মধ্যবিত্ত কলকাতার আকাশকে প্রথম প্রভাত থেকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে। সে ধোঁয়া মানুষের চোখে জল এনে দেয়। আমিও দেখলাম আমার দুচোখ ভিজে। নিশ্চয়ই কয়লার উনুনের ধোঁয়া চোখে লেগেছে। না কি কোনো এক অপূর্ব সুখ ও অনুসর্গ ব্যথার মিলিত শরাঘাত? গীতা মিত্রের সঙ্গে এরপরে আমার আর দেখা হয়নি।

॥ বাইশ ॥

হঠাৎ জীবনটা বদলে গেল। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠলো. কোথায় পড়ব? প্রেসিডেন্সি না স্কটিশ, সরকারী বৃত্তিভোগীদের বেতন দিতে হয় না। কিন্তু শীঘ্রই আমার বাসস্থানের প্রয়োজন হবে। কাকিমারা চলে যাবেন পাঞ্জাবে। থাকতে হবে হোস্টেলে। বাবা দ্বিতীয় পত্রে পুনরায় আদেশ দিলেন সাহেবদের কাছে পড়তে। আগেই বলেছি ইংরেজ ভক্তিতে বাবার সমতুল আর খুব বেশি লোক দেখতে পেতাম না, অথচ জীবনের এমনই পরিহাস. এই নির্বিচার ইংরেজ ভক্ত মানুষটিকে যৌবনে জেলে যেতে হয়েছিল একমাত্র তাঁর পিতা রজনীকান্তের রাজনীতির কার্যকলাপের পুরস্কার হিসেবে।

খবর নিয়ে জানতে পারলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে সাধারণত ধনী পরিবারের ছাত্র। তখনও ছাত্রীদের ভর্তি হবার ব্যবস্থা ছিল না। হোস্টেলে বিনা পয়সায় থাকবার সুযোগ মিলবে না। ধনী ঘরের ছাত্র আমার কাছে অপরিচিত বিভীষিকা। সমস্ত কলকাতা শহরটাও এক প্রকাণ্ড বিভীষিকা, তার কাছে আমি ক্ষুদ্র, নগণ্য, নিশ্চিহ্ন। কোনো বড় দোকানে ঢোকার মতো সাহস আমার নেই। আমি সবে মাত্র স্যাণ্ডেল পড়তে শুরু করেছি। আমার দেহে-মুখে গ্রামীনতা সুস্পষ্ট। বিদ্যাসাগর কলেজে এক বন্ধুর বন্ধু ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। তার সঙ্গে পরিচয় হল। কোথাও কিছুই মিলল না। সে ভক্তি দাসগুপ্ত নয়। সে সুবল মিত্র নয়, যে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল। সে অন্য শ্রেণীর অন্য জাতের মানুষ। ইংরেজী মাধ্যমিক স্কুল থেকে পাশ করেছে। মনে হল সাহেবদের মতো ইংরেজী বলে। মনের ভেতর গুঞ্জরিত হল, "আমার এ পথ তোমার পথের থেকে গেছে বেঁকে।"

অতএব স্কটিশে গিয়ে হাজির হলাম। বীডন স্ট্রীটের বাড়ী থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটা পথ—হেদুয়াপুকুর পার্কের পাশে হলদে রঙের একটা বাড়ীতে স্কটিশ চার্চ কলেজ। হেদুয়ার অন্য প্রান্তে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর মেয়েদের জন্য বেথুন কলেজ। অ্যাডমিশন প্রার্থী হয়ে এক সাহেব অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে হল। তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "আমার নাম প্রফেসার গ্রে। তুমি স্কটিশে ভর্তি হতে চাও? তোমার দরখাস্ত ও মার্কসিট দেখাও।"

কাগজ পত্র দেখে বললেন, "আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে ভর্তি করে নেব। ইংলিশ অনার্সও পাবে। আমি ইংরেজীর অধ্যাপক।"

আমি বললাম, "আমার হোস্টেল চাই। টাকা দিয়ে হোস্টেলে থাকবার মতো অবস্থা নয়। বাবা স্কুল শিক্ষক, আমার আরও তিনটি ভাই-বোন আছে।"

গ্রে সাহেব বললেন, "তোমার হোস্টেলে থাকতে টাকা লাগবে না। অফিসে গিয়ে কাগজপত্র সই করে নাও।"

দু'দিন পরে অফিস থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এক পেয়াদা ২৯ নম্বর বীডন স্ট্রীটে হাজির। স্কটিশ কলেজে আমার ডাক পড়েছে।

প্রথমবারেও প্রিন্সিপ্যালের ঘরে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল অধ্যাপক গ্রে-ই প্রিন্সিপ্যাল। এবার তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে "গুড মর্ণিং স্যার" বলে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তিনি বললেন, "বস।"

মিনিট তিনেক পরে আমার দরখাস্তের পাতাগুলো উল্টে পাল্টে দেখে বললেন, "ফ্রি হোস্টেল দেওয়া সম্ভব হবে না।"

আমি বললাম, "কাল আমি অধ্যাপক গ্রে-র সঙ্গে দেখা করেছি, তিনি তো বলেছিলেন সম্ভব হবে।"

আমার কাছে এই প্রথমবার নয়, তার পরেও বহু বছর, সব সাদা মুখ এক রকম দেখাতো। প্রথম দৃষ্টিতে সাহেবদের মধ্যে ব্যক্তিক প্রভেদ হঠাৎ বুঝতে পারতাম না। অধ্যাপক গ্রে হেসে উঠলেন, বললেন, "আমিই প্রফেসার গ্রে, তুমি আমার কাছে এসেছিলে। তোমাকে বলেছিলাম ফ্রি হোস্টেল দেওয়া সম্ভব হবে, কিন্তু কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

আমি বললাম, "তাহলে আমার স্কটিশে পড়া সম্ভব হবে না। বিদ্যাসাগর কলেজে আমি শুধু ফ্রি হোস্টেল নয়, পনের টাকা স্কলারশিপও পেতে পারি।"

—"তবে এখানে এসেছ কেন?"

—"আমার পিতৃদেব লিখেছেন, ইংরেজ অধ্যাপকদের কাছে পড়লে ভাল শিক্ষা পাওয়া যায়, ইংরেজীতে দখল বাড়ে।"

অধ্যাপক গ্রে আবার হেসে উঠলেন, "আই হোপ ইয়োর ফাদার ইজ রাইট। তিনি কি সাহেবদের কাছে পড়েছিলেন?"

—"না। কিন্তু আমার ঠাকুরদা ইংরেজীতে খুব ভাল বক্তা ছিলেন, যদিও তিনি স্কুল পাশ করেন নি।"

অধ্যাপক গ্রে বললেন, "ঠিক আছে, তোমাকে নিজের দায়িত্বে হোস্টেল ফ্রি করে দিচ্ছি। তুমি টমোড়ী হোস্টেলে থাকবে, আমি ওখানে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। কলেজে আপত্তি করলে তোমার হোস্টেল ফি আমি দিয়ে দেব।"

অধ্যাপক মার্কাস গ্রে আমার জীবনের প্রস্তুতির জন্য প্রথম শক্ত সেতু।

॥ তেইশ ॥

স্কটিশ চার্চ কলেজে বিদ্যাচর্চার পরিবেশ সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে অভ্যর্থনা দেবার উপলক্ষ্যে ছাত্রদের দীর্ঘকালীন ধর্মঘট প্রায় পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছিল। কলেজের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত একটা আধা সরকারী অভ্যর্থনার অনুমতি দিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ থেকে যিনি উপস্থিত ছিলেন, ও সংক্ষিপ্ত এক ভাষণ দিয়েছিলেন, তাঁর নাম মার্কাস ডি. গ্রে। স্কটল্যাণ্ডের লোক, কেম্ব্রিজের ট্রাইপস্ ও চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের পাদরী। চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের পাদরীদের বিবাহিত জীবন যাপন করার অনুমতি মিলত। অধ্যাপক তাঁর পত্নী মেরিকে নিয়ে টমোড়ী হোস্টেলে তিনখানা ঘরের একখানা স্যুইটে বাস করতেন। টমোড়ী হোস্টেল বাদুরবাগান স্ট্রীটের একটি পল্লীর মধ্যে অবস্থিত। পঞ্চাশটি ছাত্রের নিবাস, তাদের উপদ্রবে পল্লীতে কিছু কিছু পরিবারের মধ্যে অসন্তোষ লেগেই থাকতো। অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিনটেণ্ডেন্ট ছিলেন বনবিহারী ঘোষ তাঁকে এ সব উপদ্রব মেটাতে হোত। এই সুবাদে পল্লীর অনেক পরিবারে তাঁর যাতায়াত ছিল। আমার মনে আছে বনবিহারীবাবু একদিন অধ্যাপক গ্রে সাহেবের কাছে নালিশ করেছিলেন, হোস্টেলের ছেলেরা রাত্রিবেলায় একটি ঘরে মিলিত হয়ে এক পরিবারের সদ্যবিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর কার্যকৃতি অবলোকন করে। অধ্যাপক গ্রে'র অফিসে আমিও উপস্থিত ছিলাম। গ্রে জবাব দিয়েছিলেন, বনবিহারী, ছেলেদের সঙ্গে আমি কথা বলব। কিন্তু পঞ্চাশটি যুবক একসঙ্গে বাস করে পাড়ার মেয়েদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিস্কৌতুহল থাকবে, তুমি এটা সম্ভব বলে মনে কর? এদেশের ছাত্ররা তো অত্যন্ত সভ্য। আমাদের দেশ হলে অনেক কিছু ঘটত এবং তা নিয়ে পিতামাতা হোস্টেলের কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতেন না।

কলেজে পড়াশুনার তেমন পরিবেশ না থাকলেও জীবনের গতিতে কিছুটা তরঙ্গ ছিল এবং সারা কলেজেই একটা জীবন্ত ভাব দেখা যেত। অধ্যাপকদের মধ্যে বিখ্যাত বলা যায় এমন খুব কমই ছিলেন। সাহেব অধ্যাপকদের মধ্যে একমাত্র ময়েআট সাহেবের নাম ছিল। ইনি সেক্সপিয়র পড়াতেন। গ্রে পড়াতেন বার্ণার্ড শ'র 'আর্মস অ্যাণ্ড দ্য ম্যান'। ক্লাসে একক কণ্ঠে নাটকীয় পদ্ধতিতে বইটি পড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি। অধ্যাপক

সুশীল মুখার্জী, যিনি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন, ছিলেন ছাত্রদের কাছে সব থেকে জনপ্রিয়। আর ছিলেন এক মেমসাহেব অধ্যাপক, মিস রুবি, যিনি ক্লাসে আসার সঙ্গে সঙ্গে হল্লা পড়ে যেত। বাংলা ভাষায় অনেক সময় অশ্লীল কথা বলে যেত ছাত্ররা, ধরে নিত মিস রুবি তার এক বর্ণও বুঝতে পারেন না। উদাহরণ মনে পড়ছে : হঠাৎ দুটি ছাত্র চেঁচিয়ে উঠল, *এরে দেখ্ দেখ্, সাদা পা দেখা যাচ্ছে,* আর কয়েকটি ছাত্র হৈ হৈ করত। মিস রুবি নির্বিবাদে ইংরেজী পদ্য পড়িয়ে যেতেন। একদিন অন্য এক সংবাদে তিনি পরিষ্কার বাংলা ভাষায় এক ছাত্রকে বললেন, "আপনারা এত গোলমাল করলে আমি পড়াই কি করে?" সমস্ত ক্লাসে লজ্জিত শঙ্কিত নীরবতা নেমে এলো। সব ছাত্র অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে রইলো। মিস রুবিকে নিয়ে অশ্লীল মন্তব্যের সেদিনই সমাপ্তি।

বেশিরভাগ অধ্যাপককেই ছাত্ররা পড়াতে দিত না। দক্ষিণ ভারতের ম্যাকেসন সাহেব নাকী-স্বরে ইকনমিক্স পড়াতেন। তাঁর একটানা নিরাকর্ষক নির্জীব বক্তৃতা ও ছাত্রদের অবিরাম কোলাহল মিলে মিশে যে আবহাওয়া তৈরী করত, তাকে অধ্যয়নীক বলা যায় না। পলিটিক্স পড়াতেন অধ্যাপক নির্মল বসু। তাঁর ক্লাসে বিশেষ গোলমাল হতে পারতো না। কিন্তু যে ক্লাসে এতটুকুও গোলমাল হোতনা এবং ছাত্ররা গভীর মনোযোগে অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতেন, সামান্য অভদ্রতা দেখালে তৎক্ষণাৎ ক্লাসরুম থেকে বহিষ্কৃত হতে হোত—তাঁর নাম সুধাংশু দাশগুপ্ত। ইনি বাংলা পড়াতেন। আমার পক্ষে এঁর স্মৃতি আরও সুখকর এইজন্য যে প্রতি মাসে ক্লাস পরীক্ষায় লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমার লেখা প্রবন্ধ প্রায়ই তিনি সারা ক্লাসকে পাঠ করে শোনাতেন। ঠিক উল্টো ছিলেন বাংলার আর এক অধ্যাপক বিপিনবাবু। পাঠ্যপুস্তক যেমন 'দেবী চৌধুরাণী' অথবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত', তিনি প্রথম থেকে শেষ অক্ষর পর্যন্ত মুখস্থ বলে যেতেন। আমার উপরে একবার বিপিনবাবু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ছাত্রদের 'দেবী চৌধুরানী' সম্বন্ধে একটি ছোট সমালোচনা লিখতে বলেছিলেন। আমার সমালোচনায় একটা বড় অপরাধ হয়ে গিয়েছিল। ব্রজেশ্বরকে আমি 'দুর্বল পুরুষ' বলে সনাক্ত করেছিলাম। দেবী চৌধুরানীর সুসজ্জিত বজরায় যখন ব্রজেশ্বর জানতে পারলো যে তার সামনে দণ্ডায়মান 'সামান্য বস্ত্র' পরিহিতা, 'হাতে কেবল একখানি মাত্র অলঙ্কার' নারী আর কেউ নয়, তারই স্ত্রী প্রফুল্ল, তখন সে কী করেছিল? "ব্রজেশ্বর দেখিতে পাইলেন প্রফুল্লর দু-গাল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, সেই অশ্রু মোছাতে গিয়ে,—

কিছু না বুঝিয়া—কেন জানি না দেবীর কাঁধে হাত রাখিল, অপর হাতে মুখখানি তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখখানা প্রফুল্লর মতো দেখিল। বিবশ বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রু নিষিক্ত বিম্বাধরে—আঃ ছিঃ ছিঃ! ব্রজেশ্বর! আবার! তখন ব্রজেশ্বরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—কী করিলাম! এ কী প্রফুল্ল? সে যে দশ বছর মরিয়াছে। ব্রজেশ্বর উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া একেবারে ছিপে গিয়া উঠিল।" এই অংশটি উদ্ধৃত করে আমি লিখেছিলাম, "বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ব্রজেশ্বর ঠিক পুরুষ হিসেবে তৈরী হয় নাই। সে তৈরী হয়েছে ভীরু বাঙালী জমিদার পুত্র হিসেবে। তার মধ্যে পৌরুষ-ব্যক্তিত্বের নিদারুণ অভাবে।"

বিপিনবাবু আমার আলোচনার এই অংশটি ক্লাসে পাঠ করে আমাকে 'সংযমহীনতার' অভিযোগে তিরস্কার করেছিলেন। সারা ক্লাস সহাস্যে সেই তিরস্কার উপভোগ করেছিল। ক্লাসে জনা দশেক মেয়ে ছিল, তাদেরও মুখে আঁচল দিয়ে হাসতে দেখেছিলাম। আমার মনে আছে আমি দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলাম, আপনার তিরস্কার মানছি কিন্তু বিতর্ক করতে চান তো তৈরী। সারা ক্লাসে আবার হাসি হল্লা পড়ে গিয়েছিল।

স্কটিশ চার্চ কলেজে কো-এডুকেশন। মানে হাজার দুই ছাত্র, শ'খানেক ছাত্রী। ছাত্রীরা অধ্যাপকের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে ঢুকত। তাদের বসবার জন্য সামনের দুটি বেঞ্চি সংরক্ষিত ছিল। অধ্যাপক ক্লাস ত্যাগ করার আগেই ছাত্রীরা চলে যেত। ছাত্রীদের আলাদা কমনরুম ছিল। ছেলেদের চিরকুট নিয়ে কোনো পেয়াদা নির্দিষ্ট ছাত্রীর হাতে দিলে সে বেরিয়ে এসে কথা বলত। মেয়েদের আলাদা হোস্টেল ছিল। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে ডাওসন্ হোস্টেল। সেখানেও ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে চিরকুট পাঠিয়ে দেখা করতে পারত। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেলামেশা বন্ধুত্ব ছিল না। তবু শোনা যেত কারও কারও মধ্যে প্রেম চলছে। কদাচিৎ কোনো যুগলকে হেদুয়ার পুকুর পারে বেঞ্চিতে বসে গল্প করতে দেখা যেত। ছাত্র ছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি একত্রিত হোত কলেজের কাছাকাছি বীডন স্ট্রীটের উপরে। একটা রেস্টুরেন্টে। স্কটিশ কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রেওয়াজ ছিল। পেশাদারী মঞ্চ ভাড়া করে ছাত্ররা অভিনয় করত। স্ত্রী ভূমিকায় ছাত্রীদের অভিনয় আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু সঙ্গীত অনুষ্ঠানে ছাত্রীরা গান করত। তাদের মধ্যে একজন, শোভা সাহা অথবা কুণ্ডু, সেতারে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন।

সময় স্মৃতিচোর হিসেবে বিখ্যাত। আজ পরিণত বয়সে অতীতের বন্ধুদের

অনেকের নাম মনে নেই; তিন চারটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, তাদের মধ্যে দুজনের নাম মনে আছে। একজন প্রতিভা চালিহা, আসামের খাসিয়া মেয়ে। সে শাড়ীর সঙ্গে ভিন্ন রঙের একটি ওড়না গায়ে দিত। দেখতে ভারি সুন্দর লাগত। খাসিয়া মেয়ে বলেই প্রতিভা চালিহা ছিল সপ্রতিভ, বাংলা ভাষায় যাকে ন্যাকামি বলে, তাতে তার বিন্দুমাত্র দখল ছিল না। সুধা নামে আর একটি মেয়ে ছিল, যার সম্বন্ধে অনেক ছেলের যথেষ্ট উৎসাহ; আমারও যে ছিল না তা নয়, কিন্তু গ্রামীন যুবকের কাছে তাকে খুব দেমাকি মনে হতো। যার সঙ্গে আমার খানিকটা সহজ সম্পর্ক ছিল সে পরে বিখ্যাত অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ করে।

দক্ষিণ কলকাতা অর্থাৎ বালীগঞ্জ সম্পর্কে উত্তর কলকাতার যুবকদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। তারা নাকি রাস্তায় দাঁড়িয়েই ডাবের জল পান করে, ছেলেদের সঙ্গে লেকে বেড়াতে যায়, অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে, এমনকি এগিয়ে এসে আলাপ পর্যন্ত করে। কিন্তু হায়, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান।

স্কটিশে পড়বার সময় আমার জীবনে যে পরিবর্তন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল মার্কসিস্ট রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ। আমাদের সহপাঠী ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তখনই তার প্রথম কবিতার বই বেরিয়ে গেছে 'কমরেড, বিপ্লব আনবে না?' এই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে সুভাষ বিখ্যাত। আমি তখন কলেজের বইপত্র ছেড়ে দিয়ে ইতিহাস ও রাজনীতি শাস্ত্র পড়ছি। রাজনীতি শাস্ত্র মানে মার্কসিস্ট লিটারেচর। স্ট্রাচীর 'দি কামিং স্ট্রাগল ফর পাওয়ার', মরিস হিণ্ডাসের 'মাদার রাশিয়া', সিডনী ও বিয়েট্রীস ওয়েবের 'দি সোভিয়েট ইউনিয়ন', 'এ নিউ সিভিলাইজেশন', আমার নিত্য সঙ্গী। কমিউনিষ্ট পার্টি তখন বেআইনী। অতএব তার সঙ্গে খানিকটা দূরত্ব সম্পর্কের একটা উত্তেজক ষড়যন্ত্রের কিছুটা উত্তাপ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাল ছাত্রদের' ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে সংযুক্ত করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন নেতারা। 'দাদাদের' অনুরোধ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্কটিশ কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের প্রাইমারি কমিটির প্রেসিডেন্ট হতে রাজী হয়ে গেলাম। কলেজের সঙ্গে এই কমিটির কোনো অন্যাঙ্গী সম্পর্ক ছিল না, অর্থাৎ প্রাইমারি কমিটি কলেজের স্বীকৃতি পায়নি। আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যে মিটিং করতাম তাতে কিন্তু কর্তৃপক্ষ বাধা দিতেন না। পার্টির সঙ্গে আমার কখনও কোনো সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়নি। আমি কমিউনিষ্ট ছিলাম না, কিন্তু সমাজ

বিজ্ঞান ক্ষেত্রে মার্কাস-এনজেলস লেনিন আমার মন ও মস্তিষ্ক অনেকখানি দখল করে নিয়েছিলেন।

পরবর্তী জীবনেও রাজনীতির বিচার বিশ্লেষণে আমি মার্কসিস্ট চিন্তাধারাকে সম্মান দিয়ে এসেছি। কোনও মানুষই আমার কাছে সর্বজ্ঞানী আইকন নন। কারও কাছে দণ্ডবতের অভ্যাস আমার নেই। সেজন্যে জীবনে আমি দীক্ষিত হইনি, গুরু গ্রহণ করিনি। সবটুকু দুর্বলতা ও বলিষ্ঠতা নিয়ে স্বাধীনভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার অধিকার গণতান্ত্রিক রাজ্যের নাগরিক হিসেবে অতিশয় মূল্যবান। বিপ্লব কথাটার মধ্যে এখন একটা বুক কাঁপানো গা-শিরশির-করা রক্তের-প্রবাহ-বাড়িয়ে-তোলা উত্তেজনা আছে, তা প্রতিটি বিপ্লবী মানুষ ও বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত ব্যক্তি বিলক্ষণ জানেন। আমিও সে উত্তেজনার তাপ সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলাম। রজনীকান্তের রক্ত আমার ধমনীতে প্রবাহিত। ছাত্রদের প্রশাসনে যোগ দিতে উত্তেজনা বোধ করতাম। গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিতে ভাল লাগত। কমিউনিস্ট পার্টির তরুণ ছাত্রদের বক্তৃতা শুনতাম মন দিয়ে। গোপন মিটিং হলে উত্তেজনা আরও বাড়ত। প্রবোধ সান্যাল, বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়, জলি কাউল, মোহন কুমারমঙ্গলম, ফারুকী—এঁরা ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় নেতা। পার্টির পত্রিকা গোপনে বিক্রি করা, দলিলপত্র গোপনে সামলানো ছিল উত্তেজক বিপ্লব আরাধনা। নিজেকে কমিউনিষ্ট বলতে, রক্ত গরম হতে, সে উত্তাপ আমি উপভোগ করতাম। আমার কাছাকাছি হওয়ায় খুড়তুতো ভাই বাদলও 'কমিউনিষ্ট' হয়ে গেল।

চল্লিশের দশক ভারতের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর। চলছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তার একের পর এক পৃথিবী কাঁপানো ঘটনা ভারতবাসীকে করেছে কম্পিত, বিস্মিত। একটা বিরাট তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছে ইংরেজের সুদূর প্রাচ্য সাম্রাজ্য। একদিন মহা ঐতিহাসিক ভ্রমে হিটলার আক্রমণ করে বসেছে সোভিয়েট রাশিয়া, জানতে পারেনি তার ভাগ্য হবে নেপোলিয়নের মতো। কিন্তু প্রথম তিনটে বছরে অর্থাৎ ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত জার্মান নাৎসী বাহিনীর দাপটে সারা পশ্চিম ইউরোপ পরাজিত ও নতশির। এসব ঘটনা সময়ের দূরত্ব থেকে কিতাবে পড়তে এক রকম লাগে; ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেভাবে জড়িয়ে পড়তে হয়নি, যেভাবে পড়েছিল সমগ্র ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার অনেকখানি, শুধু প্রাচ্য থেকে দক্ষিণ পূর্ব

এশিয়া পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ স্থলভূমি। ভারত শুধু যুদ্ধের রশদ যুগিয়ে এসেছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের সৈন্যরাও লড়েছে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে এবং সাধারণ মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নেওয়া হয়েছে মিত্রশক্তির ভরণপোষণের জন্য। কলকাতার যুদ্ধ অভিজ্ঞতা শেষোক্ত স্তরের অন্তর্গত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রপক্ষের সামরিক প্রধান কেন্দ্র সিংহলে, এখন যাকে বলা হয় শ্রীলঙ্কা, প্রধান সেনাপতি অ্যাডমিরাল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন, ইংরেজ রাজ-পরিবারের রক্ত তাঁর দেহে। সারা উত্তর পূর্ব ভারতের রশদ যুদ্ধের প্রয়োজনে এক রকম বন্ধক দেওয়া।

কলকাতায় জাপানী বিমান আক্রমণের আতঙ্কে সিভিল ডিফেন্সের নামে বড় বড় রাস্তার এখানে ওখানে বাফেল ওয়াল উঠেছে। পার্কে পার্কে মাটি খুঁড়ে ইঁট পেতে তৈরী হয়েছে 'আত্মরক্ষার' সেন্টার। বাফেল ওয়ালগুলো প্রকৃতপক্ষে বাফেল করেছে কলকাতার মানুষকে। সেন্টারগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে যারা দিনের পর দিন রাজপথ জনপথে জীবন কাটায়। এ আর. পি, প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে সাইরেন বাজিয়ে কলকাতা-বাসীকে সতর্ক করে ; আদেশ দেওয়া হয়েছে রাত্রে ঘরের আলোগুলিকে কালো কাপড়ে ঢেকে রাখতে হবে, জানলায় লাগাতে হবে পর্দা এবং জানালার কাঁচে আঠা দিয়ে কাগজ লাগিয়ে তাদের করতে হবে মজবুত। রাস্তার আলোগুলো কালো পোষাকে অবগুণ্ঠিত, রাত্রিতে যানবাহন বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। বাস-ট্রাম-মোটরগাড়ীর আলো কালো রঙে অর্ধেক লুক্কায়িত। সব ব্যাপারটাই ইতিহাসের বিরাট নিষ্ঠুর অট্টহাসি, অথবা চাবুক মারা বিদ্রূপ। যারা সত্যিকারের যুদ্ধ এলাকায় বাস করছে তারা জানত এসব 'রক্ষা' ব্যবস্থা নিতান্ত হাস্যকর। কিন্তু ইংরেজ সরকারকে দেখাতে হয়েছে তারা ভারতবাসীকে পেটে মেরে দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল করে দিতে পারে, কিন্তু তাদের 'সংরক্ষণ' বিষয়ে সম্রাটের মনোযোগের অভাব নেই।

সোভিয়েট রাশিয়া হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির চোখে প্রায় তিন বছরের পুরোনো এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হঠাৎ রাতারাতি গণযুদ্ধে পরিণত হল। এ নিয়ে কোনো প্রতিবাদী প্রশ্ন আমাদের মতো কমিউনিষ্ট ছেলেমেয়েদের মনে একেবারেই আসেনি। আমরা দাদাদের কাছ থেকে শুনে নিশ্চিত বিশ্বাস করে নিয়েছি যে বিশ্বব্যাপী গণযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয় প্রত্যেক প্রগতিশীল মানুষের অনিবার্য কর্তব্য, এ পরাজয় সাম্রাজ্যবাদকেও পিছু হটতে বাধ্য করবে। অন্যান্য উপনিবেশগুলির সঙ্গে ভারতও পাবে মুক্তি। এই বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে আমরা "বিপ্লবী" সংগ্রামে হাত দিয়েছি, আমাদের বিপ্লবী কাজ গোপনীয়

পুঁথিপত্র লুকিয়ে রাখা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাচার করা এবং সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা।

বিশ্বযুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টিকে তার বেআইনী বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সে এখন একই সঙ্গে ইংরেজ শক্তির মিত্র ও শত্রু: তার প্রধান শত্রু জাতীয় কংগ্রেস ও সুভাষ বসুর আই. এন. এ.। ১৯৪১ সালে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আপোষ মিশন নিয়ে দিল্লীতে উপস্থিত। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের আমন্ত্রণে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের নেতারা ক্রিপসের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত। আমরা বড় ক্ষুদে কমিউনিষ্টরা এ জন্যে জাতীয়তাবাদী নেতাদের উপর ক্রুদ্ধ, কারণ তখনও হিটলার সোভিয়েট রাষ্ট্র আক্রমণ করেনি। এক বছর পরে মহাত্মা গান্ধী যখন ইংরেজকে 'ভারত ছাড়' হুঙ্কার দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে 'শেষ সংগ্রাম' ঘোষণা করে ওয়র্কিং কমিটির সদস্যদের নিয়ে একসঙ্গে কারাগারে সংরক্ষিত, তখন সাধারণ মানুষ এই 'শেষ সংগ্রাম'কে বাস্তবে পরিণত করার জন্য ইট-পাটকেল, ছোরা, কিছু কিছু বন্দুক—অর্থাৎ যা কিছু 'অস্ত্র' তাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব তা নিয়ে এখানে ওখানে সাম্রাজ্যবাদীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। ভারতবর্ষে চলছে এক বিরাট হাস্যকর সাম্রাজ্যবাদী লড়াই। কমিউনিষ্ট নেতারা, আমাদের মতো তাদের শত শত নিঃসন্দেহ সমর্থকরা এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে তিরস্কার করছি, প্রগতি বিরোধী হিসেবে গালাগালি দিচ্ছি গান্ধী-নেহেরু-সুভাষ-প্যাটেল-মৌলানা আজাদকে। আমাদের দাদারা অনেকেই এ. আর. পি-তে যোগ দিয়েছেন। আমরা যেখানে পারি সভা করে বঙ্গবাসীকে "গণযুদ্ধে" সহায়তার আহ্বান করছি, বলছি, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রাম আপাতত স্থগিত রাখাই জনগণের মুক্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

পরবর্তী জীবনে, সময়ের সদয় ব্যবধানে, ভারতবর্ষের সমগ্র জাতীয় রাজনীতি যুদ্ধের সময় ও পরে এক অতিশয় বিকট ও নকল অভিনয় ছাড়া আর যে কিছু নয় তা বোঝা অনেকের মতো আমার পক্ষেও সম্ভব ছিল। কমিউনিষ্টদের পক্ষে এটুকু বলা যায় যে অক্ষশক্তিকে পরাস্ত করে মিত্রপক্ষের জয়ের পরে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ হয়ে পড়বে এত দুর্বল যে মার্কিন সাহায্য ছাড়া তার অস্তিত্ব সম্ভব হবে না, এই ঐতিহাসিক সত্য তারা বুঝতে পেরেছিল।

যুদ্ধ শেষ হবার পরেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোচীনে সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করতে গিয়ে অচিরে যুদ্ধের ভার আমেরিকার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হল।

ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ, সাম্রাজ্যবাদীরাও আমেরিকার সাহায্য নিয়ে লড়াকু জাতীয়তা-বাদীদের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হল। সব সাম্রাজ্যবাদীদের অগ্রগামী ইংরেজ, তার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যে একশ বছর সূর্যাস্ত হয়নি; রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধিতেও সে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তারও উপর ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস। তাছাড়া বিধাতার নিষ্ঠুর হাত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রধান নেতা উইনস্টন চার্চিলের গর্ব উন্নত শিরে যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক আগেই যে আঘাত করলেন তার জন্যেও ভারতবাসী প্রস্তুত ছিল না। পোটস্‌দাম শহরে মিত্রশক্তির ঐতিহাসিক বৈঠকের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচনে ব্রিটেনের জনসাধারণ চার্চিলকে বনবাসে পাঠিয়ে লেবার পার্টির হাতে শাসনভার তুলে দেয়। লেবার পার্টি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু রেখে ভারত সাম্রাজ্য থেকে কি করে বিদায় নেওয়া যায় তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু করে। এই জল্পনা কল্পনা থেকে এক ঐতিহাসিক ঘটনা স্রোত প্রবাহ পেল, যাকে ইংরেজী ভাষায় বলা হয় ডিকলোনাইজেশান, বাংলায় অনুবাদ করলে হবে: সাম্রাজ্য পরিত্যাগ। এই স্রোতের প্রবাহে প্রথম মুক্তি পেল বর্মা। তারপর শুরু হল মানুষের সমগ্র ইতিহাসে সবচেয়ে বিশাল ও দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রস্থান পর্বের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার স্মৃতি আমার প্রজন্মের ভারতবাসীর মনে এখনও সজীব।

লর্ড ওয়াভেল বিদায় নিলেন। নতুন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড ম্যাউন্টব্যাটেন, তাঁর লক্ষ্য, ভারতবাসীকে 'স্বাধীনতা' দেওয়া। অর্থাৎ যে পথে ইংরেজ এসেছিল নিজেদের অস্ত্র ও রাজনীতির দাপটে, সে পথেই তারা বিদায় নেবে মাথা উঁচু রেখে গর্বের সঙ্গে দুনিয়ার কাছে ঘোষণা করে—যে একদিন যেমন তারা সাম্রাজ্য ঘোষণা করেছিল অন্য দিন অন্য পৃথিবীতে অন্য জামানায় সাম্রাজ্য থেকে সসম্মানে প্রস্থান করার মতো সুবুদ্ধি ও মানসিকতা তাদের ছিল। আমরা ভারতবাসীরা একদিকে লেবার সরকার দ্বারা প্রেরিত ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে বিভিন্ন দলীয় ও বিভক্ত আলোচনায় যোগ দিলাম, মুসলীম লীগ পাকিস্থান পাওয়ার জন্য সারা দেশ জুড়ে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়ে দিল, তার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ আঘাত পড়ল কলকাতার বুকে। শেষ পর্যন্ত ভারত বিভক্ত হলো। সৃষ্টি হলো নতুন একটি দেশ। পাকিস্থান। সঙ্গে সঙ্গে দু'টুকরো হলো পাঞ্জাব ও বঙ্গ। আমি পূর্ববঙ্গের সন্তান। যে উপনিবেশ অপসরণ স্রোতের কথা একটু আগে বলেছি তার আশীর্বাদে ও অভিশাপে কোটি কোটি পূর্ব বঙ্গবাসীর মাতৃভূমি হয়ে গেল এক সদ্যজাত দুশমনী দেশের শিথিলতম অংশ।

॥ চব্বিশ ॥

ইতিহাসের এই প্রবল প্রবাহের মধ্যেই আমার মত বাঙালী যুবকের জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। স্কটিশ কলেজে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়বার সময় মনে হয়েছিল যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরাবাধা পড়াশোনা মনকে কেবলমাত্র ক্ষুদ্রতার মধ্যে বন্দী করে রাখে। হঠাৎ শেক্সপিয়র, উইলিয়ম স্কট, মিলটন, বায়রণ, কীটস্, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, একেবারে ইংরেজের চোখে দেখা ভারতীয় পণ্ডিতদের হাতে লেখা রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিশ্ব-ইতিহাস, এই সমস্ত পাঠ্য পরিধিটাই আমার কাছে একটা নিষ্ঠুর প্রতারণা হিসেবে ধরা পড়েছিল। একমাত্র বাংলা ছাড়া আর সবটাই আমার মনে হতো 'আমাদের রেখেছো কেরানী করে মানুষ করোনি' নীতির সুপ্রণীত অংশ।

অধ্যাপক সুধাংশু দাশগুপ্তের ক্লাসে বাংলা পড়তে গিয়ে আমার দৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইত্যাদির অনেকের দরজা পেরিয়ে আমি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী ছাত্র হয়ে উঠেছিলাম। গোরা, ঘরে-বাইরে, আনন্দমঠ, জাগরী, ডি. এল. রায় ও গিরীশ ঘোষের নাটক, 'পরিচয়' পত্রিকার প্রবন্ধাবলী, আমাদের সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুধীন্দ্র দত্তের কবিতা এবং কল্লোল যুগের রথী-মহারথীদের উপন্যাস ও 'দুর্বোধ্য এবং অশ্লীল কবিতা' আমার মানসিকতার অন্যতম প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, বামপন্থী উপন্যাস, কবিতা, আলোচনা, বাম ঘেঁষা রাজনীতি—সুলভ লেখা, আমার মনের আর এক প্রধান খোরাক।

এর ফল হল বি. এ. পরীক্ষায় অনার্সে প্রথম শ্রেণী জুটলো না। দোষটা যে পুরোপুরি আমার তা কখনও মেনে নিতে পারিনি। প্রথমত এমন একজনও অধ্যাপক ছিলেন না, যাঁর কাছে ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে আমি আমার মনে উৎসাহের স্ফুলিঙ্গ তৈরী করতে পারতাম। সুশীল মুখার্জী মশাই আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিতেন যে আমার লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রথম শ্রেণী পাবার জন্য যথেষ্ট। প্রথম শ্রেণীর বদলে স্কটিশ কলেজ থেকে ইংরেজী অনার্সে পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হবার জন্য ছাত্র-জীবনের প্রথম ও শেষ স্বর্ণপদক মিলেছিল, তাতে বিন্দুমাত্র গৌরববোধ করিনি।

াধ হয় বিশেষ করে এ কারণে যে, পদকটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন একেবারে না অনুষ্ঠানে, অফিসের হেড ক্লার্ক।

স্কটিশ কলেজে পড়ার সময় সবচেয়ে বড় দাগ কেটেছে আমার মনে তা-হল ধ্যাপক মার্কাস গ্রে-র দীর্ঘকালীন বন্ধুতা। সাহেবদের বয়স বুঝতে পারার শক্তি দ সময়ে আমার একেবারে ছিল না। ইংরেজ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা সকলেই র্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের পাদরী। খৃষ্টধর্ম প্রচার করা তাদের প্রত্যেকের আদর্শ ও র্তব্য। মার্কস গ্রে, আমি এখন বুঝতে পারি, আসলে ছিলেন সমাজবাদী। খন তাঁকে আমার মনে হতো আদর্শবাদী। আমাকে তিনি খুব সহজে বন্ধু করে য়েছিলেন। অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে যে কানো বই যে কোনো সময়ে নিয়ে যাওয়া, একমাত্র শর্ত ছিল পড়া শেষ হয়ে গলে স্বস্থানে রেখে দিতে হবে। গ্রে-র কাছে আমি কৃতজ্ঞ বার্ণাড শ, ল্যাস্কি, এবং বিখ্যাত অর্থনীতিক কীন্‌স্-এর লেখার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। ল্যাস্কির "গ্রামার অফ পলিটিক্স" আমি তাঁর কাছেই পড়ি। অবশ্য তাঁর নিজের কাছে প্রিয়তর ছিলেন রাস্কিন এবং গ্রহণযোগ্য ছিল খৃষ্টধর্মের মরালিটি সমৃদ্ধ সিণ্ডি চলিসন। অধ্যাপক গ্রে ঘোরতর কমিউনিষ্ট বিরোধী ছিলেন। আমি যে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে সংযুক্ত এটা তাঁর কাছে অপরাধ ছিল না, ছিল শোধনীয় দোষ ও দুর্বলতা। তখন বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে মরাল-রি-আর্মাণ্ট, অথবা এম. আর. এ. আন্দোলন, আমদানি হয়েছিল খৃষ্টান পাদরী ও সিভিলিয়ান অফিসারদের মাধ্যমে।

গ্রে ছিলেন এম. আর. এ. আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। আমাকে তিনি এর মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন। সব ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হোত। এম. আর. এ.-র সভায় উপস্থিত প্রত্যেকে নিজেদের দোষ, অন্যায়, অপরাধ, ত্রুটি, বিচ্যুতি—এক কথায় খৃষ্টানরা যাকে বলে পাপ—অকপটে নিবেদন করে দিতেন। তা নিয়ে সুন্দর সংগঠক আলোচনা হোত। হিন্দু পরিবারের ছেলে হিসেবে আমার কাছে এটা ছিল বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। আমরা শৈশব থেকে দোষ ত্রুটি অপরাধ লুকাবার জন্য পুরো অথবা আধা মিথ্যের ব্যবহারে চতুর হয়ে উঠি। মিথ্যে বলি, কেননা আমাদের মনে শাস্তির ভয়। অন্যায় স্বীকার করলে অভিভাবকদের কাছে তৎক্ষণাৎ মার্জনা পাওয়া আমাদের সমাজনীতির বহির্গত। অন্যায় করেছ তো শাস্তি পেতে হবে। আমাদের গ্রামে ছোট পরিবারেও বাল্যকাল

থেকে কত অন্যায় দেখেছি ও নিজেও করেছি, যার সবটাই আমার মধ্যে লুকোনো লজ্জাকর স্মৃতি। এখন এই এম. আর. এ-র সভ্যদের খোলাখুলি অন্যায় ও অপরাধ স্বীকার ও তা নিয়ে সংগঠক আলোচনা আমার মনে হয় চরিত্র গঠনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। বর্তমান কালের থেরাপীর সঙ্গে ব্যাপারটা তুলনীয়। তফাৎ শুধু এই যে এম. আর. এ-রা ঈশ্বরের পুত্র যীশুকে সর্বদা চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। স্কটিশে আমাদের বাইবেল পড়তে হোত, যদিও প্রিন্সিপ্যাল ক্যামেরণ সাহেব বাইবেলকে আকর্ষণীয় করে পড়াতে পারতেন না। বাইবেল ক্লাস বাধ্যতামূলক ছিল না। অতএব ছাত্র সংখ্যা খুব হোত না। আমার কিন্তু বাইবেল পড়তে ভালো লাগতো। যীশুর জীবন আমার কাছে ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণীয়। অনেক সময় বাইবেল বা যীশুর কাহিনী পড়তে গিয়ে আমার মনে গুঞ্জরিত হত 'ওই মহামানব আসে'। পরবর্তী জীবনে আরও দুজন মহাপুরুষের সম্বন্ধে সেই গুঞ্জন আমার মনে বার বার ধ্বনিত হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

একদিন এম. আর. এ-র সভায় গ্রে সাহেব আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমার কোনো অন্যায় অপরাধ কনফেসন করার মতো আছে কিনা। আমার বুক কেঁপে উঠলো। পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, হাত ঘর্মাক্ত। এম. আর. এ-তে খৃষ্টান এবং বাঙালী ও ভারতীয় কিছু স্ত্রী-পুরুষ সংযুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মস্করা করে বলে উঠলেন, ওতো কমিউনিষ্ট। কমিউনিষ্টদের কোনো পাপবোধ থাকে না। অনেকেই একটু হাসল। কিন্তু দেখলাম সবাই আগ্রহের সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। এই ছেলেটির স্বীকার করার মতো কোনো দোষ বা অপরাধ নেই?

আমার মনের পর্দায় একের পর এক অন্যায় ত্রুটি বিচ্যুতির ঘটনা ভেসে উঠল। সেই গ্রামের ছোটবেলা থেকে বর্তমানের আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি? প্রত্যেকটা বলতেই মুখ আড়ষ্ট, আমার মত বচনশীল যুবকেরও শব্দের দুর্ভিক্ষ।

তবু সাহস বেঁধে বলতে শুরু করলাম। প্রথমে আস্তে, তারপর দেখলাম নিজে থেকেই কণ্ঠে জোর এল। বললাম, "আমার জন্ম পূর্ববঙ্গের সুদূর এক গ্রামে এক দরিদ্র অথচ অভিজাত পরিবারে। আমার বাবা বিদেশে স্কুল মাষ্টারী করতেন। ছ'সাত বছর বয়স থেকে বলতে গেলে আমিই সংসারের কর্তা; আমার সবটুকু শক্তি ও প্রেরণা আসত আমার মা'র কাছ থেকে। অনেক খারাপ কাজ করেছি কিন্তু সেগুলো বলার এখন কোনো মানে হয় না। আমি আপনাদের কাছে সম্প্রতি কৃত

একটি অপরাধ স্বীকার করছি। টমোড়ী হোস্টেলের পরিচালনার ভার প্রত্যেক মাসে এক একটি ছাত্রকে বহন করতে হয়। আমাকে তিনবার এ-ভার নিতে হয়েছে। দু'বার খাওয়া-দাওয়ার জন্য নির্ধারিত অর্থ থেকে আমি কিছু টাকা চুরি করেছি। একবার বারো টাকা, দ্বিতীয়বার পনের। ঠাকুরের সঙ্গে বাজার করতে গেছি, নিজের হাতে দাম দিয়ে ওই টাকাটা বেঁচেছিল, সেটা আমি হোস্টেল ফাণ্ডে ফেরৎ না দিয়ে একবার দেশে মাকে পাঠিয়েছি। দ্বিতীয়বার নিজের জন্য বই কিনেছি। আমি আরও একটি গুরুতর অন্যায় করেছি। হোস্টেলে লাইব্রেরীর জন্য বই কেনার ব্যবস্থা আছে। দু'মাস আগে বই কেনার ভার ছিল আমার উপরে। আমি একটি দোকান থেকে বই কিনে তার রশিদের উপর দুখানা অ-ক্রীত পুস্তকের নাম লিখে মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছি এবং বাড়তি টাকাটা দিয়ে নিজের জন্য বই কিনেছি। আমার এই অন্যায় স্বীকার করতে পেরে ভাল লাগছে। বোধহয় আমি এ কাজ আর করব না।"

আমি নিজেই বুঝতে পারিনি স্বীকারোক্তির সময় দু-চোখ থেকে অশ্রু বেয়ে আমার গাল ভিজে গেছে। বুঝতে পারলাম আরও কয়েকজনকে চোখ মুছতে দেখে। তাদের মধ্যে ঠিক আমার বরাবর বসা অধ্যাপক গ্রে ও তাঁর স্ত্রী মেরী।

॥ পঁচিশ ॥

অধ্যাপক গ্রে, আগেই বলেছি, আমার যৌবনের সবচেয়ে প্রধান পরিবর্তনের পুরোহিত। খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে যে অনেকখানি ঔদার্য রয়েছে, যীশুর জীবন যে পাপী-তাপীদের জন্যই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল, এ সব কাহিনী আমি মার্কাস গ্রে-র মুখে শুনেছিলাম। পুরোনো ও নতুন টেষ্টামেন্ট এর মধ্যে বিভেদ ও তফাৎ ক্রিশ্চিয়ানিটি ও জুডাইজ্‌ম কেন অনেক মিল সত্বেও পারস্পরিক দ্বন্দ্বে আবদ্ধ, বিশ্বের একই অঞ্চলে জন্ম নিয়েও ক্রিশ্চিয়ানিটি ও ইসলাম কেন একে অপরের দুশমন, তাঁর কাছে প্রেরণা না পেলে আমার এ সব ধর্মীয় ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় হোত না। ইউরোপের মধ্যযুগ পেরিয়ে, রেনেসাঁসে পদক্ষেপ, রেনেসাঁস থেকে মর্ডান অথবা আধুনিক সভ্যতায় উত্তরণ, শিল্পবিপ্লব, সমাজগঠন ও সাম্রাজ্য নিয়ে প্রতিযোগিতার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ শিক্ষাও আমি তাঁর কাছে পেয়েছিলাম। এ সব ছাপিয়ে যে শিক্ষা পেয়েছিলাম যা আমি সম্যক গ্রহণ করতে পারিনি, তা হল মানসিকতা।

আমাদের হিন্দু মনের কাছে ক্রিশ্চানরাও অনেক সময় বোকা বোকা দেখান। সহপাঠী ছিল একটি পাঞ্জাবী হিন্দু ছেলে, পরবর্তী জীবনে যে বড় পুলিশ অফিসার হয়েছে। মাঝে মধ্যেই গ্রে সাহেবের কাছে গিয়ে চোখের জলে গাল ভাসিয়ে 'পাপ' স্বীকার করত এবং দশ বিশ পঞ্চাশ এমনকি একশ টাকা নিয়ে ঘরে ফিরত, যার ব্যবহার হোত আমাদের সিনেমা দেখা, রেস্টুরেন্টে খাওয়া ও দুই-এক খানা বই কেনাতে। একদিন আমি অধ্যাপক গ্রে-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পাঞ্জাবী ছেলেটির সব পাপ স্বীকার করাকে আপনি বিশ্বাস করেন কিনা। গ্রে অকপটে জবাব দিয়েছিলেন, "নিশ্চয়ই করি, পাপ না করেও যদি কেউ পাপ স্বীকার করে সেটাও তো পাপ স্বীকারই।" বাক্যটির মধ্যে যে জীবন দর্শন ছিল তা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।

একদিন মার্কাস গ্রে'র ঘরে আমার ডাক পড়ল। গিয়ে দেখলাম তাঁর অফিস ঘরে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন তিনি, পাশে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট মেরীর মুখ থমথমে। আমি ঘরে ঢুকতেই গ্রে বললেন, "এই চেয়ারটায় বস।"

বসলাম। গ্রে বললেন, "মেরীর সঙ্গে জীবনে আমার প্রথম বড় ঝগড়া ঘটেছে। তোমাকে ব্যাপারটা শুনতে হবে।"

আমি বিব্রত চকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে অপেক্ষমান দৃষ্টি নিয়ে বসে রইলাম।

গ্রে বললেন, "আমাদের বেশ কিছু টাকা জয়েন্ট স্টক কম্পানীর শেয়ারে বিনিযুক্ত আছে। এই কম্পানীগুলো ক্যাপিটালিষ্ট এবং গরীবদের শোষণ করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি প্রকৃত ক্রিশ্চান হয়ে থাকি, তাহলে এইসব স্টকগুলো বিক্রি করে টাকা পয়সা যা পাওয়া যায় তা চার্চে দিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। মেরী বলেছে, আমি নিছক বোকামি করছি। কম্পানীদের অর্থে অনেক ভাল কাজও হয়ে থাকে। এবার তুমি বল আমি ঠিক বলছি, না মেরী?"

আমি বেশ সপ্রতিভ স্বরে হিন্দু নীতি অনুসরণ ক'রে বললাম, "তোমরা দুজনেই।"

বলতে ভুলে গেছি আমি অধ্যাপক গ্রে ও তাঁর পত্নীকে প্রথম নামে ডাকতাম। অর্থাৎ ছাত্র হলেও আমাকে তাঁরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

গ্রে উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললেন, "ঠিক হিন্দুর মতো বলেছ। এটাও হয়, ওটাও হয়। সব পথই নিয়ে যায় ঈশ্বরের দিকে। অতএব হিন্দুদের কোনো কিছুই বেছে নিতে হয় না, জলে নামে কিন্তু গা ভেজে না।"

মেরীও হেসে উঠল।

আমি হেসে বললাম, "কিন্তু এটা তো সত্যি যে কম্পানীর টাকায় একদিকে যেমন দরিদ্র বঞ্চিতদের শোষণ করা হয়, অন্য দিকে উৎপন্ন হয় দ্রব্য সম্ভার, তৈরী হয় রাস্তাঘাট বন্দর যানবাহন।"

গ্রে বললেন, "তুমি কমিউনিষ্ট?"

—"আমি কমিউনিষ্ট হিসাবে তোমার প্রশ্নের জবাব দেইনি। তুমি তো শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলছ না।"

গ্রে বললেন, "আমি শ্রেণী সংগ্রাম বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি সব মানুষের সংগ্রামে। আমাদের পুত্র-কন্যা নেই। দুজনেই আমরা জীবন চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের হাতে উৎসর্গ করেছি। যতদিন বেঁচে থাকবো চার্চ আমাদের ভরণ-পোষণ করবে। আমরা করব চার্চের সেবা। এখানে আমাদের নিজস্ব সম্পত্তির স্থান কোথায়? এটা কী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ হচ্ছে না?"

এম. আর. এ-র সেই সভায় পাপ স্বীকার করে আমার মনে এতটা জোর এসে গিয়েছিল যে, যা সত্যি মনে হত বলতে বেশি কষ্ট হত না, ভয়টা অনেকখানি চলে গিয়েছিল।

আমি মেরীর দিকে তাকিয়ে বললাম, "মার্কাস যা বলছে তা যে সত্যি, এটা তুমি নিশ্চয়ই মানো।"

মেরীর চোখ ভিজে এসেছিল। বলল, "তুমি তো জান না কত কষ্টে আমাকে এই টাকাগুলো বাঁচাতে হয়েছে। চার্চ আমাদের বিলাসিতার জীবন দেয় না। ঠিক যেটুকু প্রয়োজন তাই দেয়।"

আমি বললাম, "তাহলে, মেরী, এই ত্যাগটা তোমার পক্ষে হবে আরও মহান।"

অধ্যাপক গ্রে তাঁর সব শেয়ার বেচে দিয়েছিলেন। সব সম্বল ত্যাগ করে তিনি যে কতখানি শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন তার প্রমাণ ক'বছর পরেই পাওয়া গেল। বিশ্বযুদ্ধ চলেছে। ভারতে নিবাসী ইংরেজদের সামরিক কাজকর্মে অংশ নিতে বলা হয়েছে। অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁদের বয়স চল্লিশের নিচে তাঁরা একে একে অফিসার পদে সৈন্য, নৌ, বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর যাঁদের বয়স তাঁরা যানবাহন, কমিউনিকেশন, প্রপ্যাগাণ্ডা ইত্যাদিতে যোগ দিচ্ছেন।

মার্কাস গ্রে সৈন্য বিভাগে যোগ দিলেন সাধারণ সৈনিক হিসাবে, যাকে বলে আদার র‍্যাঙ্ক। ব্যাপারটা নিয়ে কলকাতায় বেশ কিছু আলোড়ন ঘটেছিল। কলেজের সাহেবরা, বিশেষ করে প্রিন্সিপ্যাল ক্যামেরণ গ্রে-র কাজ মোটেই পছন্দ করেন নি। কিন্তু কারও কথায় কান দিলেন না অধ্যাপক গ্রে। ভর্তি হয়ে গেলেন ইংরেজ সৈন্যবিভাগে একজন সাধারণ সিপাহী হিসাবে। সবাকার প্রশ্নের উত্তরে তাঁর মুখে শুধু এক কথা, যদি শত্রুর সঙ্গে লড়তে হয় লড়ব সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাত মিলিয়ে অফিসারী করব না।

ঘটনার কতকগুলো পাতা এগিয়ে গিয়ে গ্রে-র কাহিনী শেষ করা যাক। এম. এ. পড়ার সময় বঙ্গের দুর্ভিক্ষ সারা পৃথিবীকে নাড়া দিয়েছে। আমাকে টিউশানি করে পড়ার খরচ দিতে হচ্ছে। পিসিমার বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হয়েছে টিউশানির মাইনের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ দশ টাকার বিনিময়ে। বাবা খুলনা থেকে লিখেছেন, সংসার আর চলছে না, একমণ চালের দাম চল্লিশ টাকা ছাড়িয়ে গেছে, আমার পিতৃদেবের এক মাসের পুরো মাইনে। আমি পড়াশোনা ছেড়ে চাকরীর সন্ধান করছি। এই সময় পিসিমার বাড়ীর ঠিকানায় এল একখানা চিঠি, লেখক মার্কাস জি গ্রে। অনেক কষ্ট করে নাকি আমার ঠিকানা পেয়েছেন। জানতে চাইছেন আমি কি করছি, কি করতে চাই।

একটা দুর্বোধ্য সাঙ্কেতিক ঠিকানা ছিল চিঠিটার ওপরে, পরিষ্কার বুঝলাম

সামরিক ঠিকানা। পরের দিনই জবাব দিলাম নিজের অবস্থা জানিয়ে। লিখলাম, স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক মিষ্টার ইয়ান স্টীফেন্স তো তোমার কেম্ব্রিজের সহপাঠী বন্ধু। টমোড়ী হোস্টেলে তোমার বাড়ীতে কয়েকবার আসতে দেখেছি। তোমার পক্ষে কি সম্ভব তাকে লেখা, আমি বুক রিভিউ, ছোটখাটো রিপোর্ট বা প্রবন্ধ লিখে কিছু রোজগার করতে পারি? তাহলে আমার পড়াটাও হয়, বাবাকেও কিছু সাহায্য করা যায়।

দু-সপ্তাহের মধ্যে মার্কাস গ্রে'র জবাব এসে গিয়েছিল। লিখেছিলেন, "ইয়ান স্টীফেন্সকে আমি তোমার কথা লিখেছি, একদিন গিয়ে দেখা কোর। যুদ্ধের চাপে কাগজের পৃষ্ঠা খুব কমে গেছে। কিছু করতে পারবে কিনা সেই তোমাকে বলবে।"

স্টেটস্‌ম্যানে আমার চাকরী জীবন শুরু, মার্কাস ডি. গ্রে'র দাক্ষিণ্য-সমৃদ্ধ বন্ধুত্বে। এ ঘটনার বিবরণ একটু পরে আসছে।

আমি তখন স্টেটস্‌ম্যানের কনিষ্ঠতম সব-এডিটর। নিউজ রুমে বসে কাজ করছি উত্তীর্ণ অপরাহ্নে। এক পেয়াদা এসে একটি চিরকুট হাতে দিল। তাতে লেখা মার্কাস ডি. গ্রে। আমি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখতে পেলাম হলে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক গ্রে। পরিধানে খাকি পোষাক, দেহ অনেক শীর্ণ, আগের তুলনায় অনেক মজবুত।

আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "খুব খুশি হয়েছি তুমি এখানে কাজ পেয়েছ। স্টীফেন্স তো মনে হল তোমার কাজকর্মে মোটামুটি সন্তুষ্ট। যদি সাংবাদিক হতে চাও তো শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং তোমাকে শিখতেই হবে। ইংরেজীটা শুনলাম তোমার এখনও বাঙালী বাঙালী। মাঝে মাঝে বানান ভুল কর। এগুলো সামলে নিও। ভবিষ্যতে তোমার ভালোই হবে।"

কথা আমার গলায় জড়িয়ে যাচ্ছিল, বললাম, "তোমার চিঠিতে এই বিরাট দুর্গের দ্বার খুলেছে আমার মতো একটি সাধারণ বাঙালী ছেলের জন্য। ধন্যবাদ দিয়ে তোমার অপমান করব না। কিন্তু কখনও যা বলিনি আজ তা বলছি, কারণ জীবনে হয়ত তোমাকে আর দেখবো না। তুমি আমার জীবনকে বাঁচবার মতো করে দিয়েছ। তোমার কাছ থেকে সততা, নির্ভয়তা ও পরিষ্কার ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা পেয়েছি। চেষ্টা করবো তোমার চিন্তা ও আদর্শকে সামনে রেখে চলতে।"

দেখলাম অধ্যাপক গ্রে ভীষণ বিব্রত হয়ে গেছেন। চট করে কথা পাল্টে বললেন, "মেজর ম্যাকভেল কেমন আছেন?"

—"তিনি তো যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁর খবর তো রাখবে তুমি!"

—"যা বলছি তা শুনে অবাক হোয়ো না। মেজর ম্যাকভেল যে কম্পানীর অধিনায়ক আমি তাতেই সার্জেন্ট। আমার দুটো প্রমোশন হয়েছে। মেজর ম্যাকভেলকে দেখামাত্র আমাকে স্যালুট করতে হয়। সাধারণ স্যালুট নয়, সামরিক স্যালুট।"

দু'পায়ের গোড়ালি সশব্দে একত্র করে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালেন মার্কাস গ্রে। আমরা দু'জনে হেসে উঠলাম। জন ম্যাকভেল লণ্ডন ইউনিভারসিটির বি. এ। 'স্টেটস্‌ম্যানে' ভাগ্যক্রমে নিউজ এডিটর হতে পেরেছিলেন। মার্কাস গ্রে কেম্ব্রিজের ট্রাইপস্। বিদ্যায় ব্যক্তিত্বে স্টেটস্‌ম্যানের এডিটরের সমকক্ষ।

আমি জানতে চাইলাম, "মিষ্টার ম্যাকভেল তোমাকে কি বলে সম্বোধন করে?"

—"মিষ্টার ম্যাকভেল নয়, মেজর ম্যাকভেল। তার কাছে আমি সার্জেন্ট গ্রে।"

মার্কাস ডি. গ্রে'র সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। বহু বছর পরে ইংরেজ সরকার দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে ব্রিটেন ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়ে আমি অনুরোধ করেছিলাম মার্কাস ডি. গ্রে'র সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গিয়েছিল। সত্তর বছরের বৃদ্ধ মার্কাস গ্রে এডিনবরার তিরিশ মাইল দূরে একটি গ্রামীন গির্জার পুরোহিত। তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়নি।

॥ ছাব্বিশ ॥

আমাদের পরিবারে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। কাকামণির পাঞ্জাব যাওয়ার ছ'মাসের মধ্যেই কাকিমা ও খুড়তুতো ভাই বোনেরা তাঁর কাছে চলে গেল। ২৯ নম্বর বীডন স্ট্রীটের পরিবারগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। পিসিমা গোয়াবাগানে আলাদা ঘর ভাড়া নিলেন। তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট। রেণুদি, অনুদি দুজনেই কলেজে পড়ছে, বেথুনে দুজনেরই সম্মান। দাদামণি যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা করে অর্থবান হতে চলেছে: পিসেমশাই বেহালায় কবিরাজি করেন। সারা সপ্তাহ ওখানে কাটিয়ে শনিবার রবিবার বাড়ী আসেন। আমি টম্যোড়ী হোস্টেলে থাকার সময় মা'র একটা পত্রে জানলাম আমার এক নতুন বোন জন্মেছে। নাম রাখা হয়েছে বেণু। খবরটা জেনে কেন জানি খুশি হতে পারলাম না। এক বোন ও দুই ভাই আমার হাতে ছোটবেলায় তৈরী হয়েছে। আমি তাদের স্নান করিয়েছি, খাইয়েছি, জামাকাপড় পরিয়ে দিয়েছি। বোনকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছি, ভাইদের প্রথম পাঠ শিখিয়েছি। এ-বাড়ীতে এবার একটি বোন জন্মাল, যার সঙ্গে আমার বয়সের প্রচুর ব্যবধান, আদান প্রদানের বিরাট দূরত্ব। এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনও গভীর হতে পারবে না। আমার প্রভাব পড়বে না এর জীবনে।

হোস্টেলে আমার আর্থিক অবস্থা ভাল। খেতে পরতে খরচা লাগতো না। পনের টাকা সরকারী বৃত্তি এবং কাকামণির দ্বারা প্রেরিত দশ টাকা। সরকারী বৃত্তি আসতে মাসের পর মাস দেরী হয়ে যেত, তখন, অনেক সময়, অধ্যাপক গ্রে অগ্রিম টাকা ধার দিতেন। কিছু টাকা আমি প্রতি মাসেই গণেশপুরে পাঠাতে পারতাম।

১৯৪১-এ ইচ্ছে হল গ্রামে যাবার। সব আত্মীয় স্বজনদের জন্য শাড়ী, ফ্রক, প্যান্ট, শার্ট, ধুতি, পাঞ্জাবী কিনে ফেললাম। সংকল্প করলাম পুজোর পর সব প্রজাদের খাওয়ানো হবে, খরচ বহন করব আমি। বালকদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে আমার খরচে। সেজন্যে বেশ কিছু প্রাইজ কিনে নিলাম।

শিয়ালদা থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেলগাড়ী, তারপর স্টীমার চেপে হরেশ্বর। সেখান থেকে নৌকা চেপে গণেশপুর। বাজারের সামনে নৌকা ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গে

দেখতে পেলাম জ্যেঠামশাই দুই ভাইবোনকে নিয়ে আমার অপেক্ষায়। রাস্তায় যেতে যেতে দীর্ঘ বছরগুলির বড় বড় ঘটনা শোনা গেল। কোন্ বাড়ীর কার মৃত্যু হয়েছে, কার হয়েছে বিবাহ, ক'বার বসেছে যাত্রাগান ও সংকীর্তন, দোলের সময় শিব সেজে যারা নাচতে আসত তাদের কথা এবং আমাদের প্রজা-বাড়ীগুলোর মধ্যে এক বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোকের উপর ভূতের আক্রমণ।

বাড়ী পৌঁছে দেখি মা প্রায় তেমনিই আছেন। প্রণাম করতে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন বিছানায়। দেখতে পেলাম হাত পা ছুঁড়ে শুয়ে আছে ও খেলছে একটি শিশু, আমার তিন মাসের বোন বেণু। জ্যেঠামশাইকে মনে হল অনেকটা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রী বড়মা নীরব ও লাজুক। অন্য শরিকদের মধ্যেও কোনো পরিবর্তন নজরে পড়ল না। জ্যেঠামশাই আমার কেনা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে গর্বের সঙ্গে সারা গ্রাম ঘুরে এলেন।

পুজো আসবার ঠিক মুখে গ্রাম সব প্রবাসীদের প্রত্যাগমনে সরগরম হয়ে উঠল। প্রতিমা তৈরী প্রায় শেষ, খড়ি পড়ে গেছে, এখন লাগানো হবে রং। ছোট দু'ভাই কানু ও ভানু প্রায় সারা দিন ও উত্তীর্ণ সন্ধ্যে কুমোরদের সঙ্গে দুর্গামণ্ডপে।

পুজোর দু'দিন আগে বাবাও এসে হাজির হলেন। সেই মুটের মাথায় চাপানো বিছানা, কিন্তু তাঁকে নিয়ে আমার আর কৈশোরের কৌতূহল নেই। বাবাকেও দেখে মনে হল, বয়স বেড়ে গেছে। স্থির হয়ে গিয়েছিল গণেশপুরের পাট তুলে মা ও ভাইবোনেরা খুলনা চলে যাবে। প্রধান প্রয়োজন বোন মধুর শিক্ষা। প্রাথমিক পাশ করে দু'বছর বসে আছে। এবার তাকে হাইস্কুলে ভর্ত্তি করতে হবে। মা'র বিবাহিত জীবনের প্রথম শখ শহরবাসী হওয়ার। সে শখ এখন পূর্ণ হতে চলেছে। বাবা পুরোপুরি নিরানন্দ। তিনি চাকরী করতেন খুলনায়, কিন্তু সারা বছর তাঁর মনপ্রাণ পড়ে থাকতো গণেশপুরের পৈতৃক বাড়ীতে। সেখানকার ঘরবাড়ী ত্যাগ করে চলে যাবার সিদ্ধান্ত তাঁকে খুব পীড়িত করেছিল, কিন্তু দুঃখের সমব্যথী ছিল না কেউ। ছোট ভাই কানু বড় বড় তক্তাপোষ, হাতলহীন চেয়ার ও নড়বড়ে পড়ার টেবিল সবকিছু কি করে খুলনায় নিয়ে যাওয়া যায়, প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করছে প্রতিদিন। গ্রাম থেকে একটি পরিবার শহরে চলে যাচ্ছে, আর কোনোদিন ফিরবে না, তা প্রায় নিশ্চিত। এতে গ্রামের সবারই দুঃখ, কিছু যেন একটা হারিয়ে যাচ্ছে—কোথায় তৈরী হচ্ছে মস্ত একটা ফাঁক, যা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই। সবার চেয়ে উদাস দুর্বল ও পরিষ্কার ভাবে আতঙ্কিত আমাদের বহু বছরের প্রধান অভিভাবক

জ্যেঠামশাই, বাবার খুড়তুতো বড় ভাই। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক। নিঃসন্তান, তাঁর জীবনে আমরাই তাঁর সন্তান সন্ততি। এবার আমরা চলে যাচ্ছি, তাঁর তো যাবার কোনো স্থান নেই, থাকলেও তাঁকে কিছুতেই গ্রাম থেকে সরানো যেত না।

পুজোর সময় গ্রামে প্রত্যাগত মুখ্য ব্যক্তিদের সামাজিক আদান প্রদান ঘটে থাকে। এবার দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে গ্রামের সম্মানিত গুরুজনদের কাছে আমার দাম বেড়েছে। পিতৃদেব মুখে কখনও একটি প্রশংসার বাক্য উচ্চারণ করেন নি। তাঁর হাতের স্নেহ স্পর্শ লাগে নি আমার শরীরে, অথচ ফল্গুধারার মতো স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি নির্ভেজাল মমতা ও দায়িত্ববোধ তাঁর দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত রয়েছে। একদিন শুনতে পেলাম পিতৃদেব গ্রামের অন্য এক নমস্যকে বলছেন, "শ্রীমন্ত কাকা (শ্রীমন্ত দাশগুপ্ত, গণেশপুরের একমাত্র জেলা প্রশাসক) বলছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে না পড়ে স্কটিশে পড়ানো আমার পক্ষে ঠিক হয়নি। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররাই বেশির ভাগ আই. সি. এস. বি. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করে থাকে।"

আমার সেই বি. এ. পড়ার সময় তখনও জীবনে কী হব না হব, কী কাজ জুটবে না জুটবে, তা নিয়ে কোনো পরিষ্কার চিন্তা ভাবনার তাগিদ আসে নি। যখন এসেছিল এবং ভাগ্যের সুযোগে ও গ্রে সাহেবের সহায়তায় 'স্টেটস্‌ম্যানে' চাকরী পেলাম, তখন আর একবার বাবার মুখে তাঁর 'শ্রীমন্ত কাকার' অভিমত জানবার সুযোগ হয়েছিল। অভিমতটা ছিল, "স্টেটস্‌ম্যানে কাজ করা আর বি. সি. এস হওয়া সমান"। আমার কিন্তু কখন আই সি. এস, বি. সি. এস হবার ইচ্ছে ছিল না, চেষ্টা করলেও হোত না, ব্যর্থ হতাম। শুধু বুঝতে পেরেছিলাম আমার পিতৃদেবের কাছে এই ধরনের রাজপদ কত মূল্যবান। তাঁর ব্রিটিশ শ্রদ্ধার আর এক নিদর্শন!

পুজো উপলক্ষ্যে যাত্রা, নাটক, সংকীর্ত্তন সব হল, গ্রামের অভিনেতারাও ডি. এল. রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় করলেন। আমার নিমন্ত্রণে তখন কুমিল্লার জেলাশাসক শ্রীমন্ত দাশগুপ্ত ছেলেদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সভাপতিত্ব করলেন। একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আমার পিতামহ রজনীকান্তর দেশপ্রেমের প্রশংসা করে আমাকে কিছুটা বাহবা দিলেন। বিজয়ার পরের দিন প্রজাদের খাওয়ানো হল। আমার মনে আছে পঞ্চাশের উপরে নারী-পুরুষ-কিশোর-শিশুদের খাওয়াতে জ্যেঠামশায়ের হাতে আমাকে তুলে দিতে হল পনের টাকা।

গ্রামে আমার এই শেষ উপস্থিতির প্রধান ঘটনার সঙ্গে শারদ উৎসবের কোনো সম্পর্ক ছিল না। প্রাইমারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক দীনেশ কাকা (দ্বিতীয় শিক্ষক আমার জ্যেঠামশাই) একদিন আমাকে এসে পাকড়াও করলেন। তাঁর চোখে মুখে রক্তবর্ণ উত্তেজনা।

বললেন, "একটা ভীষণ কেলেঙ্কারী চলছে, তোমাকে তার মীমাংসা করতে হবে।'

—"কেলেঙ্কারী ! কী কেলেঙ্কারী ? মীমাংসা করার ক্ষমতা আমার কোথায় ?"

—"তোমাদেরই এক প্রজাবাড়ীতে।"

—"কোন্ প্রজা ?"

তোমার মনে থাকবে, আমাদের বাড়ীর বাইরের পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে এক স্বর্ণকার পরিবারের শিশু-বিধবা কমলার কথা। সেই কমলা যে সাত বছরে বিধবা হয়েছিল, সে এখন ষোল সতের বছরের যুবতী। বিজয়ার পরের নিমন্ত্রণের দিনে বাবা-মা'র সঙ্গে সেও খেতে এসেছিল। তখন দেখতে পেয়েছিলাম তার সৌন্দর্য্য গভীর কোমলতা ও নম্রতায় বিস্ময়কর ভাবে গর্জিত। আমার বোন মধুর সঙ্গে তখনও তার গলাগলি বন্ধুতা, যদিও সে বয়সে দু তিন বছরের বড়। তার চোখে আমার চোখ পড়তে, খণ্ডিত মুহূর্তের হঠাৎ চোখাচোখি, আমার শরীরে শিহরণ জেগেছিল, কমলার মুখখানা শারদীয় অপরাহ্নে মেঘের ওপর প্রসারিত সূর্যের আভায় লজ্জারুণ। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "তুমি ভালো আছো তো ?"

আমার বোন পাশেই ছিল। সে বলেছিল, "কমলা প্রাইমারী স্কুলে বৃত্তি পেয়েছে। এখন কোথায় কী পড়বে তাই নিয়ে ওর বাবার ভীষণ দুশ্চিন্তা।"

দীনেশ কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কমলার কী হয়েছে ?"

—"ছোট মামার সঙ্গে অবৈধ প্রেম করছে।"

—"আপনি জানলেন কি করে ?"

—"আপনি সব সময় নজর রাখছি। ওরা চিঠি-পত্র লেখালেখি করছে। কয়েকটা চিঠি আমি ধরতে পেরেছি। এই নাও, পড়ে দেখো।"

একগুচ্ছ চটকানো প্রায়-ছেঁড়া রুলটানা খাতার পৃষ্ঠা দীনেশ কাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। দেখলাম এক একটি চিঠির অনেকগুলো টুকরো তিনি সযত্নে আঠা দিয়ে পাতায় সংযুক্ত করেছেন। একটা চিঠির ওপর নজর রেখে বোঝা গেল— আসল প্রেমের চিঠি, গ্রামের মাটি জল জঙ্গল পশু পাখিদের মতো জীবন্ত ও নির্মোক।

দীনেশ কাকা বললেন, "আমি কমলার বাবাকে বার বার সাবধান করেছি। এই গোপাল ছেলেটা একেবারে বদ। পেশায় মিস্ত্রি, গায়ে গতরে পালোয়ান, দেখলে তুমি বলবে সুপুরুষ, কিন্তু কোনো নীতিবোধ নেই। নিজের ভাগ্নির সঙ্গে প্রেম করছে, তাকে সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তোমার জ্যেঠামশাইকে বলেছি। ওকে পোঁদায় এমন কেউ নেই গ্রামে। পুলিশের হাতে তুলে দিতে হয়।"

আমি বললাম, "দীনেশকাকা, এ ব্যাপারে আমার কী করার আছে? আমি তো এক সপ্তাহ পরে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। ওর বাবার উচিত কমলার আবার বিয়ে দেওয়া।"

—"বিয়ে দেওয়া! বিধবা মেয়েকে আবার বিয়ে দেওয়া! তোমরা কলকাতায় পড়াশুনা করে এই শিক্ষা পাচ্ছ?"

—"যদি বিয়ে না দেয়, কমলা অবৈধ প্রেম তো করবেই। ওরা তো ছোটজাত, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের পরিবারের অল্প বয়সী বিধবারা কি উপবাসী থাকে?"

দীনেশ কাকা একসঙ্গে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলেন। "তাহলে তুমি কিছু করবে না?"

—"আমার কিছু করার নেই, দীনেশ কাকা। আপনারা যাঁরা গ্রামে আছেন এটা আপনাদেরই কাজ। শুধু বলব, কমলার কথাটাও ভেবে দেখবেন।"

তিন-চার দিন পরে কমলার বাবাই আমাদের বাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। অতীক কর্মকার। ব্যবসায়ে স্বর্ণকার। তার অবস্থা ভাল।

আমি তাকে ঘরে নিয়ে এসে তক্তপোষের উপরে বসালাম। দু-চারটে বাক্য বিনিময়ের পরে প্রশ্ন করলাম, "অতীক কাকা, আমার কাছে আপনার বিশেষ কোনো কাজ আছে?"

—"একটি বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাই।"

—"আমার পরামর্শ!"

—"তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কী সব করেছ, সবার কাছে তোমার নাম শুনি। আমার সামনে এক বড় বিপদ। কমলাকে নিয়ে।"

—"কমলাকে নিয়ে কিসের বিপদ আপনার? ও তো প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করে সরকারী বৃত্তি পেয়েছে।"

—"সেটাইতো বিপদ। বৃত্তি ভোগ করতে হলে ওকে পড়াতে হয়। বড়

হয়েছে। নানা রকমের পুরুষ লেগেছে ওর পেছনে। ওই যে দীনেশ শিক্ষক মশাই, তিনি সবচেয়ে বেশি। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে আমাদের বাড়ীতে হাজির হয়। সব সময় কমলাকে কাছে ডাকে, নানা রকম লোভ দেখায়। কী যে করি ওকে নিয়ে ভেবে পাই না। কোনো উপায় বাৎলাতে পারবে ?"

আমরা সবাই জানতাম দীনেশ কাকা অকৃতদার। বয়স তখন বোধহয় চল্লিশ পেরিয়ে গেছে।

আমি বললাম, "ওকে নার্সিং স্কুলে ভর্ত্তি করে দিন। মাদারিপুরে স্কুল আছে, কলকাতাতে তো আছেই। পড়ার খরচা লাগবে না। হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হবে। আমি কলকাতায় গিয়ে আপনাকে খোঁজ খবর করে কাগজ পত্র পাঠাবো। আপনারা তপসিলী জাতের লোক। অনেক সরকারী স্থবিধা রয়েছে আপনাদের জন্যে যা আপনারা জানেন না। কমলা পুরোপুরি নার্স হতে পারবে। ওর জীবন একেবারে বদলে যাবে।"

অনেক সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান এক মুহূর্তে অতিক্রম করে যায় মানুষের মন। মনসা মথুরাং। অলডুস হাক্সলী তাঁর 'ব্রেভ নিউ ওয়ালর্ড'-এ স্যাজেভ নামে একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এক জায়গায় স্যাভেজ বলেছে—আমি দশ দিনে আতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগর পেরোতে পারি! উপন্যাসে আর একটি চরিত্র আছে, অ্যারিয়ল। সে বলে উঠল, 'আমি পারি এক মুহূর্তে, আমার মনের গতিতে।'

মনের গতিকে এক মুহূর্তের জন্য অনেক সময় পেরিয়ে যেতে দাও। ষাট দশকে আমার প্রথম লণ্ডন যাবার সুযোগ হয়েছিল। একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে খেতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম কাছাকাছি টেবিলে বসে আছে এক দম্পতি, মহিলা আমাকে বার বার দেখছে। মুখখানা চেনা চেনা মনে হল, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে পরিচয় জানবার মতো সাহস হল না।

মেয়েটি নিজেই এগিয়ে এল। বলল, "আমায় চিনতে পারছেন না ? আমি কমলা।"

—"তুমি কমলা! কি আশ্চর্য! আর উনি, তোমার স্বামী ?"

—"হ্যাঁ।"

কমলা তার স্বামীকে ডেকে আনল। সে ডাক্তার, লণ্ডনের কাছাকাছি ক্যাণ্টারবেরী শহরে এক হাসপাতালে কাজ করে। কমলা সেখানে নার্স। কে

বলে জীবন মানুষকে পুরস্কার দেয় না? কাকে দেয় কাকে দেয় না তার কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। অনেক সময় যে পায়, সে হাত ভরে, বুক ভরে পায়।

আমার গ্রামে গণেশপুরের চামার বাড়ীর শিশু-বিধবা কমলা ইংল্যাণ্ডের এক হাসপাতালের নার্স! শুধু পুনর্বিবাহিতই নয়, তার স্বামী ডাক্তার। জীবনের বিস্ময়গুলি আমাদের বারবার ধাক্কা মারে, চমকিত করে, বুঝিয়ে দেয় জীবন কী ভীষণ সুন্দর রহস্য।

॥ সাতাশ ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে সরগম। একদিকে 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের উত্তাপ, অন্যদিকে সুভাষ বসুর আই. এন. এ. এনেছে দারুণ উত্তেজনা এবং ঐ দুয়ের মাঝখানে কমিউনিষ্ট পার্টির গণযুদ্ধ আন্দোলন। আমি এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ বাড়ীতে একটি কলেজ ছাত্রী ও দুটি উঁচু ক্লাসের স্কুল ছাত্রছাত্রী, এই তিন ভাই বোনের গৃহ শিক্ষক। দশ টাকা মাইনে ছিল এম. এ. পড়ার জন্য, সেটাও প্রতি মাসে দেওয়া সম্ভব হত না। ছাত্র ফেডারেশন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে, অতএব জাতীয়তাবাদী বনাম কমিউনিষ্ট সংঘর্ষ তীব্র। এ সংঘর্ষ অবশ্য আজকালকার মতন হাতাহাতি ঘুষোঘুষি বন্দুক-পিস্তলবাহীতে পরিণত হয়নি ; তর্ক-বিতর্ক, সভা-প্রতিসভা, মিছিল-প্রতিমিছিল, পোস্টার ও হ্যাণ্ডবিল বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরের জীবনে ভাবলে মস্তিষ্ক অবশ হয়ে আসতো যে নেতাদের প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করবার অধিকার বা প্রয়োজন পার্টি কর্মীদের ছিল না, আমার মতো যারা পার্টির সক্রিয় সমর্থক তাদের তো নয়ই। অনেক বছর পরে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা যখন স্বীকার করলেন যে সমগ্র চল্লিশ দশকে তাঁদের রাজনীতি ভুল পথে চলেছে, তখন ক্ষয়ক্ষতি হিসেব করার মতো সৎসাহস থাকলেও রাজনীতির প্রধান স্রোত থেকে কমিউনিষ্টদের যে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে সেজন্য খুব বড় রকমের দাম কাউকে দিতে হয় নি। পি. সি. যোশী পদত্যাগ করলেন। 'পিপলস ওয়ার' সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। "দৈনিক স্বাধীনতা" পত্রিকার তেজ ক্রমশ কমে এলো। কমিউনিষ্ট পার্টি হঠাৎ যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিভাগেরও প্রচণ্ড অথচ নিষ্ফল প্রতিরোধ ঘোষণা করল। তাতে ঘটনার অগ্রগতি ব্যাহত হল না।

বলেইতোছি, চল্লিশ দশক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, ঘটনাবহুল জীবন-কাঁপন দশক। ১৯৪০ সালে মুসলীম লীগ সোজাসুজি পাকিস্থান দাবী করে বসল, সে দাবী কমিউনিষ্টরা কিছুটা সমর্থন করল। তারপর ক্যাবিনেট মিশন। ক্যাবিনেট মিশনের মস্তিষ্ক থেকে একের পর এক ভারত সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা। তা নিয়ে, কংগ্রেস মুসলীম লীগ ও অন্যান্য দলগুলির নেতাদের দিবারাত্রি জল্পনা। তার

আগেই 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন, কংগ্রেসের মধ্যে জঙ্গীপন্থি সমাজবাদী নেতাদের আহ্বানে ভারতবাসীর মনে ইংরেজ খেদাও সংকল্পের কিছু দৃঢ়তা। তারপর আই এন. এ। আই. এন. এ. ছিল ভারত রঙ্গভূমিতে এক বিরাট অভিনীত নাটক। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আই. এন. এ-র কিছু সৈন্য মণিপুর রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু সেখানে ইংরেজ তাদের প্রতিরোধে সক্ষম হল। দু'বার কলকাতায় জাপানী বিমান দু-তিনটে বোমা নিক্ষেপ করে বর্মায় পলায়ন করল। কলকাতার অর্ধেক লোক পালিয়ে গেল গ্রামে গঞ্জে জিলা শহরে। তিন মাসের জন্য আমিও পালিয়েছিলাম ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের একটি গ্রামে, আমার কাকার পরিবারের সঙ্গে। যুদ্ধ বাধবার দুতিন বছরের মধ্যেই কাকামণির বাহওয়ালপুর কলেজের চাকরী চলে গিয়েছিল, তিনি কককাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিন মাস পরে কলকাতা শহরে ফিরে আসার ঘটনাটা আমার মনের পর্দায় এখনও পরিষ্কার। বেশিরভাগ রাস্তাঘাট জনশূন্য, মধ্য ও উত্তর কলকাতার অনেক বাড়ী খালি। ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংখ্যা কমে এক চতুর্থাংশে দাঁড়িয়েছে। তারপর একদিন ঘটল সেই মহা দুর্ঘটনা, প্রধানমন্ত্রী শহিদ সুরাবার্দির প্রতিশ্রুতি অনুসারে কলকাতায় ডাইরেক্টর অ্যাকশান। হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান একে অন্যকে পিটিয়ে মারল। মারল ছোরার আঘাতে, দিশী বন্দুকের গুলিতে। মানুষগুলি হঠাৎ হয়ে গেল সশস্ত্র হিংসায় প্রাণবন্ত পশু। মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এলেন দাঙ্গা থামাতে। শুরু করলেন আমরণ অনশন। এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের আলো নেমে এলো কলকাতার বুকে। দাঙ্গা গেল থেমে। শত শত মানুষ তাদের সঞ্চিত অস্ত্র বহন করে বেলেঘাটায় গান্ধীর অনশন ব্রতের আশ্রমে বিনা সর্তে সমর্পণ করল।

এসব ঘটনাগুলো স্মৃতি চারণের বস্তু নয়। এরা ভারত রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি। ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী হিসেবে ছোট ছোট দলের সঙ্গে দাঙ্গা-দগ্ধ কয়েকটি পল্লীতে 'জনসেবা'র জন্য গিয়েছিলাম। শান্তির বাণী ও শান্তির জল সঙ্গে করে, এখনও আমার মনে আছে মানুষের বীভৎস বিপন্ন চেহারা, তার চেয়ে ভয়ানক, তাদের মারমুখি মানসিকতা। সারা ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একটি মহামানুষ এই নিদারুণ বীভৎস ভূমিকম্পের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যেদিন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। তিনি, জাতির পিতা, রাজধানীর বহুবর্ণ জৌলুস থেকে অনেক দূরে বিহারের গ্রামে গ্রামে মানুষের বুকের লেলিহান আগুন নির্বাপনের চেষ্টায় ব্যস্ত। স্বাধীনতা তাঁকে আনন্দ দেয়নি,

দিয়েছে বেদনা। তিনি চাননি স্বাধীনতা আসুক এই ভয়াল রক্তাক্ত পথে। স্বাধীনতা তাঁর সারা জীবনের স্বপ্নকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমার স্থান দিল্লীতে নয়, এখানে এই বঙ্গে, বিহারে, যতদিন মানুষ মানুষকে মারবে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিল, ওখানে যে, অনেক উৎসব হচ্ছে! তিনি ব্যথা ভরা স্বরে জবাব দিয়েছিলেন, হতে দাও। ওখানে যা হচ্ছে তা হোক, ও সব আমার জন্যে নয়।

পরিণত বয়সে একই সঙ্গে আশ্চর্য ও লজ্জার সঙ্গে আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে চল্লিশ দশকের ঘোর রক্তিম প্রভঞ্জন বাঙ্গালীর সৃষ্টিশীল মানসিকতার উপরে খুব কমই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। বুদ্ধদেব বসু 'তিথিডোর' উপন্যাসে এক উগ্ররাজনীতিক মতবাদের বলিষ্ঠ স্বামীর সঙ্গে একটি সাধারণ দুর্বল বাঙ্গালী কন্যার বিবাহ ঘটিয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৪১ সালে লিখিত একটি গল্প-সংগ্রহে মহানগরীর প্রান্তশায়িনী নদীর অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন, এক মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি ও কুহেলীগুণ্ঠিত তুষার পরিবেশে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হল ১৯৪২ সালে, গান্ধীবাদে এমন ভাবপ্লাবন অন্য কোনো বাংলা উপন্যাসে তার আগে বা পরে দেখা যায়নি। 'উজ্জয়নী'কে কেউ কেউ ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনের উদ্যোক্তার ভূমিকায় দেখেছেন। কিন্তু ছ'খানা উপন্যাসের একখানাতেও ৩২ থেকে ৪২ এই দশ বছরের জটিল ও সাংঘাতিক ভারতীয় অভিজ্ঞতার ছায়া বিশেষ নেই। বাদল, উজ্জয়নী, সুধী দে সরকার, অশোকা সবাই কোনো এক প্রাচীন পথের পথিক, নতুন কোনো পথের জন্য দিকভ্রান্ত অন্বেষণ। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', মন্বন্তর': সবই চল্লিশ দশকের লেখা। এঁদের মধ্যে আছে অসহযোগ সংগ্রাম, সন্ত্রাসবাদ, জমিদারদের অবক্ষয়, চাষীর প্রথম সমবেত সংগ্রাম, কিছুটা তরল মার্কসবাদ। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় দেখতে পাই নিচু স্তরের মানুষ উচ্চবর্ণ হিন্দুদের প্রভাব ও নেতৃত্ব বিনা বিদ্বেষে, বিনা সংঘাতে মেনে নিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে প্রথম পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন "শহরতলী"—যশোদা বাংলা উপন্যাসের এক অতুলনীয় চরিত্র। 'উপনিবেশ' উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখিয়েছিলেন, দুঃসাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, বিপ্লবের সার্থকতার জন্য 'আরণ্যক হিংস্রতার সাহায্য অপরিহার্য।

কিন্তু পুরো চল্লিশ দশকের বাংলা উপন্যাস অথবা কাব্যে দেশবিভাগের আয়োজন,

কলকাতার চির-কুখ্যাত দাঙ্গা যে পথে এল স্বরাজ সে পথটাই আকাঙ্ক্ষিত ও ফলপ্রসূ হল কী না, হতে পারবে কি না, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। ভাবতে আমার বিস্ময় লাগে স্বাধীনতাকে বিষয়বস্তু করে উপন্যাস রচিত হয়নি, বঙ্গভাষায়। মনোজ বসু ছোট একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, 'ভুলি নাই'। বিষয়বস্তু ছিল কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন। এটা কী বিধাতার কঠোর পরিহাস নয় যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে প্রথম মর্মস্পর্শী উপন্যাস লিখলেন এক লণ্ডন প্রবাসী ভারত-পাকিস্থানী লেখক। তাঁর ভাষায়, আমরা সবাই মিডনাইট্স চিলড্রেন।

॥ আঠাশ ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে এম. এ. পড়বার প্রথম বছরে তিনটি ঘটনা আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে। প্রথম, ক্লাসে ক্লাসে ঢুকে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করে ছাত্র ফেডারেশনের সভা সমিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান। দ্বিতীয়, আমার জীবনের প্রথম প্রেম, যে কাহিনী বলব একটু পরে। তৃতীয়, চাকরীর সন্ধান।

চাকরীর জন্য অনেকের সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের তখনকার সুব্রতদা, পরে যিনি বিজ্ঞাপন জগতে সুব্রত সেনগুপ্ত নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, এ. আর. পি-র একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি ছিলেন। এ. আর. পি. মানে 'এয়ার রেড প্রিকশন'। অর্থাৎ শত্রু বিমান কলকাতার কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠবে বুক কাঁপানো সাইরেন এবং সবাই প্রাণ রক্ষার জন্য আশ্রয় নেবে একতলার সিঁড়ির নিচে, রাস্তায় বাফেলওয়াল ও ট্রেঞ্চে। সুব্রতদার কাছে চাকরীর জন্য হাজির হলে তিনি এক সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সাহেবের অফিসে আধঘণ্টা বসে থাকার পর মনে এমন ধিক্কার এলো যে আমি হনহন করে বেরিয়ে গেলাম। তখন দরখাস্ত করলেই মিলিটারী একাউণ্টসে কেরানীর চাকরী পাওয়া যেত। আমার দু-তিনটি সহপাঠী এই চাকরী পেয়েওছিল। আমিও দরখাস্ত করলাম, চাকরির নিয়োগপত্র এসে গেল। কিন্তু কেরানী হিসাবে জীবন শুরু করবো এই নিশ্চয়তা আমার এমন তিক্ত মনে হল যে আমি নিয়োগপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। মনে আছে এক সুখ্যাত ইংরেজ আই. সি. এস, আর্থার হিউজ-এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি যুদ্ধে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের ক্ষতিপূরণ ধার্য করার জন্য স্থাপিত একটা বড় অফিসের প্রধান। হিউজ সাহেব সুন্দর বাংলা বলতেন। আমার বক্তব্য শুনে ও পরীক্ষার রেজাল্টবাহী কাগজপত্র দেখে পরিষ্কার বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, "জীবন এমনি করে নষ্ট কোর না। চাকরী আমি এখুনি তোমাকে দিতে পারি; কিন্তু কেরানী হয়ে শুরু করলে কোথায় পৌঁছবে? বেশিরভাগ কেরানী হয়েই জীবন শেষ করে। তুমি এম. এ-টা পাশ করে নাও।"

এমন সময় একদিন মার্কাস গ্রে'র একখানা চিঠি হাতে এলো। লিখেছেন, "ইয়ান স্টীফেন্সকে তোমার কথা লিখেছি। তুমি তার সঙ্গে সত্বর দেখা কর।"

আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে স্টেটস্‌ম্যান হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড বাড়ীটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। হৃদকম্পের শব্দ নিজের কানে ধাক্কা মারতে লাগলো। মনে মনে ভাবলাম এ বাড়ীতে ঢুকে ষ্টিফেন্স সাহেবের সঙ্গে দেখা করে চাকরী সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বাবা-মা-ভাই-বোন তখন সবাই থাকে খুলনায়। আমিও গেলাম তাদের কাছে। সাত দিন থেকে মনটা ভীষণ বিগড়ে গেল। এতটুকু সাহস আমার নেই যে 'স্টেটস্‌ম্যানের' এডিটরের সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে পারি? বাবা বলেছিলেন, আই. সি. এস., বি. সি. এস, কম করে ভারত সরকারের অ্যাসিস্টেন্টের, পরীক্ষাটা দিয়ে দাও—এটাও খুব ভাল চাকরী।

ছোটবেলা থেকে ইংরেজ সরকারের চাকরী করব না, এক রকম প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলাম।

কলকাতায় ফিরে এলাম। 'স্টেটস্‌ম্যান' অফিসে যাওয়ার মতো আমার না আছে প্যাণ্ট, না শার্ট, না জুতো। স্কটিশে পড়ার সময় জীবনে সর্বপ্রথম যে দুটি প্যাণ্ট তৈরী করিয়েছিলাম বিবেকানন্দ রোড ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মোড়ে 'রায় অ্যাণ্ড রায়' দর্জির দোকানে, তার একটাও তখন পড়ার মতন নয়।

পিসতুতো ভাইয়ের কাছ থেকে প্যাণ্ট ধার করে নেওয়া হল। তিনি একটা শার্ট দিলেন। আমার খুড়তুতো ভাই বাদলের জুতো দেখা গেল পায়ে বেশ লেগে যায়।

এ'ভাবে বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে পাহাড় প্রমাণ সাহস সঞ্চয় করে 'স্টেটস্‌ম্যান হাউসের' দরজা পেরিয়ে কাঁচের ঘুর্ণি দরজার মধ্য দিয়ে একতলায় ঢুকে গেলাম। দেখলাম ডান ও বাঁ দু'দিকে তিন জন কাজ করে যাচ্ছে। একটু লক্ষ্য করে বোঝা গেল এরা খুচরো বিজ্ঞাপন নিচ্ছে। এদের মধ্যে একজন প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক, আমার মনে হল, উপরতলার সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যম।

আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোকের দীর্ঘ একজোড়া পাকা গোঁফ। মাথার চুলও সাদা। চোখে পুরু কাচের চশমা।

চশমাটা নাকের মাঝখানে। চশমার উপর দিয়ে দুটি চোখ আমার দিকে নিক্ষেপ করে তিনি বললেন, অবশ্যই ইংরেজীতে, "কি চাই তোমার?"

আমি বললাম, "আমি মিষ্টার ইয়ান ষ্টিফেন্সের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

ভদ্রলোকের চোখদুটি আমার আপাদমস্তক বার বার দেখে নিল। প্রশ্ন হল, "এপয়েন্টমেন্ট আছে?"

—"আজ্ঞে না।"

ভদ্রলোক তক্ষকের ডাকের মতো শব্দ করে হেসে উঠলেন। গুরুগম্ভীর স্বরে আমাকে বললেন, "স্টেটস্‌ম্যানে'র এডিটর এপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করেন না। আপনার সঙ্গে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।"

আমার তখন জিদ চেপে গেছে।

"স্টিফেন্স সাহেবের বন্ধু অধ্যাপক মার্কাস ডি. গ্রে আমাকে লিখেছেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। এই দেখুন চিঠি। হয় আমাকে উপরে যেতে দিন, নয় স্টিফেন্স সাহেবকে ফোন করে আমার এপয়েন্টমেন্ট পাইয়ে দিন।"

ভদ্রলোক আবার কিছুক্ষণ আমার আপাদমস্তক দেখে নিল।

একটা স্লিপ আমার হাতে দিয়ে বললেন, "নাম লিখুন আর সঙ্গে ওই প্রফেসর গ্রে'র চিঠিটাও গেঁথে দিন।"

দেওয়া হল। ভদ্রলোক আমাকে বসতে বললেন না। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। এক পেয়াদা আমার নাম ও অধ্যাপক গ্রে-র চিঠি নিয়ে উপরে চলে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে সে ফিরে এল। ভদ্রলোককে বলল, "সাহেব একে সেলাম দিয়েছেন।"

এতক্ষণে আমার ভদ্রলোকের নাম মনে পড়েছে। মনমোহনবাবু—এবার আমার দিকে বিস্ময় ও অসন্তোষের দৃষ্টি হানলেন, বললেন, "যান এর সঙ্গে।"

বেয়ারার পিছু পিছু আমি লিফট্‌-এ চড়ে দোতলায় উঠলাম। সে আমাকে একটা প্রকাণ্ড ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের চার দেওয়ালে বার্মাটীক কাঠের তৈরী শেল্‌ফ্‌-এর উপর কেবল বই আর বই। ঘরে দুটো সোফা সেট। দুটোরই মাঝখানে কাঁচের টেবিলের উপর দুই প্রকাণ্ড ফুলের স্তবক। কার্পেটে সারা মেঝে আবৃত। শুধু ঝকঝকে পরিষ্কার নয়, সমস্ত পরিবেশ নিস্তব্ধ। একপাশে এডিটরের কক্ষ। দরজার কাছাকাছি বসে আছেন এক ভদ্রলোক একটা প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে, যার কাছে বেয়ারা আমাকে হাজির করল।

ভদ্রলোক উঠে করমর্দন করলেন। বললেন, "আমার নাম রবার্ট মেডমেন্ট, আমি এডিটরের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট এবং 'স্টেটস্‌ম্যানে'র অ্যাসিস্টেন্ট এডিটর। মিস্টার স্টিফেন্স তোমার সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

আমি দেখতে পেলাম মেডমেন্টের দেহের বর্ণ তামাটে, উচ্চারণও ঠিক সাহেবদের মতো নয়। অনুমান ক'রে নিলাম ইনি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। বললাম, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে এসে হাজির হয়েছি। নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবো।"

এমন সময় পাশের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন দীর্ঘকায় এক পুরুষ। মাথার চুল বিরল হতে শুরু করেছে, দীর্ঘ নাক, লম্বা মুখখানার চোয়াল চওড়া। চিবুক একটা প্রাচীরের শেষাংশ। হাতে একগাদা প্রুফ। মেডমেন্টের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে প্রুফগুলো তাঁর টেবিলের উপর রাখলেন। তখন নজরে পড়ল অদূরে দণ্ডায়মান আমার উপর। বলে উঠলেন, "ও এই হচ্ছে সেই ছেলেটি, তুমি আমার ঘরে বস।"

এডিটরের ঘরও বেশ বড়সড়। সমস্ত ঘরে কাগজপত্র আকর্ষণীয় বিশৃঙ্খলার সঙ্গে ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি চেয়ারের উপর স্তূপাকার বই, একপাশে একটা টেবিলের উপর একরাশি পেপার ক্লিপিং, কালো মলাটে একই সাইজে বাঁধানো, প্রত্যেক খণ্ডের শিরদাঁড়ায় প্রত্যেক খণ্ডের নাম ও নির্ধারিত সময় লিখিত।

ইয়ান স্টিফেন্স কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রাইপস পেয়ে কিছুদিন ওখানকারই একটা কলেজে প্রথমে টিউটর পরে লেকচারার হয়েছিলেন। দৈর্ঘে ছ'ফুট দু'ইঞ্চি, কৃশ মজবুত শরীর। যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করল তা হল তার দুই ঘন গভীর নীল চোখ। আমি নীলা পাথর দেখেছি, কিন্তু এ যেন সাগরের গভীর জলের নীলটুকু পাথরে রূপান্তরিত! গভীর নীল চোখদুটি অতিশয় জীবন্ত। মুখের ভাষার চেয়ে চোখের ভাষা তরান্বিত ও স্বচ্ছ।

চল্লিশ দশকের প্রথমে ইয়ান স্টিফেন্স ভারত সরকারের প্রিন্সিপ্যাল ইনফরমেশন অফিসার হয়ে দিল্লীতে আসেন। পেশায়, অতএব তিনি সাংবাদিক ছিলেন না। যুদ্ধের শেষ দিকে দীর্ঘকালীন সম্পাদক আর্থার মূরের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতান্তর ঘটে পত্রিকার ভারতনীতি নিয়ে। আর্থার মূর চেয়েছিলেন ইংরেজ সরকার যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অঙ্গিকারে নিবদ্ধ হোন। কংগ্রেসেরও দাবী তাই ছিল। 'স্টেটসম্যানে'র কর্তৃপক্ষ আর্থার মূরের কংগ্রেসী গন্ধ পেতে লাগলেন ১৯৪৩ সাল থেকে। সে বছর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আশুতোষ হলে ছাত্র ও অধ্যাপকদের এক সভায় আর্থার মূরকে নিমন্ত্রণ করে 'মহাযুদ্ধ ও ভারতবর্ষ' বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনবার পরিকল্পনা হয়েছিল। আর্থার মূরকে নিমন্ত্রণ করতে যাবার দায়িত্ব পড়েছিল যে তিনটি ছেলের

উপর, আমি তাদের মধ্যে একজন। আমরা তাঁর সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবে দেখা করেছিলাম। কথাবার্তার বেশির ভাগটাই ছাত্রদের পক্ষ থেকে চালাতে হয়েছিল আমাকে। আর্থার মূর কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলেন, যার তাৎপর্য ছিল যুবকরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে কী ভাবছে। জবাবে কি বলেছিলাম মনে নেই, মনে আছে তিনি বেশ খুশি হয়েই বক্তৃতা করতে যেতে রাজী হয়েছিলেন।

সভা উপলক্ষ্যে 'আশুতোষ হল' জনাকীর্ণ। আর্থার মূর নিজেই চলে এসেছিলেন। ইউনিভার্সিটি গেটে আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলাম, মালা পড়িয়ে নয়, নমস্কার করে। জনাকীর্ণ আশুতোষ হল তাঁকে খুব খুশি করেছিল। সভার কাছে আর্থার মূরের পরিচয় দেবার ভারও পড়েছিল আমার উপর। তিনি তাঁর বক্তৃতা শুধু লিখে নয়, ছাপিয়ে এনেছিলেন। তার কয়েক'শ কপি সভায় উপস্থিত লোকেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। সেই বক্তৃতার কয়েকটা অংশে আর্থার মূর পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন, মিত্র শক্তির আটলান্টিক চার্টার এবং ফোর ফ্রিডমস্—অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসন হতে ক্ষুধা অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্য থেকে মুক্তি যদি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হয় তাহলে ইতিহাসে হয়ে দাঁড়াবে কয়েকটি ফাঁকা আওয়াজ। উচ্ছ্বসিত করতালির মধ্যে আর্থার মূরের বক্তৃতা শেষ হয়েছিল।

ফিরে যাবার সময় তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন "আমি আর বেশিদিন 'স্টেটস্‌ম্যানে'র এডিটর থাকবো না। তোমার যদি জার্নালিজম করার ইচ্ছা থাকে তুমি নতুন এডিটর ইয়ান স্টিফেন্সের সঙ্গে দেখা করো।"

ইয়ান স্টিফেন্স খুব তাড়াতাড়ি কথা বলেন, ফলে আমার পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয়। তবু বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে বলছেন, "মার্কাস গ্রে'র চিঠি এসেছে প্রায় দশদিন হল। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?"

—"খুলনা শহরে পালিয়ে গিয়েছিলাম। ওখানে আমার বাবা মা ভাই বোন বাস করেন।"

—"পালিয়ে গিয়েছিলে কেন?"

—"ভয়ে। আপনার সঙ্গে দেখা করার সাহস হচ্ছিল না।"

হেসে উঠলেন ইয়ান স্টিফেন্স। বললেন, "এখনও ভয় করছে?"

—"না।"

—"তাহলে তুমি কিছুক্ষণ ওই কোণের চেয়ারটায় বস। আমার হাতে কিছু

জরুরী কাজের চাপ আছে। এগুলো শেষ করে তোমার সঙ্গে কথা বলব। ওখানে আজকের পত্রিকাগুলো সবই আছে। যেটা ইচ্ছা পড়তে পারো।"

প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল জরুরী কাজ থেকে মুক্তি পেতে ইয়ান ষ্টিফেন্সের। এর মধ্যে তিন-চারবার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। ছু'বার তাঁর সেক্রেটারী মিস কেলীকে ডেকে ডিকটেশন দিয়েছেন। অন্তত পাঁচ-ছ' জন লোক তাঁর ঘরে ঢুকে সংক্ষিপ্ত বাক্য বিনিময়ে কাজের নির্দেশ নিয়ে প্রস্থান করেছেন। তিনবার টেলিফোনে কথা বলতে হয়েছে তাঁকে।

আবার মণিবন্ধে কাকামণির ঘড়ি। তার উপর আমার সজাগ দৃষ্টি। ঠিক আধঘণ্টা পর ষ্টিফেন্স আমাকে বললেন, "এস, আমার সামনে বস। এবার আমরা কথা বলি।"

সামনাসামনি বসতে তিনি বললেন, "মার্কাস গ্রে আমার সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু। টমোড়ী হোস্টেলে তার বাড়ীতে আমি অনেকবার গেছি। তোমার মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে, ছু'বার অধ্যাপক গ্রে'র বাড়ীতে আমি তোমাকে দেখেছি।"

—"অধ্যাপক গ্রে আমাকে খুব স্নেহ করেন।"

—"শুধু তাই নয়, তোমার খুব প্রশংসাও করেন। কিন্তু তাঁর পত্রে তিনি লিখেছেন যে তুমি কমিউনিষ্ট। তুমি কতখানি কমিউনিষ্ট?"

—"আমি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য নই। ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আমি নিজেকে কমিউনিষ্ট বলি না। বরং মার্কশিষ্ট বলি।"

—"ছুটোতে তফাৎ কি?"

—"কমিউনিষ্টরা বিপ্লবী সংগ্রামে সংযুক্ত। আমি তা নই। আমার মধ্যে বিদ্রোহ নেই। প্রতিবাদ আছে। মার্কশিস্ট মানে সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষণ করার একটা নির্ভরযোগ্য পথ।"

—"ষ্টেটস্‌ম্যান কমিউনিষ্টদের পছন্দ করে না। কিন্তু এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন মিত্রশক্তিদের অন্যতম। আমাদের মধ্যে বর্তমানে কোনো ঝগড়া নেই। তোমার মার্কশিজম্ বা কমিউনিজম আমার কাছে বর্তমানে আপত্তিকর কিছু নয়। এখন বল আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?"

আমি খুব সংক্ষেপে নিজের অবস্থার বর্ণনা করলাম। বললাম, "এখন পরীক্ষাটা শেষ করার খুব ইচ্ছে। আমি কি 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' বুক রিভিউ বা ছোটখাটো কিছু লিখতে পারি? তাহলে আমার পড়ার খরচটা এসে যায়।"

ষ্টিফেন্স বললেন, "দুটোর একটাও সম্ভব নয়। যুদ্ধ পত্রিকার সাইজকে কি রকম ছোট করে দিয়েছে তা তো তুমি জান। বুক রিভিউ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। দিল্লী ও কলকাতা অফিসের স্টাফদের লেখার জায়গা দিতে পারছি না।

আমার মুখে নৈরাশ্যের কালো মেঘ দেখে ইয়ান ষ্টিফেন্স বললেন, "স্টেটস্‌ম্যানে লেখবার সুযোগ নেই। কিন্তু চাকরী হতে পারে। হোয়াট এবাউট এ জব হিয়ার?"

এবার আমার বাক্যহীনতা একেবারে অন্যকারণে।

একটু পরে বললাম, "অতটা আশা করার মতো সাহস আমার একেবারে ছিল না।"

—"এখুনি কিছু হবে না। তবে দু-তিন মাসে আমরা একজন সাব এডিটর নিতে পারি। অন্য কিছু সম্ভাবনাও ঘটতে পারে। তুমি মিষ্টার মেডমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। আর এখন তুমি দেখা করবে আমাদের নিউজ এডিটর অ্যালেক রীডের সঙ্গে।"

আমি ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ষ্টিফেন্স নিজেই আমাকে মেডমেণ্টের টেবিল পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। যাবার আগে বললেন, "আর একজন লোক তোমার কথা আমাকে বলেছেন।"

আমি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতে তিনি বললেন, "শুনে একটু অবাক হবে—তার নাম আর্থার মূর।"

মেডমেণ্টের কাছে আমাকে নিয়ে এসে ষ্টিফেন্স বললেন, "এই ছেলেটি তোমার সঙ্গে সংযোগ রাখবে। এখন ওকে রীডের কাছে পাঠিয়ে দাও।"

অ্যালেক রীড স্কটল্যাণ্ডের মানুষ। বিরাট চেহারা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কথা বলেন। শাসক ইংরেজ সমাজে তিনি ঘোরতর অপরাধ করেছিলেন এলা সেন'কে বিবাহ করে। এলা সেন পাণ্ডিত্য ও সুরুচির জন্য সারা দেশে সুপরিচিত। শুনেছি দু'চারজন ঘনিষ্ট বন্ধু ছাড়া সাহেবরা বিবাহে যোগ দেননি। রীড সাহেব শ্বশুরবাড়ী ভারতবর্ষের উপর অনুচিতভাবে আকৃষ্ট। শাসক সমাজে তাঁর জন্য চেয়ার পাতা নেই।

একজন পেয়াদা আমাকে রীড সাহেবের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘোঁৎ ঘোঁৎ স্কটিশ উচ্চারণ বুঝে নিতে আমার তো বিশেষ বিপদ। রীড সাহেব প্রশ্ন করলেন, "তুমি কী ধরণের কাজে উপযুক্ত?"

আমি বললাম, "সব কাজেরই। কেননা কোন কাজই আমি এখনও করিনি।"

মুখের বিকৃতি দেখে মনে হল রীড সাহেব হাসলেন।

—"কত মাইনে আশা কর ?"

এবার আমি সত্যিকারের বিপদে পড়লাম। দেখলাম গলা শুকিয়ে গেছে, তবু সাহসে বুক বেঁধে বললাম, "ষাট টাকা।"

এবার রীড সাহেব ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হেসে উঠলেন। বললেন, "স্টেটস্‌ম্যানে দেড়শ' টাকার কমে মাইনা হয় না। উইল ছাট বী টু লিট্‌ল ফর ইউ ?"

—"নো স্যার, বাট ইট উইল নট বী টু মাচ ফর মী।"

রীড সাহেব বললেন, "আমার প্ল্যান আছে একটি রেফারেন্স সেকশন খোলার। তুমি তার দায়িত্ব নিতে পারবে ?"

—"পারব।"

—"এখনও প্ল্যান ফাইনাল হয়নি। মাসখানেকের মধ্যে তুমি জানতে পারবে।"

এই এক মাসের মধ্যেই অনেক কিছু পারিবারিক পরিবর্তন হয়েছে। কাকামণি পুনরায় চাকরী পেয়ে পাঞ্জাব চলে গেছেন। আমি বাস করছি পিসিমার সঙ্গে। একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরতে পিসিমা আমার পিঠে হাত দিয়ে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যা বললেন তার মানে হল জীবনে অনেক ব্যর্থতা আসে, তাতে ঘাবড়াতে নেই।

এবার আসল খবরটা ভাঙলেন। রীড সাহেব দুঃখ জানিয়ে একটি ছোট চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটি আমি পড়লাম। "আমাদের রেফারেন্স সেকশন খোলাবার প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়েছে। সুতরাং এখানে তোমার চাকরীর সম্ভাবনা নেই। আমি বিশেষ দুঃখিত।"

দু'দিন পরে আমি সোজা মেডমেন্টের অফিসে গিয়ে হাজির। তিনি বললেন, "তোমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এডিটর তোমার সম্বন্ধে বেশ খুশি। একটা কিছু হয়ে যাবে।" একটু থেমে বললেন, "আসলে হয়েই যেত। একটা সাব-এডিটর পদ খালি ছিল, কিন্তু দিল্লী থেকে একজন নিয়োগ করতে হল।"

আমি বললাম, "আমার সহনশীলতার বাকী নেই। আমি আপনাদের এই বিরাট অফিসে যে কোনো পদে, যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, শুরু করতে রাজী। শুধু আমার জন্য উপরে ওঠার দরজা যদি খোলা থাকে।"

জীবনে কীসে কী হয়ে যায়। কোন্ কথা কি ভাবে কার মনে কী প্রতিধ্বনি তোলে, এ প্রশ্নের শেষ নেই। মেডমেন্ট সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, "ইয়ংম্যান, পচিশ বছর আগে ঠিক এই কথা বলেই আমি এই অফিসে কাজ পেয়েছিলাম।

পঁচিশ বছর পর তোমার মুখে শুনতে পেলাম সেই কথা। তুমি প্রুফ রিডার হিসেবে ঢুকতে রাজী আছো?"

—"আছি।"

মেডমেন্ট সাহেব আলেক রীডকে ফোন করলেন। আমাকে বললেন, "গো অ্যাণ্ড সী মিষ্টার রীড।"

আমি রীড সাহেবের ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে বললেন, "কাছে এসে এই চেয়ারটায় বস।" বসলে বললেন, "আমাদের এখুনি একজন প্রুফ রীডার চাই। তুমি প্রুফ রিডিং জানো?"

—"না। কিন্তু চিহ্নগুলি জানা আছে। খুব বেশি হলে তিন-চার দিন সময় লাগবে।"

—"বেশ, কাল থেকে জয়েন কর। নাইট ডিউটি। রাত্রি ন'টা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত। তোমাকে নিজেই আসতে হবে। অফিসের গাড়ী তোমাকে বাড়ী পৌছে দেবে।"

আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

রীড সাহেব বললেন, "কত মাইনে পাবে তা তো জিজ্ঞেস করলে না?"

—"আপনি বলেছিলেন এ-অপিসে দেড়শ' টাকার নিচে কোনো মাইনে শুরু হয় না। মাইনে ঠিক করবেন আপনি। আমি কাজটা তো ভাল করে শিখি।"

রীড সাহেব বললেন, "তোমার স্টার্টিং স্যালারি একশ পঁচাত্তর টাকা। এক বছরের প্রবেশন। এক বছর ভাল কাজ করলে সাব-এডিটর হবার সম্ভাবনা। স্টেটসম্যান থেকে সস্তায় রেশন ও ধুতি কাপড় দেওয়া হয়। এখন তুমি আসতে পারো।"

শুরু হল আমার কর্মজীবন। সাংবাদিকতা। তিন মাস প্রুফ রিডিং চলল। এবং তারই মধ্যে বুঝতে পারলাম অন্তত নিউজ রুমে ভারতীয়দের সম্মান নেই। তিন মাস যেদিন শেষ হবে সেদিন সকালে স্টেটসম্যানের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় রকমের ভুল চোখে পড়ল, যার দায়িত্ব আমার। সারাদিন কাটল ভয়ে ভয়ে, দুশ্চিন্তায়। রাত্রে অফিসে এসে সোজা প্রুফ রীডারদের ঘরে ঢুকে আমার টেবিলের উপর রাখা প্রুফ পড়তে শুরু করলাম।

রীড সাহেব ঠিক রাত ন'টায় দ্বিতীয়বার অফিসে আসতেন, থাকতেন এগারোটা কি বারোটা পর্যন্ত। বেশ খানিকটা মদ্যপান করে আসতেন। বড়সড় কুমড়োর মতো মুখখানা ভীষণ থমথমে ও রক্তবর্ণ দেখাতো। কথা বলতেন খুব কম।

বেয়ারা এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "রীড সাহেব সেলাম দিয়েছেন।'

আমার বুক ভীষণ কেঁপে উঠল। নির্ঘাত চাকরী থাকবে না। প্রবেশন বছরের মাত্র এক-চতুর্থাংশ কাটানো গেছে। এবার আবার রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

রীড সাহেবের ঘরের দরজায় মৃদু আঘাত করলাম। ভিতর থেকে যেন হুঙ্কার এলো, "কাম ইন।"

আমি ভিতরে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতে তিনি বললেন, "আজ তো শনিবার, না? তুমি কাল ছুটি নাও, পরশু থেকে তুমি সাব-এডিটর।"

আমার নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না, বিহ্বল হয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রীড ভাবলেন, তাঁর কথা বুঝতে পারিনি। পুনরায় একটু আস্তে আস্তে সেই কথাগুলি বললেন।

এতক্ষণে আমার মুখে কথা এলো। আমি বললাম, "আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

রীড বললেন, "ধন্যবাদ দিও তিন মাস পরে। তোমার তিন মাসের প্রবেশন। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি তোমার মাইনে হবে 'আড়াইশ' টাকা।"

॥ ঊনত্রিশ ॥

বলা হয়ে থাকে ইতিহাস তৈরী করে ঐতিহাসিকরা। অতীতকে পুর্নগঠন করে সাজিয়ে গুছিয়ে তাকে জনসাধারণের কাছে পরিবেশন ঐতিহাসিকদের কাজ। ইংরেজের একশ' বছর ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গঠন এবং দুশো বছর সাম্রাজ্যবাদী শাসন, এই তিনশো বছর নিয়ে অনেক ইংরেজ ইতিহাস লিখেছেন। তাদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে বিখ্যাত ভিনসেণ্ট স্মিথ ও পরসিভ্যাল স্পিয়ার। স্মিথের তৈরী 'দি অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া' প্রথম প্রকাশ ১৯১৯ সালে। তৃতীয় সংস্করণ পরসিভ্যাল স্পিয়ার কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫৮ সালে। প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। সেই থেকে গত বিশ বছরে এই পুস্তকটির এগারোটি সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

বঙ্গে যে মহা দুর্ভিক্ষ ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল, সেই দুর্ভিক্ষের কারণ এই পুস্তকে একটি প্যারাগ্রাফে সেরে দেওয়া হয়েছে। কারণ দেখানো হয়েছে বর্মার পতন, রেলপথে সৈন্য চলাচলের বাধ্যতামূলক প্রাধান্য, ভারতবর্ষের ধান্য শস্যের ভীষণ ঘাটতি এবং চোরা-কারবারীদের মানুষের দুঃখ ভাঙিয়ে মুনাফা তোলা। এই দুই সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে চালের কমতি ছিল কেবল মাত্র পাঁচ শতাংশ কিন্তু প্রশাসনের বণ্টন ও কণ্ট্রোল ব্যাপক কালোবাজার তৈরী করেছিল এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই ইতিহাস পুস্তকে স্বীকার করা হয়েছে যে ১৯৪২-৪৩ সালে বঙ্গ থেকে চাল একেবারে উধাও এবং সমস্যার মোকাবিলায় বঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা। এখন ভাবতে হাস্যকর মনে হয় যে স্মিথ ও স্পিয়ার দুজনেই লিখেছিলেন, এই ব্যর্থতার জন্য তৎকালীন দিল্লীস্থ ইংরেজ প্রশাসনের 'প্রাদেশিক অটোনমিকে অতিরিক্ত প্রশ্রয়' দেওয়াটা অন্যতম কারণ। ১৯৪৩ সালে অক্টোবর মাসে লর্ড ওয়াভেলের আবির্ভাব অবস্থাকে শাসনে নিয়ে আসে। ইংরেজ সৈন্যদের উপরে দুর্ভিক্ষে জীর্ণ শীর্ণ মানুষদের ত্রাণের দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হয়। দুজন ঐতিহাসিকই লিখেছেন, "ব্রিটিশ সৈনেরা ভারতবর্ষে এর আগে কখনও এত জনপ্রিয় হতে পারেনি।"

স্টেটস্‌ম্যান অফিসে চাকরী করে বুঝতে পারলাম এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ও আমার ঐতিহাসিক দৃষ্টি একেবারে আলাদা। '৪২ মন্বন্তর ইংরেজের ভারত শাসনের ইতিহাসে

বিংশ-শতাব্দীর সবচেয়ে কলঙ্কময় অধ্যায়। ' ৪২-৪৩ সালে কলকাতার রাস্তায় ক্ষুধার যন্ত্রণায় অর্ধমৃত ও মৃতের সংখ্যা প্রত্যেক পথচারীকে আতঙ্কিত ও স্তম্ভিত করত। "ফ্যান দাও", "ফ্যান দাও" আর্তনাদে প্রতিদিন প্রতি গৃহস্থের কান ও মনকে বিদ্ধ করত। অথচ এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহারে মৃত্যু এবং তার চেয়েও অনেক বেশি লোকের মৃত্যুর দিকে অবধারিত দৈনন্দিন পদক্ষেপ, এটা কোনো 'সংবাদ' ছিল না। ভারতবর্ষে বা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে সংবাদপত্রে এই 'খবর' ছাপা হতে পারেনি। ইংরেজ আমলে 'ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট' সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে ইতিহাসের অন্যতম সবচেয়ে কুখ্যাত 'মানুষে তৈরী দুর্ভিক্ষকে' সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল। কেবল মাত্র রেঙ্গুন থেকে প্রচারিত আই. এন. এ বেতারে কিছু কিছু খবর ঘোষিত হোত। কিন্তু বেতার শোনা ছিল ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে প্রজাদের পক্ষে বেআইনী। ধরা পড়লে জেল।

এই সময় স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক ইয়ান স্টিফেন্স দুর্দান্ত সাহসের পরিচয় দিলেন। সারা কলকাতার মানুষ, ও সারা ভারতবর্ষের মানুষও প্রথম এক পৃষ্ঠায় দুর্ভিক্ষের খবর পেল। স্টেটস্‌ম্যানের একদিনের সংখ্যায় একপৃষ্ঠা ভরে দুর্ভিক্ষে মৃত ও মৃতপ্রায় মানুষদের ছবি ছাপানো হল।

এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য স্টিফেন্স গভর্ণিং বডি অথবা তার ইংরেজ সহকর্মীদের অনুমতি নেননি। তখন চারজন ইংরেজ সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন। বৃদ্ধ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বিখ্যাত কবির পৌত্র। তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে স্টেটস্‌ম্যানে ঢুকেছিলেন। সিনিয়র এডিটর হিসেবে। অতিশয় অন্যমনস্ক ছিলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। অফিসের কাছাকাছি চৌরঙ্গিতে একা বাস করতেন। অফিসের শেষে গাড়ী প্রস্তুত থাকতো তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্য। অনেক সময় গাড়ী তার নজরে পড়ত না, হেঁটেই চলে যেতেন বাড়ী, পিছু পিছু মন্থর গতিতে চলন্ত গাড়ী। মাসের প্রথম দিনে মাইনের চেক হাতে নিয়ে বাড়ী যাবার পথে অন্যমনস্ক হয়ে দুমড়ে মুচড়ে এক সময় দৃষ্টি পথে আগত ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। তাঁর সেক্রেটারী পুস্তক আকীর্ণ, পত্র-পত্রিকায় জঞ্জালাকীর্ণ অফিসঘর সাফ করতে গিয়ে প্রায়ই বেশ কতকগুলো চেক পেতেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ লণ্ডন টাইমস্‌-এর সংবাদদাতাও ছিলেন।

তারপর ছিলেন জনসন সাহেব। ইনি স্টিফেন্সের পরে এডিটর হয়েছিলেন। এঁরা দুজনেই ছিলেন কট্টর গোড়া পন্থী। স্টিফেন্সের অক্ষমনীয় অপরাধে অতিশয় ক্রুদ্ধ ও

উত্তেজিত। সংবেদনশীল ও সমর্থক ছিলেন একমাত্র অ্যালেক রীড। কিন্তু আগেই বলেছি ইংরেজ সমাজে তাঁর পাত্তা ছিল না। চতুর্থ ইংরেজ একেবারেই উল্লেখযোগ্য নন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবিম্ব প্রতিনিধি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ক্যাপিটাল'। তার সম্পাদক টাইসন সাহেব।

স্টেটস্‌ম্যানে দুর্ভিক্ষের খবর অনেক ছবির সঙ্গে প্রকাশিত হবার পরের দিনই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। আমি দেখতে পেলাম আপিসে যারা সব থেকে বেশি ক্ষেপে আগুন, তারা নিউজ রুমের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাব এডিটর গোষ্ঠি। এরাই প্রতিদিন সংবাদ সাজিয়ে গুছিয়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করতো। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ভাষা সাধারণত কদর্য। তাদের ব্যবহৃত শব্দগুলো সর্বদা নিউজ রুমের সামান্য ক'জন ভারতীয় সাব এডিটরকে বিদ্ধ করত। এখন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের গালিগালাজের লক্ষ্য হয়ে উঠলেন ইয়ান স্টিফেন্স। গুজব রটে গেল স্টিফেন্সকে গ্রেপ্তার করা হবে ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুল্‌সে।

ঠিক এই সময় আমি স্টিফেন্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাজকর্মের কিছুটা সুযোগ পেয়েছিলাম। একজন ভারতীয় সহকারী সম্পাদক প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সারাংশ সাজিয়ে গুছিয়ে স্টিফেন্সকে পাঠাতেন। ইনি তিন মাসের জন্য ছুটিতে গেলে এই দায়িত্বটা পড়েছিল আমার উপরে। স্টিফেন্স ছিলেন অবিবাহিত। গুজব ছিল তিনি হোমোসেক্স্যুয়াল। একটি অতি সুপুরুষ পাঠান যুবক ছিল তাঁর "ম্যান ফ্রাইডে"। সবকিছু কাজ সে-ই করত। একদিন স্টিফেন্স আমাকে একসঙ্গে পাঁচশ টাকা দিয়ে বললেন, "আব্দুল একটা ঘড়ি চাইছে। তুমি আর্মি নেভি স্টোর থেকে একটা ভাল ঘড়ি ওকে কিনে দাও।" আর্মি নেভি কেন, কলকাতার কোনো বড় দোকানেই ঢুকতে আমার বুক কাঁপত, পা সরত না। তবু যেতে হল এবং যে বস্তুটির আমি কিছুই জানি না, আব্দুলের পছন্দমতো তাই কিনে দিতে হল।

ইয়ান স্টিফেন্স পাকিস্তানকে বিষয় করে একটি সুদীর্ঘ ও সুলিখিত পুস্তক লিখেছিলেন। তাতে বিশেষ করে পাঠানদের সৌন্দর্য বারবার ফুটে উঠেছিল। পাঠান মানে পুরুষ পাঠান। অনেকে এই পুরুষ পাঠানের সৌন্দর্যপ্রীতি স্টিফেন্স সাহেবের হোমোসেক্স্যুয়ালিটির প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করতেন।

১৯৪৩ সালে লর্ড ওয়াভেল একদিন কলকাতায় কয়েক ঘণ্টার জন্য থেমেছিলেন বর্মা সীমান্ত থেকে দিল্লী ফেরার পথে। আব্দুল, ইয়ান স্টিফেন্সের চুল কাটছিল।

টেলিফোন এলো লাট সাহেবের বাড়ী থেকে, বড়লাট ষ্টিফেন্সের সঙ্গে দেখা করতে চান।

ষ্টিফেন্সের তখন মাথার চুলের একপাশ কাটা হয়েছে। সেই অবস্থাতেই তিনি চলে গেলেন লর্ড ওয়াভেলের সকাশে। ওয়াভেলের ঘরে যখন ডাক পড়ল, করমর্দনের সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট নাসিকা কুঞ্চিত করে ষ্টিফেন্সের মস্তক দেখতে লাগলেন।

ষ্টিফেন্স বললেন, "আমি চুল কাটছিলাম, আপনার ডাক পেয়ে আধা চুল কাটা অবস্থায় চলে এসেছি। আমি জানি আপনার সময় কত মূল্যবান।"

দুজনের মধ্যে কথাবার্তার কোনো উল্লেখ নেই গত কয়েক বছরে প্রকাশিত ইংরেজ রাজত্বের শেষ অধ্যায় নিয়ে বহু নথিপত্রের কোথাও। অফিসের গুজব কারখানায় তৈরী সংবাদে জানতে পারলাম ওয়াভেল ষ্টিফেন্সকে শুধু তিরস্কারই করেন নি, দেশ-দ্রোহিতারও অভিযোগ করেছেন। উত্তরে ষ্টিফেন্স বলেছেন, "আমি এক্ষুনি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার পদত্যাগ ভারতে না হলেও ইংল্যাণ্ডে অবশ্য প্রকাশিত হবে। ছড়িয়ে পড়বে সারা দুনিয়ায়।"

এই ঘটনার এক বছর পরে ষ্টিফেন্স স্টেটস্‌ম্যান থেকে পদত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ভারতবর্ষ নিয়ে তাঁর ভূমিকা এখানেই শেষ। বিলেতে বসে আরও দুখানা পুস্তক লিখেছিলেন। একখানাও বিশেষ সারা জাগাতে পারেনি।

আমার পক্ষেও স্টেটস্‌ম্যানে কাজ করা অসম্ভব হয়ে আসছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ইংরেজের তিনশ বছরের প্রাচীরকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারছে। সারা দুনিয়ার কাছে পরিষ্কার, ইংরেজের কাছেও, সে যুদ্ধজয়ের পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তাকত গেছে শেষ হয়ে। সাম্রাজ্যের ভার বহন করার মতো শক্তি তার নেই। যদিও উইনস্টন চার্চিল ঘোষণা করেছেন, "সম্রাটের সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির পৌরোহিত্য করতে আমি প্রধানমন্ত্রী হইনি," তথাপি তাঁকে পাঠাতে হয়েছে ক্রীপস মিশন। ১৯৪৫ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে লেবার পার্টি সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেছে, "ইংরেজ ভারত থেকে বিদায় নেবে।" এই সময় 'স্টেটস্‌ম্যানে'র নিউজ রুমে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেবদের মুখে খিস্তি সহ্য করে চাকরীতে বহাল থাকা আমার পক্ষ অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গার সময়, মহাত্মা গান্ধী যখন আমৃত্যু অনশনেব্রতী, তখন একদিন দেখলাম 'এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় ছাপা-ঘর থেকে মুদ্রিত হয়ে আমাদের কাছে এসেছে সযত্নে রক্ষা করে উপযুক্ত সময়ে ব্যবহারের জন্য। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের

প্রথম লাইনটি আমার এখনও মনে আছে. "মিষ্টার গান্ধী হ্যাজ বীন এ গ্রেট ম্যান অন্ সেভারেল অকেসান্স।" সমস্ত প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা ও স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নৈরাশ্য। প্রবন্ধটি অবশ্যই মুদ্রিত হতে পারেনি কারণ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মৃত্যুবরণ করে 'স্টেটস্ম্যানে'র সম্পাদককে বাধিত করেননি।

আমি সংকল্প করলাম এখানে কাজ আর নয়। কিন্তু যাবো কোথায়? অমৃতবাজার পত্রিকায় আবেদন করে স্থান হল না। তখন অধুনা প্রায় বিস্মিত কিন্তু আমাদের যৌবনে বিখ্যাত, রামারাও জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক স্থাপিত ন্যাশনাল হেরল্ডের সম্পাদক ছিলেন। আমার সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল না। তথাপি আমার বেদনা, দ্বিধা সংশয় ও সংকল্পের কথা বিস্তারিত জ্ঞাপন করে তাঁকে চিঠি লিখলাম।

দিন দশেকের মধ্যে জবাব এলো। রামারাও লিখেছেন, "নাগপুর টাইমস্ নামক একটি দৈনিক পত্রিকা আছে যার মালিক পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল, যিনি কয়েক মাসের মধ্যেই সি. পি. ও বেরার প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। পত্রিকাটির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। শুক্লাজী নতুন সম্পাদকের খোঁজে আছেন। আমি তাঁকে তোমার কথা লিখেছি। যদি একটি ছোট দৈনিক কাগজ নিয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাও তাহলে শুক্লাজীর কাছে চিঠি লেখ এবং রায়পুরে গিয়ে দেখা কর।"

পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লাকে চিঠি লেখার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে জবাব এলো। আমি 'ব্রেক্ফ লিভ' নিয়ে রায়পুরে চলে গেলাম। অর্থাৎ অফিস থেকে ছুটি নিতে হল না। সকালে হাওড়া স্টেশনে বম্বে এক্সপ্রেস-এ চেপে বিকেল চারটেয় রায়পুর এবং সন্ধ্যের সময় আর একটা ট্রেনে চড়ে সকাল হতে না হতে কলকাতা।

এক ভদ্রলোক স্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিলেন। পরিচয় হল ইনি শুক্লাজীর প্রথম পুত্র অম্বিকাচরণ। একটা পুরোনো গাড়ী চেপে আমি রবিশঙ্কর শুক্লার বাড়ীতে হাজির। তিনি তাঁর বৈঠকখানায় দরবার করছিলেন। জানতেন, আমি মাত্র কয়েকঘন্টার জন্য রায়পুর থাকব। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার পিঠে হাত দিয়ে স্বাগত জানালেন। সুদীর্ঘ গৌরবর্ণ চেহারা, দেহে মাংসের বাহুল্য নেই। সবচেয়ে বড় নজরে পড়ে তুলোর মতো সাদা বিরাট একজোড়া গোঁফ।

বললেন, "আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন, একটু সামান্য আহার করুন, আমি পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।"

কথা বলার জন্য তাঁর বৈঠকখানায় ঢুকলাম। চেয়ার টেবিল কিছুই নেই। আছে

শুধু বিরাট এক চৌকি, তার উপর তোষক এবং সাদা ধবধবে চাদর, কয়েকটি তাকিয়া। রবিশঙ্কর শুক্লা তাঁর পত্রিকার কথা বলতে একেবারেই স্ফীত-বাক্য হলেন না।

—"দৈনিক কাগজ। ছ'হাজার কপি ছাপা হয়, হাজার তিনেক বিক্রি। বিজ্ঞাপন থেকে আয় নেই। সব খরচই আমাকে মেটাতে হয়। আমার দ্বিতীয় পুত্র কাগজের ম্যানেজিং এডিটর। সে কিছু দেখে না। ভগবতীচরণের দেখবার যোগ্যতাও নেই। তোমাকেই সবকিছু দেখতে হবে। পারবে?"

—"পারব মনে করেই তো এসেছি।"

—"তুমি স্টেটস্‌ম্যান ছাড়ছ কেন?"

আমার মুখে সব কথা শুনে বললেন, "খুব ভাল একটা চাকড়ী ছেড়ে ছোট একটা অজানা অচেনা পত্রিকায় আসছ? তোমার সাহস আছে। এই প্রদেশে হিন্দী ও মারাঠী সহবাস করে। আমার এতদিনের সম্পাদক ছিলেন জনৈক মারাঠী। রাজনীতির জন্য এমন একজন সম্পাদক চাই যে হিন্দীও নয় মারাঠীও নয়, অর্থাৎ দলীয় রাজনীতিতে বাধা পড়বে না। এজন্যেই আমি রামারাওকে লিখেছিলাম। তিনি তোমাকে সুপারিশ করেছেন, তাঁর কাছে লেখা তোমার চিঠিও আমাকে পাঠিয়েছেন।"

একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, "তোমার বয়স কত?"

—"চব্বিশ।"

—"তুমি তো ছেলেমানুষ। কাগজ ছোট হলেও এটা হবে প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাগজ, দায়িত্বটা বেশ ভারি। এত অল্প বয়সে তুমি পারবে?"

—"আমার বয়সটা কী আমার বিরুদ্ধে যাবে? একবার পরখ করেই দেখুন না।"

মাইনে পত্র, বাৎসরিক বৃদ্ধি সব ঠিক হয়ে গেল। পাঁচশ টাকা মাসিক বেতন, পঞ্চাশ টাকা বাৎসরিক বৃদ্ধি, বিনা ভাড়ায় একটি বাংলো, ভাল পাড়ায়।

॥ ত্রিশ ॥

পুত্র, পিতাকে মানুষ হিসাবে জানতে হলে তার জীবনের যে সব ঘটনার উপর সামাজিক, ন্যায়-অন্যায়, নীতি ও সাংস্কারিক নিষেধের পর্দা ঝোলানো থাকে, সেগুলো সরিয়ে দেওয়া দরকার। পিতা যদি পূজনীয় হন তাহলে তাঁকে সব কিছু আলো-আঁধার, স্বার্থকতা-ব্যর্থতা, জয়ধ্বনী ধিক্কার নিয়েই পূজনীয় হতে হবে। এ জ্ঞান ও নিরীক্ষা মানুষে মানুষে বন্ধুতা আদান প্রদানকে মধুর স্থায়িত্ব দান করে। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ ঐতরীয় উপনিষদে (যা ঋকবেদের অংশ) মনুষ্য সৃষ্টির যে বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যতখানি বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবগ্রাহ্য সে রকম বিবরণ বাইবেল বা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না। পুরুষ দেহ থেকে স্ত্রীদেহে কিভাবে নতুন জীবন সিঞ্চিত হয়, সিঞ্চিত রেতঃ স্ত্রীর অবয়বের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়, কী কারণে পিতা ও মাতা যুক্ত প্রয়াসে সন্তানকে প্রতিপালন করেন এবং তৎসঙ্গে পরস্পরকে—এসব উপনিষদে ঋষিরা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এও ঘোষণা করেছেন যে মানুষ ও পৃথিবীর কাছে অন্নের চেয়ে বড় কিছু নেই। বলছেন, অন্নকে নিন্দা কোর না। প্রাণী অন্ন, শরীর অন্নাহ, শরীরের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, অতএব অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। সঙ্গে সঙ্গে আরও ঘোষণা করেছেন, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, বিজ্ঞান হতেই ভূতবর্গ জাত হয়। জাত হয়ে বিজ্ঞানের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয়, বিনাশকালে বিজ্ঞানেরই অভিমুখে প্রতিগমন করে, বিজ্ঞানেই বিলীন হয়। এই যে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাণ জ্ঞানলাভের আহ্বান, উপনিষদ ছাড়া অন্য কোনো প্রাচীন ধর্মপুস্তকে আমরা দেখতে পাইনা।

ঐতরীয় উপনিষদে আরও দুটি ঘোষণা আছে, যা আমাকে প্রায় অভিভূত করে দেয়। একটি ঘোষণা মানুষের মস্তিষ্কলব্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানকে সর্বোচ্চস্থান দিতে অস্বীকার।

মস্তিষ্কের সীমাকে বিদীর্ণ করে মানুষকে প্রবেশ করতে হয় ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারে। এই দ্বারটির নাম বিদৃতি। এই ঘোষণার মহান তাৎপর্য বর্তমান যুগে মানুষের মস্তিষ্ক দ্বারা সৃষ্ট পরম শক্তিশালী সৃষ্টি ও ধ্বংসের শল্যবিদ্যাকে পরিহাস করে। বলে, এর চেয়ে

আরও অনেক বড় শক্তি আছে, অনেক মহাজ্ঞাতব্য ও ধাতব্য বিষয় আছে যা জানতে হলে তোমাকে বিদূতির সাহায্য নিতে হবে। আমার মনে হয় 'সময়ের ইতিহাস' পুস্তকের প্রণেতা হকিন্স এই বিদূতির শক্তিতে সমৃদ্ধ, তাই তাঁর জ্ঞান সময়ের সীমানা পেরিয়ে আমাদের নিয়ে যায় এমন এক সীমাহীন অস্তিত্বের মধ্যে, বা ঘ্রাণ, দৃষ্টি, শ্রবণ, স্পর্শ এমন কী চিন্তনেরও বাইরে।

আর একটি বিশেষ পাঠ রয়েছে ঐতরীয় উপনিষদে যা আমার কাছে পরম আকর্ষণীয়। একে বলা হয়েছে শান্তিপীঠ। পাঠের শেষ শব্দগুলো মানুষের কানে দৈব সঙ্গীতের মতো শোনায়—"ঋতং সত্যং বদিষ্যামি ; তন্মাম তদ্বাক্তরমবতু, অভতু মাম্, অবতু বক্তারম, অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি। মিষ্টি বলব, সত্যি বলব ; তোমার আমার বক্তার ও শ্রোতার সমান কল্যাণ হবে, আমরা সমান অংশগ্রহণ করব। এই যে শিক্ষক ও ছাত্র, পিতা ও পুত্র, বয়ঃশ্রেষ্ঠ ও বয়ঃনবীন, এদের মধ্যে সমতার ঘোষণা, এটাও যে কোনো প্রাচীন শাস্ত্রে দুর্লভ।

এই কাহিনী শেষ করবার মুখে একথাগুলো বলার তাৎপর্য নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। পিতা-পুত্র এক আদি ও অন্ত হীন রাজপথে সমগামী বন্ধু। একে অন্যকে দেয় পূর্ণতা, দেয় জীবনের রহস্য জ্ঞান। এই পরম আকাঙ্ক্ষিত দ্বৈত সম্পর্ক পেতে হলে যা অবশ্য প্রয়োজনীয় তা হল নির্মোক আত্ম-পরিচিতি। তুমি যদি আমাকে পরিপূর্ণ না জানো এবং আমিও তোমাকে পরিপূর্ণ না জানি, তাহলে এই আদর্শ পিতা-পুত্র সম্পর্ক থেকে যায় অনধিকৃত।

কেন কোনো কোনো পুরুষ তাদের জীবন একই নারীতে সীমাবদ্ধ রাখে, কেন অন্য কোনো পুরুষ একাধিক নারীতে আসক্ত ও পরিব্যাপ্ত হয়—এ সব নিয়ে এখন সিগমণ্ড ফ্রয়েড থেকে অনেক মনস্তাত্ত্বিক ও কামতাত্ত্বিক প্রচুর বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করেছেন। ফ্রয়েডের মতে প্রথম কৈশোরের সাত বছরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের কাম জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায়। তাতে সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে পিতা-মাতার প্রেম অথবা প্রেমহীন সম্পর্কের। কিংবা অন্য কোনো বিপরীত লিঙ্গের প্রভাব থেকে। অবশ্য এই নির্ধারক তত্ত্ব পরবর্তী অনেক মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বর্জন করেছেন। সম্প্রয়াত বিখ্যাত মনঃতাত্ত্বিক এরিক এরিকসন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, মানুষ পরিণত

বয়সেও নিজের চেষ্টা ও দৃঢ়মস্ততার দ্বারা জীবনের কামভিত্তিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম।

আমার শৈশব থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত কেটেছিল গণেশপুর গ্রামে। এ গ্রামের মধ্যবিত্ত সমাজে লুকানো অথবা আধা লুকানো কামুক সম্পর্কে অপ্রাচুর্য ছিল না। সাধারণত মানুষদের মধ্যে বাধা নিষেধ ছিল খুবই কম। কামবিদ্যায় দীক্ষা বহু মানুষের দীর্ঘান্বিত পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই শুরু হোত। কিশোর কিশোরীরা অথবা প্রথম যৌবনের ছেলেমেয়েরা হোমোসেক্সুয়ালিটি গ্রহণ করতে বাধ্য হোত, স্বাভাবিক সেক্সুয়াল সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ও সম্মতির অভাবে। আমার জীবনে প্রথম গভীর প্রেম, যার শুরু প্রথম শৈশবে যার প্রভাব এখনও শেষ হয়নি তা হল আমার দিদিকে নিয়ে। নিদ্রিত অবস্থায় বোতাম খোলা ব্লাউজের আবরণ থেকে বেরিয়ে আসা একজোড়া পদ্মের মত দুটি স্তন আমি এরই শরীরে দেখতে পেয়েছিলাম।

দিদির কাছে আমার এই গভীর প্রেম অজানা ছিল না, কিন্তু সে তাকে কোনোদিনই প্রশ্রয় দেয়নি। সাত আট বছর আগে কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ কাকার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম দিদি মৃত্যুশয্যায়। প্রায় কাউকেই চিনতে পারছিল না। তবু মনে হল আমাকে দেখে বুঝি চিনল। শুনলাম কয়েকদিন আগে বলেছিল আমাকে দেখবার খুব ইচ্ছে করছে। আমি এখনও, এই তিন কুড়ি দশ পেরিয়েও, দিদির সঙ্গে ভালবাসার স্বপ্ন দেখি।

এদিক ওদিক খুচরো তথাকথিত ভালবাসা আরও দু-চারটে ঘটেছিল বৈকি। কোনোটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কোনোটারই ভবিষ্যত ছিল না। আমি ইউনিভারসিটির ভাল ছেলে বলে যদিবা মেয়েদের কিছুটা আকর্ষণ পেতাম, আমার দেহে পরিষ্কার গ্রামের ছাপ, আমি দরিদ্র, অতএব পদক্ষেপের সাহস আমার নিজেরও হতনা, অন্য পক্ষ থেকেও হতে দেখিনি।

কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে একটা মস্তাজ ছায়াছবি তৈরী করা যায়, এক একজনকে এক এক ভঙ্গিতে, ছন্দে, গতিতে ও পরিবেশে মিশ্রিতভাবে দেখিয়ে। কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রত্যেকটি পুরুষ ও নারী আলাদা। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার সাধারণত সংরক্ষণশীল। পারিবারিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বিশেষ মূল্যবান। ধনী ঘরের ধারাবাহিকতাকে বলা হয় পারিবারিক কালচার। যেহেতু ভদ্র গৃহস্থ সমাজের ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ উঁচু জাতে যাদের জন্ম তারা প্রায়ই কখনও নিচু জাতের

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রেমিক সম্পর্কে ধরা পড়ত না আমাদের যৌবনে (এখনও এর ব্যতিক্রম খুব বেশি নয়) অতএব আর্থিক অবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনেকটা ছিল একরকম।

এক অন্ধ ভদ্রলোকের কাহিনী মনে পড়ছে। সে ভদ্রলোকের বৈমাত্রেয় বোন, ধরা যাক তার নাম খুকু, কিছুকালের জন্য আমার 'বান্ধবী' ছিল। পশ্চিমে যাকে গার্ল ফ্রেণ্ড বলা হয়, ভারতবর্ষের 'বান্ধবীরা' কিন্তু সে জাতের নয়। খোলা কথায় ভারতবর্ষে বান্ধবীরা এখনও সাধারণত সেক্স এড়িয়ে চলতে চায়। অবশ্যি এখন সন্তান সম্ভাবনা দূর করার সহজলভ্য উপায় এবং সমাজে অনেকখানি ইংরাজীতে যাকে বলে 'পার্মিসিভনেস' (বাংলায় কী বলা যায়, স্বাধীনতা ?) যুবক যুবতীদের সম্পর্ককে অনেক সময় বিছানায় নিয়ে যায়। এখানে অনেক সময় মানে কোনো কোনো সময়। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের এক শতাংশ লোক, সংখ্যায় আট কোটি। আমাদের যাদের সঙ্গে পরিচয় বা তরল বন্ধুতা তাদের দিয়েই আমরা সমস্ত দেশ ও সমাজকে দেখতে অভ্যস্ত। আমি এখন এই সুপরিণত বয়সে শুনতে পাই যে পাড়ায় বাস করি সেখানে কয়েকটি ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক, বিবাহের বাইরেও পুরুষের সঙ্গে কাম সম্পর্কে সংযুক্ত। এই 'অনেক' মানে আমরা যে কটি খবর রাখি তাই। এদেশে আমেরিকা বা ইউরোপের মতো স্ত্রী-পুরুষদের কাম-চরিত্র নিয়ে কোনো গবেষণা হয়না। এখানে এখনও 'সেক্সুয়াল হ্যাবিট্ অফ ইণ্ডিয়ানস' শিরোনামা নিয়ে কোনো পুস্তক প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য আমি একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতকোত্তর থিসিসে দেখেছি যে কলেজে পড়া মেয়েদের সঙ্গে প্রশ্ন-উত্তরে জানা গেছে যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মেয়েদের বিয়ের আগে কাম সম্পর্কে (অন্ততঃ মৌখিক ভাবে) আপত্তি নেই। সেক্স নিয়ে নির্বোধ আলোচনা স্কুলের মধ্যম স্তর থেকে ছেলেমেয়েদের মুখে শোনা যায়। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এখনও ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত সমাজে অন্তত পঁচানব্বুই শতাংশ বিবাহ পর্যন্ত অক্ষত-যোনি।

আমাদের সময় ব্যাপারটা আরও বিভিন্ন বাধা নিষেধের পর্দায় গোপনীয় ও নিষিদ্ধ করে রাখা হত। খুকু আমার 'বান্ধবী', মাঝে মাঝে তার স্তন স্পর্শ করতাম। তাকে চুম্বন করেছি বলে মনে পড়ে না। সে বিলক্ষণ জানতো আমি তাকে বিয়ে কদাচ করব না। কদাচ কখনও রক্তের উত্তাপে ওই ধরনের কোনো আশ্বাস দিলে সে তৎক্ষণাৎ ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে তা নস্যাৎ করে দিত।

ঠিক এরকম নয়, কিন্তু এরই কাছাকাছি 'সম্পর্ক' তৈরী হয়েছিল খুলনার এব মেয়ের সঙ্গে, যার বহুদিন পূর্বে মৃত্যু হয়েছে। সে দেখতে ছিল খুব সুন্দরী, আমার বোনের চেয়েও দু-এক বছরের ছোট। আমরা একই বাড়ীতে উপরে নিচে বাস করতাম। বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। হ্যারিকেনের আলো যতটা সাধ্য অন্ধকার দূর করত। একদিন একটা তক্তপোষের ওপর পাশাপাশি বসে আমি সম্পূর্ণ বিনা প্রতিরোধে শাড়ীর ভিতর হাত ঢুকিয়ে তার দু-খানি বুক করায়ত্ত করেছিলাম। তখনও দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েদের 'ব্রা' পরবার রীতি হয়নি। এই মেয়েকে বোধহয় আমি ভালই বেসেছিলাম, চাকরী-বাকরী করে তাকে বৌ বানাবার ইচ্ছেও আমাকে উত্তেজিত করত। কিন্তু মেয়েটি ছিল বুদ্ধিমতী। সে জানত, সে কোনোদিনই আমার স্ত্রী হবে না। অতএব তার নগ্ন বুক পর্যন্তই আমি পৌঁছতে পেরেছিলাম।

পরে কলেজ জীবনে কলকাতায় বেশ বর্ধিষ্ণু পরিবারের, আমার সহপাঠী একটি মেয়ের সঙ্গে 'ভাব' হয়েছিল। তার মুখে বসন্তের দাগ সত্ত্বেও সে ছিল সুন্দরী, কথাবার্তায় চতুর ও তীক্ষ্ণ, লেখাপড়ায় মেধাবী, এবং স্বভাব চটুল। আমাদের মধ্যে প্রায়ই প্রেম প্রেম কথা হতো। তাকে আমি স্পর্শ করিনি। সে আমাকে বলত ভীতু। স্পর্শ না করার কারণ ছিল, সে নিজেই আমাকে বলেছিল সে তার মামার সঙ্গে প্রেমাবদ্ধ। একদিন জ্বরাক্রান্ত হয়ে আমি পিসিমার বাড়ীতে একটি ঘরে অন্ধকারে উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় শুয়ে আছি। সে এসে পাশে বসল, কপালে হাত দিয়ে বলল, এ বাবাঃ, কি জ্বর! আমি বললাম, বেশি নয়, মাত্র একশ'দুই। জিজ্ঞেস করল 'মাথা ব্যথা করছে? আমি বললাম, বিশেষ না। সে কিছু না বলে মাথা টিপে দিতে লাগল। আমার বেশ আরাম মনে হল। এক সময় সে আমার হাত তুলে নিয়ে তার বুকে রাখল। শাড়ীর উপর নয়, ব্লাউজের উপরে। তার নাম সবিতা। আমি বললাম, তুমি আমাকে ভীষণ লোভ দেখাচ্ছো। কিন্তু তুমি অন্য পুরুষের প্রেমিকা। তোমার কাছ থেকে দূরে থাকাই আমার উচিত। তাই আমি থাকতে চাই। সবিতা বলল, তুমি দারুণ বোকা। বলে হঠাৎ উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এই হল আমার আর এক বান্ধবী কাহিনীর সারাংশ।

বাস করতাম উত্তর কলকাতায় গোয়াবাগান অঞ্চলে। নিচের তলায় কাকিমাদের সঙ্গে মুরলা পিসি, তখন অমলেন্দু পিসেমশাই দেউলী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতায়। উপরে যে পরিবারটি বাস করত তারা দু ভাই, মা, এক বোন।

জননী মহাশয়া এককালে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতেন, এক পয়সাওয়ালা পুরুষের রক্ষিতা ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি প্রায় সর্বদাই অতীত জীবনের 'পাপের জন্য' উচ্চকণ্ঠে পরিতাপ করতেন ও ঈশ্বরের মার্জনা ভিক্ষা করতেন। তাঁর বড় পুত্র সিনেমা জগতে সুখ্যাতি পেয়েছিলেন যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শিকতায়। ইনি বিবাহিত ছিলেন, প্রায়ই স্ত্রীকে প্রচণ্ড মারধোর করতেন। এঁরও এক রক্ষিতা ছিল। তিনি অবাধে এ বাড়ীতে আসতেন, সবারই খাতির পেতেন, এমনকি ভদ্রলোকের পত্নীরও। ছোট ভাইটি কলেজ পাশ করে কি একটা চাকরীতে ঢুকেছিল। বোনটি ছিল সবচেয়ে ছোট, বেশ সুন্দরী, সবে স্কুল পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমার সঙ্গে এই মেয়েটিরও 'ভাব' হয়েছিল। আমার কাছে পড়তে আসত। সে ছাতের ছোট ঘরে বসে সেতার বাজাত। একমাত্র শ্রোতা ছিলাম আমি। আমাদের দুজনকে নিয়ে কিছু কথাবার্তা রটেছিল। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক ছিল খুব মিহি সুরে বাঁধা বন্ধুতা। শরীরের ছোঁয়াও সে সুরটিকে ছিন্ন করেনি।

একদিন মেয়েটি সন্ধ্যেবেলা সেতার বাজাচ্ছে, আমি একটু দূরে বসে শুনছি। সে হঠাৎ সেতার বাজান বন্ধ করে দিয়ে আমাকে বলল, "আমার ভীষণ বিপদ।"

—"কিসের বিপদ! তোমার আবার বিপদ হবে কেন?"

—"আপনি জানেন না! আমার এক দিদি ছিল, মা ও দাদা তার বিয়ে দিয়েছিল এক দুশ্চরিত্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে। সাত আট বছর তার মৃত্যু হয়েছে। আমাদের ধারণা সে আত্মহত্যা করেছে। যে লোকটা আমার জামাইবাবু, সে আমাকে বিয়ে করতে চায়। মা ও দাদা সম্পূর্ণ রাজী। সে অনেক টাকা দিচ্ছে ওদের। আমার কোনো উপায় নেই।"

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। নীরবতা ভেঙে মেয়েটি বলল, "আমাকে পালাবার কোনো পথ বলে দিতে পারেন?"

"আমি বললাম, "না।"

সে বলল, "আমি জানি পালাবার কোনো পথ আমার নেই।"

এই ঘটনার দু'তিন মাস পরে আমরা ও বাড়ী থেকে উঠে গেলাম। সারা জীবন আমি বোধহয় লক্ষবার এক নিরুত্তর প্রশ্নের সামনে কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে বসে দাঁড়িয়ে অথবা শুয়ে থেকেছি। সেই মেয়েটার কি হল? কোথায় গেল সে? কি করে কাটল তার জীবন? সেও কি তার দিদির মতো আত্মহত্যা করল? এ প্রশ্নগুলি থেকে আমি রেহাই পাবো না।

আর একটি মেয়েকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন সারা জীবন আমাকে অনেক খোঁচা মেরেছে।

গোয়াবাগান অঞ্চলেই এক বহুতল বাড়ীর একটি ফ্ল্যাটে বাস করতেন এক ব্রাহ্ম পরিবার। আমি যে বাড়ী থাকতাম সে বাড়ী থেকে ওদের প্রবেশ পথ দু'শ গজের বেশি দূরে নয়। একদিন আমি কলেজে যাচ্ছি, সে বাড়ীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক ও একটি মেয়ে। মেয়েটি বলল, "বাবা, ইনিই তিনি। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্ড হয়েছেন।

ভদ্রলোক খুব স্নেহের সঙ্গে আমার পরিচয় নিলেন, নিজেদের পরিচয় দিলেন। বললেন, "তুমি এসো আমাদের বাড়ীতে গল্প করতে, খুব আনন্দ হবে।"

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, "অবশ্য আসবেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্ড হওয়া ছেলে কাউকে চিনি না।

এক সন্ধ্যেবেলা গিয়ে হাজির হলাম ওদের বাড়ীতে। পদবী ব্যানার্জী। ঘরে বেশ গোছানো আসবাব-পত্র, সোফাসেট, কার্পেট। ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী আমাকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল, গ্রাম-জেলা, বাবা-মা, ভাই-বোন, কলেজ, পাঠ্য বিষয়, এসব নিয়ে। মিনিট দশেক পরে সেই মেয়েটি ঘরে ঢুকলো। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। খুব যে সুন্দরী তা নয়, অত বুদ্ধিমতী আমি এর আগে কখনও দেখিনি। চোখে সব সময় কৌতুক নাচছে। পাতলা ঠোঁটদুটি সর্বদা হাসিতে চঞ্চল। সে ঢুকেই বলল, "আমি কিন্তু নমস্কার করছি না। আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়। যদিও এক ক্লাস নিচে পড়ি। আমি বললাম, "তাহলে আর বড় রইলেন কি করে?" সমান সমান হয়ে গেলেন তো। আপনার কথামতো আপনি বয়সে বড়, যেহেতু আপনি আমার বয়স জানেন না। আপনার দাবী সত্যি না-ও হতে পারে। কিন্তু আমি যে আপনার থেকে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং বড় যদি কেউ হয়ে থাকে সে আমি। এখন থেকে আপনি আমাকে দাদা বলবেন।

অনেক কণ্ঠের হাসি শুনে এদিক ওদিক চোখ ফেলে দেখলাম আরও দুটি মেয়ে ঘরে ঢুকেছে। ব্যানার্জী মশাই বললেন, "এ আমার বড় মেয়ে লতিকা। যার সঙ্গে আপনি এতক্ষণ কথা বলছিলেন ওর নাম যূথিকা। আমার ছোট মেয়ে কণিকা এখনও স্কুলে পড়ে।"

অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম। অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম। আমার মনে

হল অনেক দিনের পরিচয় এ মেয়েটির সঙ্গে, যার নাম যূথিকা। ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। এ পরিচয় বেশ ঘনিষ্ট হয়েছিল। আমি সপ্তাহে কখনও একবার, কখনও দুবার ওদের বাড়ি যেতাম। স্বল্পকালের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল যে আমি যূথিকার বন্ধু এবং ওর কাছেই আমার আগমন। ভেতরের দিকে একটা ছোট ঘরে মাদুর পেতে যূথিকা ও আমি গল্প করতাম। কী বলতাম, কী আলোচনা হোত; আমার এখন কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলে যে অত আনন্দ পাওয়া যায় এই আমি প্রথম জানলাম। যূথিকার কৌতুকবোধের কথা বলছি। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমি একদিন চাকরের হাত দিয়ে ওকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। লিখেছিলাম কলকাতার ভাষা—থাকলুম, গেলুম, খেলুম, বললুম ইত্যাদি। জবাবে যে কাগজখানা এলো তার ঠিক মাঝখানে লেখা শুধু একটি কথা: "হালুম।"

টমোড়ী হোস্টেলে থাকার সময় অধ্যাপক মার্কাস গ্রে একটি এম. আর. এ দলের সঙ্গে আমাকে রেঙ্গুনে নিয়ে গিয়েছিলেন একটা বড় সভায় যোগদান করার জন্য। যুদ্ধের সময় তিন দিন তিন রাত্রি জাহাজ চেপে বর্মা যাবার সংবাদ পেয়ে আমার কাকামণি খুব রাগ করেছিলেন। আমার শুধু মনে আছে ডেকের যাত্রী হিসাবে প্রথম সারারাত বমি করেছিলাম। দ্বিতীয় দিনে রেহাই না হলে তৃতীয় দিনে রামকৃষ্ণ মিশনের এক সাধু আমার দুর্দশা দেখে আমাকে নিয়ে তাঁর কেবিনে জায়গা দিয়েছিলেন। পরে রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশনে নিমন্ত্রিত হয়ে কৈ-মাছের ঝোল ও ভাত খাবার সুযোগ হয়েছিল।

রেঙ্গুনে থাকার সময় যূথিকার সঙ্গে আমার প্রথম পত্রালাপ। ওরা তখন রাঁচি চলে গেছে। ঠিকানাটা আমার এখনও মনে আছে, হিম কুটির, হিজল, রাঁচি। চিঠির ভাষা ও হস্তাক্ষর সমান সুন্দর। কৌতুকে ব্যঙ্গ ভরা বাক্যগুলো। কিন্তু আন্তরিকতারও অভাব নেই। চিঠি আদান প্রদানের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ক যেন আরও গাঢ় হল।

এর মধ্যে আমাকে একদিন গ্রে সাহেব ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দাঁড়াতে বললেন, "বস।"

বসবার সঙ্গে সঙ্গে তিনখানা চিঠি আমার সামনে রাখলেন। তিনখানা যূথিকার লেখা। আমি অনেকদিন ওর চিঠি না পেয়ে বেশ আহত ও চিন্তিত হয়েছিলাম।

—"এ চিঠিগুলো তোমার?"

—"হ্যা।"

—"কে লিখেছে?"

—"আমার এক বন্ধু। যূথিকা ব্যানার্জী।"

—"আমাদের কলেজে পড়ে?"

—"না।"

—"চিঠিগুলো নিয়ে নাও। তিনটে চিঠি না পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই খুব ভাবনায় পড়েছ।"

গ্রে'র মুখে হাসি। আমি সাহস করে বললাম, "এগুলো তোমার হাতে এলো কি করে?"

গ্রে আমার হাতে একখানা চিঠি তুলে দিলেন। বললেন, "এটা বনবিহারী ঘোষের রিপোর্ট।"

রিপোর্টের সারাংশ হল, এই ছেলেটা, যাকে তুমি দারুণ প্রশ্রয় দাও, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছে। প্রত্যেক সপ্তাহে তার দুটো করে চিঠি আসে। চিঠিগুলো যদিও বিরুদ্ধ এবং বেশ হিউমারাস, তথাপি তার ভাষায় বন্ধুতার স্নেহ ও প্রীতি সমাচ্ছন্ন। আবার এই ছেলেটা এই কনফারেন্সে একটি বর্মী মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব জমিয়েছে। ওদের প্রায়ই একসঙ্গে দেখতে পাই। বর্মী মেয়েরা খুবই সরল। আমাদের মেয়েদের মতো বাধা নিষেধে আবদ্ধ নয়। ছেলেটার চরিত্র সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ। তাই তোমাকে জানালাম।"

গ্রে সাহেব বললেন, "বনবিহারীকে আমি কি বলেছিলাম জানতে চাও?"

আমি কৌতূহল চেপে চুপ করে রইলাম। বলেছি, "ছেলেমেয়েদের মধ্যে বন্ধুতা হবে এর মধ্যে আপত্তির কি আছে? একটি ছেলে যদি দুটি মেয়ের সঙ্গে ভাব জমায়, তাতেই বা আপত্তি কিসের? আমার তো কেম্ব্রিজে পড়ার সময় একসঙ্গে তিনটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম ছিল।"

বছর দুই পরে জানতে পারলাম যূথিকা ব্যানার্জী ভবানীপুরে বকুলবাগান স্ট্রীটে একটি বাড়ীতে বাস করে। আমার এক সহপাঠী বেরিয়ে গেল ওদের আত্মীয়। তার কাছে ঠিকানা নিয়ে হাজির হলাম বকুলবাগান স্ট্রীটের এক বাড়ীতে। আমি তখন সবে স্টেটস্‌ম্যানে কাজ করছি।

খবর পেয়ে যূথিকা এসে বসল। সেই আগের মতোই কৌতুকদীপ্ত, পাতলা হাসিতে কম্পমান ওষ্ঠাধর। সেই আগের মতোই আলাপে পটুতা, সংলাপে ঝংকার!

জিজ্ঞেস করল, রেঙ্গুনে পাওয়া চিঠিগুলো আমি কি করেছি। বললাম, "চিঠি পেয়ে লোকে যা করে তাই।"

—"তার মানে?"

—"পড়েছি।"

—"পড়ার পরে কি করা হয়েছে?"

—"স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে বাঁধাই করা হয়েছে। অতি সযত্নে, গভীর গোপনে সুরক্ষিত আছে।"

—"কথাবার্তায় চতুরতা অনেক বেড়েছে দেখছি। নির্ঘাৎ সাহেবী কাগজে চাকরি করার দোষ। সোজাসুজি বাংলা বললে কি কোনো ক্ষতি হয়?"

—"কিচ্ছু না। পুড়িয়ে ফেলেছি। তার মানে এই নয় যে ভুলে গেছি।"

—"আপনার চিঠিগুলোর কথা জানতে চাইলেন না যে?"

—"ওগুলো আপনাকে দেওয়া—সেগুলো কী করেছেন বা করবেন সে দায়িত্ব আপনার, আমার নয়।"

—"জানবার কৌতূহল নেই।"

—"ও চিঠিগুলো আমার জীবনের অংশ। আমার চিঠির চেয়ে আমি যে মহান। আশাকরি রবীন্দ্রনাথের শাহজাহান পড়া আছে।"

—"বোধহয় আছে। তাহলে আমিই বলি, আপনার চিঠিগুলো ছবি হয়ে গেছে।"

—"তুমি কি কেবলই ছবি? কাগজে শুধু হাতে লেখা?"

—"এবার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পেরেছি। একটা কথা আপনাকে বহুদিন বলা হয়নি। ইচ্ছে করেই বলিনি। আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন। তার সঙ্গে সম্ভবত এ বছরই আমার বিয়ে হবে।"

—"এতবড় খবরটা এতদিন চেপে গেছেন? মনে কী হয়েছিল যে শুনেই আমি চৈতন্য হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ব? আপনার কী ধারণা হচ্ছিল বা এখনও আছে যে আমি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি?"

—"হাবুডুবু না খেলেও কিছুটা যে ডুবু খেয়েছেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই, আপনারও থাকা উচিত নয়। আপনাকে যে খবরটা দিতে পারিনি সেটা আমার দুর্বলতা। বন্ধু হিসাবে আপনাকে হারাতে আমি প্রস্তুত হতে পারিনি। তাই বহুদিন আপনার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেও আপনি এ বাড়ীতে এসেছেন শুনে ছুটে এলাম কথা বলতে।"

যূথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। সে কোথায় আছে, কেমন আছে, কি করে তার জীবন কাটল এ-খবর অনেক ইচ্ছা ও আগ্রহ সত্ত্বেও যোগার করতে পারিনি। অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে স্টেটস্‌ম্যানের পার্সোনাল কলমে অথবা আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেবার। 'চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে গোয়াবাগান অঞ্চলে বাস করতেন জনৈকা যূথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগে বিজ্ঞাপক অতিশয় আগ্রহী। বক্স নাম্বারে চিঠি লিখুন।" বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। আমি জানতাম বিজ্ঞাপন চোখে পড়লেও যূথিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা দেবেন না।

এবার বলি আর একটি মেয়ের কথা, যিনি এখন আমার সমবয়সী মহিলা, জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় লেখক হিসেবে ভারত বিখ্যাত। ছোটবেলা থেকে আমি সাইনাস রোগে ভুগে আসছি। এটা আমার সারা জীবনের সম্পত্তি। পিসিমা নিয়ে গিয়েছিলেন একজন চিকিৎসকের কাছে, যিনি একই সঙ্গে স্কুলের শিক্ষকতা ও অপেশাদারী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করতেন। ডাক্তার হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। এঁরা ছিলেন খ্রিশ্চান। ডাক্তারবাবুর আমন্ত্রণে আমি তাঁর গৃহে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিলাম। স্ত্রী, তিনটি কন্যা ও একটি পুত্রের সংসার। বড় কন্যাটি শুধু সুন্দর নয়, তার মুখে পবিত্র মেধার এমন একটা ঔজ্জ্বল্য যা আমি আগে দেখিনি। দুজনেই আমরা ইংরেজী অনার্স নিয়ে পড়তাম। কিন্তু পড়াশুনার বিস্তার ও গভীরতা আমার চেয়ে তার অনেক বেশি। ডাক্তারবাবুদের বাড়ী গেলে সব সময়ই সবাই একসঙ্গে বসে কথাবার্তা হোত। যূথিকার মতো এই মেয়েটি কখনও আমার 'বিশেষবন্ধু' হতে পারেনি। আমি এদের সঙ্গে গীর্জায় গেছি একাধিকবার। এরা মেথডিস্ট চার্চের অনুরক্ত ছিলেন। যেখানে পাদরী সারমন দেবার পরে উপস্থিত সকলে বুক চাপড়ে উচ্চকণ্ঠে "যীশাস! যীশাস!" বলে চিৎকার করতেন, যেন যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ যন্ত্রণার সবাই সমব্যথী। আমার পরিবারে বেশ একটু ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল যে এই পরিবারের পিতা ও মাতা আমাকে তাঁদের ধর্মে দীক্ষিত করে কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেবেন। ব্যাপারটা এতই বালখিল্য যে এ নিয়ে আমি কারুর সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে রাজী হইনি।

কন্যাটির নাম বলব না, তাঁর বিষয়ে লেখবার সম্মতি চাইনি, অতএব পাইনি। কখনও সখনও আমাদের দুজনের কিছুটা কথাবার্তা হোত। তার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও কিছুটা প্রীতির মোলায়েম উত্তাপের বেশি ছিল না। আমার প্রশ্নের উত্তরে

একদিন কন্যাটি বলেছিল, সে বাইবেলের প্রত্যেকটি অক্ষর ঈশ্বর-পুত্র যীশুর নিজের মুখের কথা বলে মানে এবং বিশ্বাস করে।

আমি ছাড়া কোনো হিন্দু যুবক অন্দরে প্রবেশ করার অধিকার তখনও পায়নি। এক সময় কলকাতার একটি মাসিক পত্রিকায় আমার একটি গল্প ছাপা হয়েছিল। গল্পের আধারশীলা ছিল এই খ্রিস্চান পরিবারটি। গল্পটি আমার বন্ধু পড়ে নিয়েছিল, যদিও আমি ওদের কাছে তার উল্লেখ পর্যন্ত করিনি। একদিন ওদের বাড়ী গেলে সে বলল, "গল্পটা মন্দ হয়নি, কিন্তু বাক্য ও বানানের মধ্যে ভুল আছে।"

—"আপনি পড়লেন কি করে?"

—"পত্রিকাগুলো সকলেরই পাঠের বিষয়। পেলাম, দেখলাম—।"

—"এবং জিতলাম না। তাই তো?"

—"একদিকে জিতলেন, কেননা গল্প লেখা আমার দ্বারা কদাচ সম্ভব হবে না। আপনি হয়ত বড় হয়ে অনেক গল্প উপন্যাস লিখবেন। আমি নিশ্চয় করে জানি আমার দ্বারা ও কাজ হবে না।"

—"অর্থাৎ আপনি নিজেকে কখনই জনসমাজের কাছে খুলে ধরতে পারবেন না। নিশ্চয়ই জানেন কাহিনীকারদের কাহিনীতে তারা নিজেরা সর্বদা প্রচ্ছন্ন।"

—"হয়ত আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে ভাল বাংলা জানেন বলে আপনার বেশ অহংকার আছে। কিন্তু আপনার লেখায় কয়েকটি বাক্য ও বানান নির্দোষ নয়।"

—"মার্ক করে রেখেছেন?"

—"রেখেছি। আমি মাষ্টারের মেয়ে ও নিজেও মাষ্টারী করব। ওটা আমার মজ্জাগত, তাই সুযোগ পেলে ছাড়ি না।"

—"ভুলগুলো দেখতে পারি?"

—"নিশ্চয়ই। তা না হলে মাষ্টারী করে লাভ কী? তবে একটা কথা বলব। এখানে বসে পড়বেন না। বাড়ী গিয়ে দেখবেন।"

বাড়ী গিয়ে গল্পটা খুলে দেখলাম বেশ কয়েকটি বাক্য ও শব্দ 'বন্ধুর' হাতে সংশোধিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সংশোধন বিশুদ্ধ।"

পরে একদিন কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি জানতে চাইলাম, "এত ভাল বাংলা আপনি শিখলেন কেমন করে?"

—"আমি সংস্কৃত পড়েছি।"

—"সে তো আমিও পড়েছি।"

—"আপনি টোলের পণ্ডিতের কাছে পড়ে আন্ত মধ্য পাশ করেছেন। আমি কলেজের অধ্যাপকের আলাদা করে পাঠ নিয়ে 'উপাধি' পাশ করেছি।"

—"ব্যাকরণ তীর্থ?"

—"না। কাব্যতীর্থ।"

—"ব্যাকরণ তীর্থ হবার ভয়ে 'উপাধি' পরীক্ষা দিইনি। আপনি ক্রিশ্চান হয়ে কাব্যতীর্থ পর্যন্ত সংস্কৃত পাঠ করলেন কেন?"

—"আমার জীবনে কয়েকটি প্রবল ইচ্ছের মধ্যে একটি হল বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, উপনিষদ, ইত্যাদি সমগ্র প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করা।"

—"তাহলে ইংরেজী অনার্স নিয়ে পড়ছেন কেন?"

—"আমি কিপলিং-এর বাক্য বিশ্বাস করি না যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কখনও মিলবে না, মিলবে না।"

এ প্রসঙ্গ আমি আর বাড়ালাম না। কিপলিং-এর কিছুই আমার পড়া নেই। আমার কাছে তিনি সাম্রাজ্যবাদের কবি, অতএব অস্পৃশ্য।

এম. এ, পড়ার সময় ঐ ক্রিশ্চান পরিবারে আর একটি হিন্দু যুবকের প্রবেশ ঘটল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্র। প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে সবেমাত্র সবচেয়ে বিখ্যাত কলেজের লেকচারার। তিনি নিযুক্ত হলেন আমার 'বন্ধু'কে এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে। বি. এ. অনার্সে সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেও প্রথম হতে পারেনি। এম. এ. পরীক্ষার লক্ষ্য: ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

হলেনও। এবং তার চেয়েও অনেক বড় ও মহত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল—শিক্ষক ও ছাত্রী পরস্পর প্রণয়াবদ্ধ হলেন।

আমার এই বন্ধুর জীবন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি উপন্যাস লেখা যায়। লেখা উচিত। আমাকে এখানে সামান্য কয়েকটি বাক্যে তার কাহিনী সমাপ্ত করতে হচ্ছে। দীর্ঘ আট বছর তিনি পড়ে গিয়েছিলেন ক্রিশ্চান ধর্মের সঙ্গে। যাকে ভালবেসেছিলেন, তিনি কেবল হিন্দু নন, কট্টর মার্কসবাদী। ভগবান ও ধর্মে অবিশ্বাসী। এদের বিবাহে দুই পরিবারেই গভীর আপত্তি। সাত বছর দুজনের মধ্যে দেখাদেখি নেই। দুজনেই অবিবাহিত। পরস্পরের প্রতি উত্তরোত্তর অধিক আকৃষ্ট। একদিন চৌরঙ্গির রাস্তায় চলতে চলতে আমার 'বন্ধু' দেখতে পেলেন অন্যদিক থেকে তাঁর পরম প্রিয় বন্ধু আসছেন। হঠাৎ এক মুহূর্তে বিপ্লব ঘটে গেল। মেয়েটি দ্রুত পদে এগিয়ে গিয়ে

তার ভালবাসার লোকের মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, "আমি এক্ষুনি, এই মুহূর্তে, মুক্তি পেয়ে গেলাম।"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—"কীসের মুক্তি? কোন্ বন্ধন থেকে মুক্তি?"

—"আমি এক্ষুনি, তোমাকে এগিয়ে আসতে দেখে বুঝতে পারলাম সব ধর্ম সব ঈশ্বর মিথ্যা। সত্য একমাত্র জীবন। এই উপলব্ধি ঘটতে আমার সাত আট বছর লেগে গেল।"

আমি তখন নাগপুর টাইমস্-এর এডিটর। হঠাৎ এই বন্ধুর চিঠি। "আজ ভাবছি কি করে জীবনের এই চব্বিশটা বছর মিথ্যের মধ্যে কেটে গেল। আমি এখন প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেয়েছি। তার নাম সাধারণ মানুষ। সারা দুনিয়ার—বিশেষ করে আমার মাতৃভূমির খেটে খাওয়া অর্ধাহারী, অশিক্ষিত মানুষ। এদের মুক্তির একমাত্র পথ শ্রেণী সংগ্রাম। আমি এখন পুরোপুরি কমিউনিষ্ট। আপনার যদি না জানা থাকে, তাহলে জানাচ্ছি ছ'মাস আগে আমাদের বিবাহ হয়েছে।"

প্রায় বিশ বছর পরম সুখে ও গভীর মননে কাটল এই অসাধারণ দম্পতির। অধ্যাপক মহাশয় তাঁর কলেজে জনপ্রিয় ছিলেন। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে ক্যান্সারে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার বন্ধুর সঙ্গে কদাচ কখনও কলকাতায় গেলে দেখা হতো। তিনি একটি কলেজে ইংরেজী অধ্যাপনা দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পাঠ করে এম. এ. পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলেন এবং কলকাতারই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে রীডার পোস্টে চাকরী পেলেন। ক্রিশ্চান ধর্মে তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কোনো মানে নেই। তিনি স্ত্রীলোক। তাই অধ্যাপকগণ তাঁকে প্রায় সমাজচ্যুত করে রাখলেন। বিভাগের যিনি প্রধান তিনি সর্বদা বলতেন, উনি তো খৃস্টান। বিধবা হয়েও মাছ-মাংস-পেঁয়াজ খান। ইংরাজী পড়াতে গিয়ে অনেক বদনাম কুড়িয়েছেন। তাই সংস্কৃতে পড়াশুনা করে এখন বেদভাষা পড়াচ্ছেন।

যে ছিল এককালের ছোটবেলার বন্ধু, সে হয়ে গেল অধ্যাপিকা মহিলা। দু-তিন বছর পর পর গোটা সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে একের পর এক তার গবেষণামূলক পুস্তক দেশে ও বিদেশে ছাপা হতে লাগল। সারা পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণা কেন্দ্রে তাঁর অহরহ নিমন্ত্রণ। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াতেন সেখানে অবসর নেওয়ার মাত্র এক সপ্তাহ আগে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাঁকে পূর্ণ অধ্যাপক পদে উন্নীত করলেন। দিল্লী, পুণা ও ম্যাড্রাস থেকে পূর্ণ অধ্যাপক পদে নিমন্ত্রিত হয়েও তিনি

কলকাতার সেই যে প্রাচীন অবর্ণনীয় আকর্ষণ, যা আমি কখনও অনুভব করিনি কিন্তু বহু বাঙালী করেছে, করছে ও করবে, তা কাটিয়ে চলে যেতে পারেননি।

এখন পরিণত বয়সে বহুকালের পুরোনো বন্ধু সর্বপ্রথম কাছাকাছি হবার সুযোগ পেয়েছি। আমার দিল্লীর বাড়ীতে তিনি আদৃত অতিথি, তাঁর কলকাতার ফ্ল্যাটে আমি সমাদৃত। আমাদের পঠন পাঠন লিখনের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি মার্কসবাদী বলে পরিপূর্ণ রাজনীতি ও সমাজ সচেতন। বৈদিক যুগের সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে তাঁর কয়েকখানা বই পড়লে সে প্রাচীন সভ্যতার বাস্তব চেহারার সন্ধান পাওয়া যায়। লোকধর্মে ইঁট যেমন রামশীলা হয়ে ওঠে, অনৈতিহাসিক এক টুকরো জমি স্বর্ণমূর্তি লাভ করে রামজন্মভূমি হিসাবে, আমার বন্ধুর কিতাবে সে লোকধর্ম নেই। তিনি লোকান্ত পাণ্ডিত্যের সন্ধানে উজ্জ্বল। আমাদের বৃদ্ধ বয়সের বন্ধুতা সুন্দর ও উপভোগ্য। জীবন অনেক সময়ে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত পুরস্কার এনে দেয়।

যে পণ্ডিতমশাইয়ের টোলে পাঠ করে সংস্কৃতে আদি ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, তিনি আমাকে এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে গৃহশিক্ষকের চাকরী পাইয়ে দিয়েছিলেন। আমার দুই ছাত্রী ও এক ছাত্র। বড় বোন কলেজে পড়ে, তাকে আলাদা পড়াতে হয়। এই পরিবারে আমি হয়ে গিয়েছিলাম বিশেষ সমাদৃত। প্রায় বাড়ীর মানুষের মতো। কী করে আমার এবং বড় ছাত্রীর মধ্যে ভালবাসা জন্মালো এবং তা পেয়ে গেল দ্রুত গভীরতা, এ রহস্য আমি আজও ভেদ করতে পারিনি। সে ছিল এক বিশীর্ণ নদীর মতো মোলায়েম ও অতিশয় সুন্দরী। কথাবার্তা বলত খুব কম। কিন্তু হাসির ঝরণা তার মুখ থেকে অহরহ প্রবাহিত হত। একটা প্রাণবন্ততা এক শীর্ণ সুন্দর দেহে জমজমাট থাকতে পারে কি করে, আমি ভেবে পেতাম না। পড়াশুনায় খুব একটা ভাল ছিল না। প্রায়ই কোনো না কোনো ছোট খাটো অসুখ-বিসুখে কলেজ কামাই করতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়া তার প্রায় স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং ছাত্রী হিসেবে সে লোভনীয় ছিল না। কিন্তু সে তো আমার শুধু ছাত্রী ছিল না, সে ছিল অনেক কিছু। তাই তাকে আমি বিশেষ যত্নের সঙ্গে পড়াবার চেষ্টা করতাম।

সে জানত আমি গরীব ঘরের ছেলে, ওদের বাড়ীর টিউশনির অর্থে আমার এম. এ. পড়া চলছে, থাকি পিসিমার বাড়ীতে—স্নেহ ভালবাসা ও অভাব যেখানে একসঙ্গে রাজত্ব করে। সুতরাং সে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ হত। আমার ছাত্রী পাশে বসে খুব প্রচ্ছন্ন আনন্দের সঙ্গে খাওয়াতো। একদিন আমি তাকে পাঠ্যপুস্তক

থেকে শেলীর কবিতা পড়াচ্ছি। কবিতাটি আমার মুখস্ত। আমি প্রথম তার ব্যাখ্যা করে, পরে আবৃত্তি করছি :

I can give not what men call love
But which thou accept not
The worship the heart lifts above
And the Heavens rejects not,—
The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow

আমি চোখ বুজে আবৃত্তি করছিলাম, চোখ খুলে দেখি আমার ছাত্রী ও শোতৃর গাল বেয়ে অশ্রু ঝড়ে পড়ছে।

আমরা দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলাম। তারপর উঠে আমি ওর পাশে দাঁড়ালাম। শাড়ীর আঁচলে চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। অনিশ্চিত অপ্রস্তুত মুখখানা তুলে নিয়ে ওষ্ঠাধরে চুমু খেলাম। দুটি শঙ্কিত শিহরিত আনন্দিত ও সন্দেহসঙ্কুল চোখ আমার চোখে মিনিট খানেক অনিশ্চল জড়িত হল। যে চোখ দুটি আমি আজও ভুলিনি। পরের কাহিনী অতি অ-নাটকীয় অবশ্যম্ভাবী।

—"আমাদের বিয়ে হতে পারে ?"

—"না।"

—"তুমি তোমার বাবা মাকে বলতে পারবে ?"

—"না।"

—"আমি যদি বলি ?"

—"সর্বনাশ ঘটবে।"

—"এর কোনো ভবিষ্যত নেই ?"

—"না।"

ভবিষ্যতের পরেও ভবিষ্যৎ থাকে। যেমন অতীতের আগেও অতীত। শুধু বর্তমানই অস্থির। চলে যাওয়া তার নিয়ম। 'ভবিষ্যত নেই' দিয়ে এ কাহিনীর এখানেই শেষ। ভবিষ্যতের পরেকার ভবিষ্যৎ অন্য সময়ে বর্ণিত হবে।

আমার তখন একুশ বছর বয়স। বুঝতে পারলাম আমি ভীষণ একা। এই একাকী অসহ্য হয়ে উঠল। আমাদের পরিবারে বাবা ও কাকার মধ্যে আর্থিক অবস্থার বিশেষ তারতম্য। আমরা যখনই কলকাতায় একসঙ্গে বাস করেছি, পরিস্থিতি সুখকর হয়নি, হতে পারত না। বাবা সংসারের দেয় সবটুকু টাকা পাঠাতেন কাকিমাকে। আমার মা থাকতেন সর্বদা নিঃস্ব। পারস্পরিক ব্যবহারে তারতম্য হতই। তার সবটাই স্পর্শ করত আমার মা ভাইবোনেদের। আমাকে সবচেয়ে কম।

কাকার বাড়ীতে আমার নিজের স্থান ছিল আদরের। কিন্তু মা ভাইবোনের দুঃখ বেদনা অবহেলা ও সম্মানের অভাব স্পর্শ করত আমাকে।

আমার বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলের বিয়ে হয়ে যাক। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ভয় পেতেন কোনো অজাত কুজাত মেয়েকে যদি ছেলে বিয়ে করে বসে। একুশ বছর বয়সে আমি বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেলাম। একবারও মনে হল না আমার মা কিছুতেই পুত্রবধূকে গ্রহণ করতে পারবেন না। আমি সবেমাত্র স্টেটসম্যানে চাকরী পেয়েছি। মা'র ইচ্ছা ছিল, এবং আমার উচিত ছিল, কয়েক বছর তাঁর দুঃখ অভাব সব পূর্ণ করে—পরে বিবাহ করি।

বিবাহ হল স্বাভাবিক সামাজিক নিয়মে অর্থাৎ সম্বন্ধ করে। যে বাড়ীর মেয়ে আমাদের ঘরে এলো তাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও অনেক উঁচু। নিজেদের বড় বাড়ী বালিগঞ্জে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পরিবারের সবাই অগ্রসর। যিনি সম্বন্ধ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তিনি মেয়ের অনেক বয়সের বড় ভাই, উঁচু কাজ করেন। লণ্ডনে শিক্ষিত। তাঁর সঙ্গে ঘণ্টা খানেক আলাপ করে বোধহয় আমি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলাম। নিজেদের নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র সামাজিক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আমার মন যে কী ভীষণ আকাঙ্ক্ষিত হয়েছিল এ সত্যটা হঠাৎ সজাগ হল। আমি বিয়েতে রাজী হলাম। মা এবং কাকিমাদের সম্মতির অভাব আমাকে নিরস্ত করল না। বাবা রাজী আছেন এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। মেয়েটির দাদা আমাকে বলেছিলেন তাঁর বোনের বয়স, আমি অকপটে বলেছিলাম, আমার বয়স তেইশ, প্রায় চব্বিশের কাছাকাছি। নিজেকে তখন ছাব্বিশ সাতাশ বছরের ক্ষতবিক্ষত মানুষ বলে মনে হত। মাত্র আড়াই বছর বাড়িয়ে বলেছিলাম। এই অপরাধ চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনে আমার স্ত্রী কখনও ক্ষমা করেন নি।

বিবাহের তিন মাস পরেই আমরা দুজনে বৌবাজার অঞ্চলে একটা বাড়ীতে

আলাদা সংসার পাতলাম। মা-ভাইবোনেরা বাবার কাছে খুলনায় চলে গিয়েছিল। তিন মাস দুজনে সংসার করার সময় আমার স্ত্রী হলো অন্তঃস্বত্বা। স্টেটস্ম্যান থেকে পদত্যাগ করে নাগপুর টাইম্‌সের মত একটি ছোট পত্রিকার সম্পাদক হয়ে মধ্যভারতে চলে যেতে তার পূর্ণ সম্মতি ও উৎসাহ ছিল। এক গ্রীষ্মের দিবসে আমরা নাগপুরে চলে এলাম। উঠলাম বাবার পরিচিত এক উকিলের বাড়ীতে, যিনি পরে আমার বড় ভাই-এর মতো শ্রদ্ধেয় ও স্নেহবান হয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট জাজ হয়ে তাঁর কর্মজীবনে অনেক সুখ্যাতি হয়েছিল।

নাগপুর টাইমসের অফিস দেখে আমার ভীষণ ভয় হল, বুঝিবা খুব বড় রকমের ভুল করে বসেছি। ছোট একটা নড়বড়ে একতলা বাড়ী, ওখানেই ছাপাখানা, হাত দিয়ে টাইপসেটিং ও ফ্ল্যাট মেশিনে পত্রিকার মুদ্রণ। স্টাফ বলতে দুজন সাব এডিটর ও একজন রিপোর্টার। ম্যানেজিং এডিটর ভগবতীচরণ শুক্ল ব্রাহ্মণ জাতে বিবাহ করার জন্য পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত। তিওয়ারী নামে এক ব্যক্তি পত্রিকা ম্যানেজার। রবিশঙ্কর শুক্লের আসল প্রতিনিধি। তিনি পত্রিকার খরচ যোগান। সবকিছু সিদ্ধান্তের শেষ দায়িত্ব তাঁর।

নিয়োগের ব্যবস্থা মত পনের দিনের মধ্যেই আমি একটা বড়োসড়ো বাংলো নিবাসের জন্য পেয়ে গেলাম। চারখানা শয়ন ঘর, মাঝখানে বড় বৈঠকখানা, সামনে প্রকাণ্ড বারান্দা। বাংলো থেকে আলাদা রান্নাঘর। বাড়ীর সামনে বেশ বড় লন, গোটাছয়েক প্রকাণ্ড ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছ, যা আমি আগে দেখিনি। তেওয়ারীর সঙ্গে আমার বেশ সদ্ভাব হয়ে গেল। তাঁর সাহায্যে সম্পাদকীয় বিভাগে কিছু নতুন লোক নেওয়া হল। এদের মধ্যে দুজন এখন সুখ্যাত ব্যক্তি। তরুণ কুমার ভাদুড়ী জব্বলপুর থেকে নাগপুরে এসে আমার পত্রিকার প্রথম রিপোর্টার নিযুক্ত হন। পরে এক সময়ে স্ত্রী ও শিশুকন্যা নিয়ে, তরুণ ভাদুড়ী আমাদের বাংলোরই একটা অংশে বাস করতেন। সেই শিশু এখন জয়া ভাদুড়ি। তরুণ সাংবাদিকতায় সুখ্যাতি অর্জন করে মধ্যপ্রদেশে ট্যুরিস্ট কর্পোরেশনে চেয়ারম্যান হতে পেরেছিল। রিপোর্টার ছাড়াও তার উপন্যাস ও উপন্যাস ভিত্তিক ছায়াছবি তাকে আরও বিখ্যাত করেছে। অন্য লোকটির নাম ভেনুগোপাল রাও। সে লিংক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হয়েছে এবং এখন একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার দিল্লীস্থ অফিসের অধিকর্তা।

নাগপুর টাইম্‌সের আস্তে আস্তে উন্নতি হতে লাগল। আমারও নাগপুর সাংবাদিক সমাজে কিছুটা প্রতিষ্ঠা হল। অনেকে বলতেন আমি ভারতবর্ষের সর্ব-কনিষ্ঠ সম্পাদক।

'হিতবাদ' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ও সার্ভেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির একজন পদস্থ ব্যক্তি, এ. ডি. মনি, কয়েক বছর আগে যিনি প্রয়াত হয়েছেন, প্রায়ই স্থানীয় সম্পাদকের সভাতে এই কথাটি প্রচার করতেন।

১৯৪৬ সাল পেরিয়ে এল ১৯৪৭। রবিশঙ্কর শুক্ল সি. পি. ও বেরারের প্রধানমন্ত্রী। ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিদায় নেবার সময় প্রস্তুত। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য কংগ্রেসী নেতৃত্ব তৈরী। রক্তাক্ত পরিস্থিতিতে ইতিহাসের গর্ভ থেকে জন্ম নিচ্ছে একটি নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে এই নতুন রাষ্ট্রের খণ্ডিত অবয়ব। যার মাঝে এগারশ মাইল ভারতভূমি। দেশ স্বাধীন হচ্ছে, অথচ মানুষদের মনে তেমন আনন্দ নেই। তারা যেন এক বিপন্ন রাত্রি থেকে অন্য এক বিপন্ন প্রভাতে পদক্ষেপ করছে।

'নাগপুর টাইমস' ছোট কাগজ। বিক্রি মাত্র পাঁচ হাজার। তবু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে বসে আমার হৃদয় মস্তিষ্ক অস্থির হয়ে উঠত। কী ভাষায় পাঠকদের কাছে ব্যাখ্যা করব সমাগতা প্রায় স্বাধীনতা। এ তো সেই মার্কিন পণ্ডিতদের মস্তিষ্ক নিঃসৃত Empire to Nation Theory-র প্রথম উদাহরণ। কাল যা ছিল সাম্রাজ্য আজ তা হচ্ছে স্বাধীন দেশ। অ্যালবার্ট কাম্যুর ভাষায়, "ঘটছে অনেক কিছু। বদলাচ্ছে খুব কম।"

লালকেল্লার ইংরেজের পতাকা বিদায় নিচ্ছে। উড়ছে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ ও অশোকচক্র পতাকা। গণতন্ত্র তৈরী হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের মডেলে। আমাদের নেতারা বলেছেন ১৯০৬ সাল থেকে নাকি আমরা পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসী নিয়ে হাত পাকাচ্ছি। ইংরেজ আর শত্রু নয়, পরম মিত্র। ভারতের সংবিধান তৈরী হচ্ছে যার সৌধ ইংলণ্ডীয় মডেলে গণতান্ত্রিক। কিন্তু সারা দেহ অর্থাৎ সমস্ত দেশ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 'গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অফ নাইনটিন থার্টি ফাইভ' থেকে সংগৃহীত। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হচ্ছে কিন্তু আভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্যবাদ রেখে দেওয়া হচ্ছে অন্তত কিছুকালের জন্যে। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড, ইণ্ডিয়ান ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর অর্থাৎ শান্তিরক্ষা, বিচার, আই. সি. এস মডেলে তৈরী আইরণ ফ্রেম আই. এ. এস. স্বাধীন ভারতের বড় বড় স্তম্ভ।

এই স্বাধীনতাকে স্বাগত ও প্রশংসা করে আমাকে সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ লিখতে হত। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের প্রতিদিন প্রণাম করতে হত সম্পাদকীয় স্তম্ভে। সমালোচনার ভাষা নিজ থেকেই নরম আবেদন-নিবেদন হয়ে উঠত। আমি নিজেই

অবাক হয়ে যেতাম। অনেক পরে পরিণত বয়সে পরিষ্কার ভাষায় বলতে পেরেছি, Empire to Nation Theory সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র দেশ যে স্বাধীন হবার পরে মাদার কান্ট্রির শাসন ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে। এর কাছাকাছি দ্বিতীয় নজির আইরিশ রিপাবলিক। যাকে তৃতীয় বিশ্ব বলা হয়, সেখানে বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে যে সব দেশ স্বাধীন ও স্বেচ্ছায় প্রাক্তন শাসকদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে, সে সব দেশে গণতন্ত্র বাড়তে পারেনি। হয় একদলীয় একনায়কত্বে পরিণত হয়েছে, নয়তো সেনাপতি দখল করে নিয়েছে রাজশক্তি। ভারতবর্ষে সঙ্কট এখনও তত গভীর হতে পারে নি। কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে' অর্ধেকের বেশি দেশবাসী এখনও দারিদ্র সীমানার নিচে কিম্বা তাকে স্পর্শ করে; গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি রোগগ্রস্থ, ভ্রষ্টাচারে নৈতিক বল প্রায় নিঃশেষ।

কিন্তু সেই ১৯৪৭ সালে মনে তখনও ভয়ের সঙ্গে আশা, সন্দেহের সঙ্গে সাহস। এই দ্বন্দ্ব ভেদ করে একদিন আমার স্ত্রী জন্ম দিল আমার প্রথম সন্তানকে—তুমি সেই পুত্র। আমি হলাম পিতা। এই বিরাট ঘটনাটা আমাকে অভিভূত করে তুলল। স্বামী স্ত্রী সঙ্গম করে, স্বামীর রেত স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ করে সৃষ্টি হয় ভ্রূণ. আস্তে আস্তে সে মানুষের দেহ লাভ করে। তারপরে একদিন মাতৃগর্ভ থেকে বেড়িয়ে আসে এই বিশাল অচেনা অজানা ঘটনাসঙ্কুল পরিবর্তনের তরঙ্গে সর্বদা উদ্বেলিত পৃথিবীতে। পিতা হবার দায়িত্ব সেই থেকে আজ পঞ্চাশ বছর অহরহ বিস্মিত স্তম্ভিত ভীত ও আনন্দিত করেছে। এ রহস্যের অর্থ আমি এখনও বুঝতে পারিনি। হয়তো এ রহস্য অভেদ্য, জ্ঞানের বাইরে, শুধু প্রশ্নের শরশয্যায় মৃত্যুহীন ভীষ্ম।

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে :

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বজনের হৃদয়ে সর্বদা অবস্থিত। ধাঁন থেকে যেমন শীষ বার করে নিয়ে হয় তেমনি শরীর থেকে ধৈর্যের সঙ্গে সেই ক্ষুদ্রাকৃতি পুরুষকে বার করতে হবে। এই পুরুষই ব্রহ্ম।

আমি অনেকবার ভেবেছি এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষই পিতা। তাকে আমরা শরীর থেকে বার করে দিতে পারি না অতএব পুত্র যেমন অসমাপ্ত, পিতাও তেমনি। দু'এর সংলাপ দুই অসমাপ্ত অপরিকৃত, অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ ও তার নিজের আর এক অবতারের মধ্যে কথোপকথন।
